ঈমান যখন জাগলো

সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী

সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী

ঈমান যখন জাগলো

['যব ঈমান কী বাহার আঈ' নামক
বিখ্যাত উর্দূ গ্রন্থের বাংলা তরজমা]

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
অনূদিত

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

ঈমান যখন জাগলো

মূল ঃ সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী
অনুবাদ ঃ আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

ই. ফা. বা. প্রকাশনা ঃ ৮৮৬/২
ই. ফা. বা. গ্রন্থাগার ঃ ৯২২.৯৭

প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৮১; জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৮; শাবান ১৪০১

দ্বিতীয় মুদ্রণ
নভেম্বর ১৯৮৪

তৃতীয় মুদ্রণ
জুন ১৯৮৮; আষাঢ় ১৩৯৫; শাওয়াল ১৪০৮

প্রকাশনায়
আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
প্রকাশনা পরিচালক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ
তাজুল ইসলাম

মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ে
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রিণ্টিং প্রেস
বায়তুল মুকাররম
ঢাকা-১০০০

মূল্য ঃ চুয়াল্লিশ টাকা

IMAN JAKHAN JAGLO : When the Nation Vibrated with Faith, originally written by Saiyed Abul Hasan Ali Nadvi in Urdu, translated by Abu Sayeed Muhammad Omar Ali into Bengali and published by the Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka. June 1988

Price : Tk. 44·00 ; U.S. $: 3·00

বালাকোটের
মহান শহীদানের
অমর রূহের উদ্দেশে

লেখকের প্রকাশিত অনূদিত গ্রন্থ

ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার
মওলানা মুশাহিদ

ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক (৩য় খণ্ড), ২য় সং.
সৈয়দ আবুল হাসান আ'লী নদভী

ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক (১ম খণ্ড), ১ম সং.
সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী

মহানবীর (স) প্রতিরক্ষা কৌশল, ২য় সং.
জেনারেল আকবর খান

খালিদ বিন ওয়ালীদ, ১ম সং.
জেনারেল আকবর খান

মুহাম্মদ বিন কাসিম, ১ম সং.
জেনারেল আকবর খান

লেখকের প্রকাশিত বই

গল্প পড়ি জীবন গড়ি—২য় সং.
তাঁরা ছিলেন মানুষ—১ম সং.

আমাদের কথা

উপমহাদেশের তথা গোটা বিশ্বের ইতিহাসে সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর নেতৃত্বে পরিচালিত উনিশ শতকের ইসলামী আন্দোলন এক অনন্য মর্যাদার অধিকারী। ইসলাম যখন একটা জাতির মন ও মনন, বিশ্বাস ও জীবন-ধারার ওপর পুরোপুরিভাবে প্রভাব বিস্তার করে তখন সে জনগোষ্ঠীর চেহারা কি দাঁড়ায় তারই এক অনবদ্য আলেখ্য 'ঈমান যখন জাগলো'। সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলভীর জীবনী বা তাঁর আন্দোলনের ইতিহাস হয়ত অনেকেই লিখেছেন, কিন্তু জাতির বাস্তব জীবনধারায় তার প্রত্যক্ষ প্রভাবের এ ধরনের বিবরণী বোধ হয় এই প্রথম।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত গবেষক সাহিত্যিক আবুল হাসান আলী নদভী রচিত এই অনন্য গ্রন্থের বাংলা তরজমা করে জনাব আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী সবার ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ইসলামী আন্দোলনের এই জীবন্ত লেখাচিত্র আজকের তরুণ মুসলিম সমাজের জন্য অন্তহীন প্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করবে—এই ভরসায় ইসলামিক ফাউণ্ডেশন এই পুস্তক প্রকাশে ব্রতী হয়েছিল।

বইটি প্রথম প্রকাশ হয় ১৯৮১ খৃস্টাব্দে। ইতিমধ্যে বইটির দু'টি সংস্করণই নিঃশেষ হয়ে তৃতীয়বারের মত বের হতে যাচ্ছে। এতেই পাঠকের কাছে বইটির গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ হয়। এ প্রেক্ষিতে লেখক এবং অনুবাদককে মুবারকবাদ জানিয়ে আল্লাহ্‌র শোকরিয়া আদায় করছি।

অনুবাদকের আরয

আল্লাহ্ তা'আলার অপার রহমতে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে আমার অনূদিত মুসলিম বিশ্বের অন্যতম প্রখ্যাত লেখক ও দার্শনিক সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী লিখিত উর্দু গ্রন্থ 'যব ঈমান কী বাহার আঈ'-এর বাংলা তরজমা 'ঈমান যখন জাগলো' নামে প্রকাশিত হ'ল। এ জন্য মহান স্রষ্টার দরবারে জানাই লাখো-কোটি শোকর ও সজুদ।

বাংলাদেশসহ এই উপমহাদেশের যে ক'জন মহান বুযূর্গ আমার অন্তরের মণিকোঠায় সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত, যেসব বিপ্লবী ব্যক্তিত্ব মুসলমানের অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় আদর্শ হিসাবে উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত— নিঃসন্দেহে সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলভী (র)-র আসন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে ও সর্বোচ্চে। এর কারণ সম্পর্কে এই ঘটনার উদাহরণ দেওয়া যায়।

মুসলিম বন্দী শিবির থেকে পালিয়ে আসা জনৈক রোমক সৈন্যের কাছে সম্রাট হেরাক্লিয়াস মুসলমানদের পরিচয় জানতে চাইলে বীর সৈনিক এই উত্তর দেন, "মুসলমানেরা দিনে ঘোড়সওয়ার আর রাত্রে তাহাজ্জুদ গোযার তথা সংসার-বিরাগী ফকীর।"

সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) এই উভয় গুণেরই ছিলেন এক অপূর্ব ও আদর্শ সমন্বয়। একদিকে যেমন তিনি ছিলেন মর্দে মু'মিন, তেমনি অপরদিকে ছিলেন মর্দে মুজাহিদও। রসূল (স·)-এর একজন সত্যিকার ও প্রকৃত অনুসারীর ন্যায় তাঁর এক হাতে ছিল কুরআন ও অন্য হাতে তলোয়ার। সাহাবায়ে কিরামের চরিত্রের অনুপম বিকাশ শেষ যুগে কেবল আমরা তাঁর এবং তাঁর অনুসারীদের মধ্যেই দেখতে পেয়েছি। কী অসামান্য ও অটল ব্যক্তিত্বের জোরেই না তিনি স্বল্পতম সময়ের মধ্যে গোটা উপমহাদেশের তৎকালীন জাহিলী পরিবেশকে ঈমানের প্রদীপ্ত আভায়

রৌশন করে তুলেছিলেন, কীভাবে অন্যায়-অবিচার ও দুর্নীতির পঙ্কে আর সমস্যা-সংকটের আবর্তে নিক্ষিপ্ত, অজ্ঞতা ও মূর্খতার বিষবাষ্পে জর্জরিত, শিরক ও বিদ'আতের সীমাহীন দরিয়ায় নিমজ্জিত, অবনতি আর অধঃপতনের চূড়ান্ত দ্বারপ্রান্তে উপনীত একটা জাতিকে তওহীদ ও ঈমানের নূরানী ধারায় সঞ্জীবিত করে তুলেছিলেন, কি করে ঝিমিয়ে পড়া মুমূর্ষু একটি বিশাল জনগোষ্ঠির মর্মমূল ধরে নাড়া দিয়ে তাকে মুজাহিদ কওমরূপে প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন, সম্বিতহারা ও আত্মবিস্মৃত জাতিকে স্মৃতির রাজ্যে ফিরিয়ে এনে তাকে সম্বিত দান করলেন--তা ভাবলে সত্যিই অবাক হ'তে হয়। মুসলিম মিল্লাতকে তার হৃত-গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই অবশেষে বেছে নিলেন তিনি দুঃসহ ও ক্লেশকর জীবনের এক অনন্ত অধ্যায়। আর এ পথেই তিনি হাসিমুখে বিলিয়ে দিলেন সর্বাপেক্ষা অমূল্য তাঁর প্রাণ-বস্তুটিকে এবং লাভ করলেন শাহাদতের মহান মর্যাদা। বলা বাহুল্য, 'ঈমান যখন জাগলো' নামের এ গ্রন্থটি আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় বুযূর্গ সৈয়দ আহমদ বেরেলভী শহীদ (র)-এরই কর্মমুখর অমর জীবনালেখ্য।

আমার পরম সৌভাগ্য যে, এই মহান বুযূর্গের অমর জীবন-কাহিনী অনুবাদের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে আমার একটি আত্মিক সম্পর্ক সৃষ্টির সুযোগ মিললো। সেই সঙ্গে গভীর দুঃখ ও বেদনায় ব্যথাতুর ও শোকাহত হয়ে পড়ি যখন দেখি--শোষক ও জালিম শিখশাহীর বিরুদ্ধে মুসলিম কওমের ঈমান-আমান ও 'ইযযত-আবরূ হেফাজতের মহান সংগ্রামে যখন তিনি লিপ্ত ঠিক সে সময়ই ব্যক্তি, পারিবারিক ও সংকীর্ণ গোষ্ঠি স্বার্থ উদ্ধারের মানসে সেই সংগ্রামের পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত করছে উপমহাদেশের মুসলিম নামধারী কতিপয় কুলাঙ্গার, যার ফলশ্রুতিতে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছুবার পূর্বেই নির্মম ও করুণ পরিণতি লাভ করলো বালাকোট প্রান্তরের বিয়োগান্ত ঘটনার মাঝ দিয়ে। ফলে এক শতাব্দীরও বেশী সময়ের জন্য এ আন্দোলন গেল পিছিয়ে। দো'আ করি—বালাকোটের সেই রক্তাক্ত মহান আত্মত্যাগ আমাদের চলার পথের প্রেরণা হয়ে উঠুক এবং তাদের রক্তে ভেজা পথে উপমহাদেশের বুকে ইসলামের সোনালী সূর্য আবার হেসে উঠুক।

বর্তমানের নিরন্তর কর্মব্যস্ততা আমাকে এ কাজে প্রয়োজনীয় অখণ্ড মনোযোগ থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছে বারবার। তবুও চেয়েছি অনুবাদকে যথাসম্ভব সরল, প্রাঞ্জল ও সাবলীল করে তুলতে। জানি না, এতে কতখানি

সফল হয়েছি। বন্ধুপ্রতিম বিশিষ্ট সাংবাদিক ও অনুবাদক মওলানা আবদুল আওয়াল এ অনুবাদকে অধিকতর সফল ও মূলানুগ করে তুলতে আগাগোড়া পরিমার্জনের যে শ্রম স্বীকার করেছেন এখানে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তা উল্লেখ্য। এরপরও কোনরূপ ব্যর্থতা থাকলে তার জন্য সকল দায়-দায়িত্ব মাথায় তুলে নিয়ে এবং ভবিষ্যতে অনুবাদককে আরও সুন্দর ও অধিকতর উন্নত করবার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি।

পরিশেষে যেসব ভাইদের আন্তরিক প্রয়াসে গ্রন্থটি পাঠকের হাতে পৌঁছুতে পারছে—তাঁদের সকলের প্রতি দো'আ ও শুভেচ্ছা রইল। প্রকাশনার দায়িত্ব নেবার জন্য ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষকে জানাই মুবারক-বাদ। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে তাঁর পথে কাজ করার তও-ফীক দিন। আমীন।

অনেক আগেই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ শেষ হয়ে যাওয়ায় এক্ষণে এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে দেখে অত্যন্ত তৃপ্তি অনুভব করছি। দু'টি সংস্করণেই সম্ভাব্য পরিমার্জনার শ্রম স্বীকার করা হয়েছে। ফলে পূর্বের সংস্করণগুলোর তুলনায় বর্তমান সংস্করণ অনেক উন্নত হয়েছে।

অনুবাদকের পরম সৌভাগ্য যে, বর্তমান গ্রন্থ এবং 'তারীখে দাওয়াত ও 'আযীমত' ৩য় খণ্ডের ('ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক' নামে প্রকাশিত) অনুবাদের সূত্রে এসব গ্রন্থের মূল লেখক 'আল্লামা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (মা.জি. 'আ.)-র সঙ্গে অধমের সাক্ষাৎ ও সাহচর্য লাভের সুযোগ ঘটে। তাঁর গ্রন্থের বাংলা তরজমা প্রকাশিত হওয়ায় এবং তাঁর লেখার প্রতি এদেশের পাঠক সমাজের প্রচুর আগ্রহদৃষ্টে তিনি অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন। এ সময় তিনি দাওয়াত ও 'আযীমত সিরিজের অন্য খণ্ডগুলোর তরজমার অনুমতি প্রদান করে দীন অনুবাদককে অনুগৃহীত করেন এবং তাঁর স্নেহাঞ্চল তলে আশ্রয় দান করে চিরবাধিত হবার সুযোগ দেন। পরম করুণাময় আল্লাহ্র দরবারে একান্ত মুনাজাত, তিনি যেন হযরত (মা. জি. আ.)-কে হায়াত দারায করেন এবং অধমকে তাঁর গভীর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সোহবতের ফয়েয ও বরকত লাভের তওফীক দেন। আমীন।

৪ঠা মে, ১৯৮১
২১শে বৈশাখ, ১৩৮৮ — বিনীত
২৮শে জমাদিউছ ছানী, ১৪০১ — অনুবাদক

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

সূচী

সৈয়্যদ আহ্‌মদ শহীদ (র)

ভূমিকা

ইসলামের ইতিহাসে যখনই ঈমানের প্রবল বাতাস বয়েছে, 'আকীদা, 'আমল ও আখলাক---এই তিন শাখাতেই তখন বিস্ময়কর ঘটনাবলী বরং আশ্চর্য সব বিষয়ের প্রকাশ ঘটেছে। শৌর্য ও বীর্য, সুদৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যয়, সাধুতা ও আমানতদারী, আত্মত্যাগ ও আত্মহনন, সহমর্মিতাবোধ ও সেবামূলক প্রেরণা, ঈমান ও আত্মজিজ্ঞাসা, বাহ্যিক সাজ-সজ্জা ও সৌন্দর্যের প্রতি নির্লিপ্ততা, আত্মবিশ্বাস ও উচ্চ দৃষ্টিভঙ্গি—অধিকন্তু ন্যায় ও সুবিচার, দয়ার্দ্রচিত্ততা ও স্নেহ-মমতা, বিশ্বস্ততা ও জীবন উৎসর্গের এমন সব দুর্লভ নমুনা ও প্রাণবন্ত নজীর কিংবা প্রতিচ্ছবি লোকের সামনে এসেছে যা মানবতার স্মৃতি থেকে ক্রমান্বয়ে লোপ পেতে চলেছিল এবং যার পুনরুজ্জীবন ও পুনরুদ্ধারের কোন আশা-ভরসাই আর অবশিষ্ট ছিল না।

ঈমানের এই হৃদয়াপ্লুত বেগ ইতিহাসের বিভিন্ন বিরতি ও অধ্যায়ে চলেছে ; কখনো স্বল্প সময়ের জন্য, আবার কখনো বা দীর্ঘ সময়ের জন্য। তথাপি কোন হেমন্তকালই এগুলো থেকে খালি কিংবা মুক্ত ছিল না। নবজাগরণ ও পুনরুজ্জীবন এবং ইসলামী দাওয়াতের ইতিহাসে এ সবেরই রেকর্ড অতি উত্তমভাবে সংরক্ষিত আছে।

ভারতবর্ষের বুকে ঈমানের এই ভোরের হাওয়া ও বসন্ত বাতাস হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই বইতে শুরু করে, যখন সৈয়দ আহমদ শহীদ (র) এবং তাঁর উচ্চ মনোবলসম্পন্ন সাথীরা এদেশে তওহীদ, ধর্মীয় নবজাগরণ ও জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রামের পতাকা উত্তোলন করেন। তাঁরা ইসলামের প্রাথমিক শতাব্দীগুলোর স্মৃতিকে পুনরায় নতুনভাবে জাগিয়ে তোলেন।

সৈয়দ সাহেব বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল ধর্মের দাওয়াতের উপর আপন কর্মপন্থার বুনিয়াদ রাখেন। তিনি মুসলমানদের মধ্যে ঈমান ও একীন,

ইসলামী প্রেরণা এবং জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌র প্রাণ সঞ্চার করেন, একটি বিরাট জামাতমুখী ও মুজাহিদী বুনিয়াদের উপর সংগঠিত করেন। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তকে নিজের বিপ্লবী দাওয়াত ও জিহাদের কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর পরিকল্পনা ছিল, সামনে অগ্রসর হয়ে তিনি গোটা উপমহাদেশ থেকে ইংরেজদের উৎখাত করার প্রচেষ্টা চালাবেন এবং আল্লাহ্‌র কিতাব ও রসূলে পাক (স·)-এর সুন্নতের ভিত্তিতে এখানে একটি ইসলামী হুকূমত কায়েম করবেন। এই সব মুজাহিদ পাঞ্জাবে শিখদেরকে (যারা পাঞ্জাবের উপর রাজত্ব করছিল এবং সেখানকার মুসলমানদের জীবন দীর্ঘকাল থেকে দুর্বিসহ করে রেখেছিল) কয়েকটি যুদ্ধে পর্যুদস্ত করেন।

এই সব মুজাহিদ সীমান্ত প্রদেশের পেশোয়ার এবং তার আশেপাশের এলাকায় কার্যত একটি ইসলামী হুকূমত কায়েম করেন, শরীয়তের শাস্তির বিধান চালু করেন এবং ইসলামের আর্থিক ও দেওয়ানী ব্যবস্থাপনা হুবহু কায়েম করেন। কিন্তু সেখানকার উপজাতীয় গোত্রগুলো নিজেদের ব্যক্তি-গত স্বার্থ এবং উপজাতীয় আচার-অভ্যাস ও রীতিনীতির খাতিরে এই ব্যবস্থাপনাকে শেষ অবধি খতম করে দেয়। অবশেষে বালাকোটের ময়-দানে শিখদের সাথে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত মুজাহিদদের শেষ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) মওলানা মুহাম্মদ ইসমা'ঈল (র) এবং তাঁদের অনেক সম্মানিত সাথী ও মুজাহিদবৃন্দ শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন।

মুজাহিদ বাহিনীর অবশিষ্ট সদস্যরা পাহাড়ী এলাকায় আত্মগোপন করেন। সে সব বীর মুজাহিদ এবং তাঁদের সহকর্মীরা ভারতবর্ষে জিহাদ ও কোরবানী এবং ঈমান ও একীনের আলোকশিখা বরাবরই প্রজ্জ্বলিত রাখেন। ইংরেজরাও তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন অব্যাহত রাখে। তাঁদের উপর বিভিন্ন ধরনের জুলুম-নির্যাতন চালায়। তাঁদের জায়গা-জমি ও ঘরবাড়ী বাজেয়াপ্ত করে এবং মামলা-মুকদ্দমার সীমাহীন সিলসিলা শুরু হয়ে যায়। (১) কিন্তু সে সব মুজাহিদ এ মুসীবত ধৈর্য ও স্থৈর্যের সাথে, ঈমান, আত্মবিশ্বাস ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে বরদাশত করেন। এ ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে কোন রকম অস্থিরতা ও চিত্তচাঞ্চল্য কিংবা পেরেশানীর প্রকাশ ঘটেনি।

১। বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন "The great-Wahabi Case", "Indian Musalmans" by W. W. Hunter.

হিজরী ১৩৭২ মুতাবিক ১৯৫৩ খৃস্টাব্দের কথা। আল্লাহ্ তা'আলা আমার অন্তররাজ্যে এই চিন্তার উন্মেষ ঘটান যে, ঈমান ও ইসলামী রেনেসাঁ তথা ধর্মীয় পূনর্জাগরণের ঐ সব আশ্চর্যজনক ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী ইতিহাসকে হালকা সাহিত্যিক আমেজ ও আঙ্গিকে আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ করি এবং কোনরূপ আবেগ ও আতিশয্যকে প্রশ্রয় না দিয়ে আসল ঘটনাবলী সরল ও সহজভাবে পেশ করি যাতে করে এই আন্দোলনের বিপ্লবী নেতার আসল মরতবা ও মর্যাদা আরব বন্ধুদের সামনে ফুটে ওঠে। তারা যেন পরিমাপ করতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কি ধরনের খোদায়ী যোগ্যতা ও প্রতিভা দান করেছিলেন। তাঁর চারপাশে কেমন শক্তি-শালী ব্যক্তিবর্গের সমাবেশ ঘটেছিল। তরবিয়ত ও আত্মিক পবিত্রতা লাভের শাখায়, একনিষ্ঠতা ও বিশুদ্ধচিত্ততায়, ধর্মীয় দাওয়াতে নিজেকে বিলীন করায় এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতিতে তাঁর স্থান ছিল কত উর্ধে। এথেকে তারা এই মু'মিন ও মুজাহিদ ইসলামী বংশধরদের মহান কার্যাবলী, নৈতিক সমুন্নতি এবং স্বভাব-চরিত্রের দৃঢ়তা, অধিকন্তু তাঁর অনুগামী ও অনুসারীদের ভেতর ইসলামী দাওয়াত ও ঈমানী তরবিয়তের উজ্জ্বল প্রভাবও পরিমাপ করতে পারবে যা তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল। এই বিষয়ের উপর লেখা কয়েকটি প্রবন্ধ সে সময়ে কায়রো থেকে প্রকাশিত মিসরের প্রখ্যাত মাসিক "আল-মুসলিমুন"-এ ১৯৫৩ সনে ছাপা হয়। অতঃপর বিভিন্ন পুস্তক ও প্রবন্ধাদি রচনায় ব্যস্ততার কারণে আমার এদিকে মনোযোগ দেয়ার আর মওকা মেলেনি এবং এভাবেই কেটে যায় বিশটি বছর।

হালে আমার কয়েকজন স্নেহভাজন (১) এই সিলসিলার প্রবন্ধগুলোর দিকে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তারা এগুলোর সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক এবং বর্ণনা-ধারার প্রভাব সৃষ্টিকারী দিকটি উল্লেখ করেন। এই মহান ব্যক্তিত্বের উপর আরবী ভাষায় নতুনভাবে কোন পুস্তক রচনা এবং বিস্তারিত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা (যেমন এর আগে আমি উদ্ধৃত করে-ছিলাম) বর্তমান অবস্থায় আমার পক্ষে খুবই কষ্টকর ছিল। এজন্য এই সিলসিলার পরিপূর্ণ রূপ দেয়াটাই আমার নিকট সমীচীন মনে হ'ল, মনে হ'ল

---

১. বিশেষ করে মুহাম্মদ আল্-হাসানী ও সা'ঈদুল 'আজমী নদভী। তাঁরা দু'জনেই 'আল্ বা'ছু'ল-ইসলামী'র সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য।

এই দীর্ঘ ইতিহাস যা হাজারেরও অধিক সংখ্যক পৃষ্ঠাতে ছড়িয়ে আছে এবং যার ভূখণ্ডগত পরিধি হাজার মাইলেরও বেশী এবং ফলগত দূরত্ব কোন-ভাবেই এক শতাব্দীর কম নয়--এর খোলাসা ও সংক্ষিপ্তসার খণ্ড খণ্ড ঘটনাবলীর আঙ্গিকে পেশ করা যাক।

মেধাসম্পন্ন ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ব্যক্তি এই সব বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত পালক দ্বারা ঘটনাবলীর একটি পূর্ণ হার অত্যন্ত সহজভাবে তৈরি করতে পারেন এবং পরিমাপ করতে পারেন যে, এই ঈমানী মাদরাসা কেমন সব মণিমুক্তার রাত্রিকালীন প্রদীপ জন্ম দিয়েছে, কেমন সব অকুন্দনো পাথরকে চমকিত রত্নে রূপান্তরিত করেছে এবং তাদের মূল্য কি ছিল, আর কোথায় নিয়ে পৌঁছিয়েছে। আমি আশা রাখি, এই কিতাব আধুনিক ইসলামী লাইব্রেরী ও পাঠাগারের শূন্যতা পূরণ করবে এবং যেসব অনুসন্ধানকারী ও গবেষক ইসলামী জিহাদের এই জ্বলন্ত ও উজ্জ্বল অধ্যায় এবং ভারতবর্ষে ধর্মীয় পুনর্জাগরণের ইতিহাস পাঠ করতে চায়---এর দ্বারা তাদের তৃষ্ণা কিছুটা নিবারণ হবে।

আমি ছাত্রাবস্থায় আবুল ফারাজ ইস্পাহানীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "আগানী" গভীর আগ্রহ ও অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে অধ্যয়ন করেছিলাম। বলতে কোন আপত্তি নেই যে, তাঁর সাহিত্য গুণ, ভাষার আলংকারিক সৌন্দর্য এবং উত্তম উপস্থাপনা ও বর্ণনাভঙ্গী আমাকে এর ভক্তে পরিণত করেছিল। কিন্তু এটা দেখে আমার লজ্জা হ'ল যে, এই ভাষা যাতে কুরআনু'ল-করীম অবতীর্ণ হয়েছিল, যে ভাষায় হুযূর আকরাম (স·) এবং তাঁর সাহাবারা কথাবার্তা বলতেন, নেহায়েত নিকৃষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে এবং গান-বাজনা ও রাগ-রাগিনীর জন্য ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে। এর দ্বারা কেবলমাত্র ইসলামী সমাজ জীবনের দুর্বল দিকগুলো উদ্ভাসিত করে তুলবার এবং দোষত্রুটিগুলো প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আমার অভিপ্রায় ছিল যে, এই বাকপটুতা, শব্দভাণ্ডার, উত্তম বর্ণনাভঙ্গী এবং গল্পের সহজ ও হাল্কা রীতি-পদ্ধতি—যা উক্ত কিতাবের বৈশিষ্ট্য—একটি মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করা হোক। এর দ্বারা কোন উত্তম ও সৌন্দর্যমণ্ডিত ইতিহাসের কমনীয় মুখমণ্ডল থেকে পর্দা উন্মোচন করা যাক।

আমি এই সব ঘটনা প্রকাশে যা অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে বাছাই করেছিলাম—উক্ত পদ্ধতিই অনুসরণ করেছি। যদি আমি এই প্রচেষ্টায়

সফল নাও হই তবুও অন্তত নেকনিয়ত ও মহৎ উদ্দেশ্যের বিনিময় আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই দেবেন।

ঈমানী চেতনাসমৃদ্ধ এই সব ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল, এ থেকে সেই মহান ব্যক্তিত্বের [হযরত মুহাম্মদ (স॰), যাঁর উদ্দেশ্যে আমার জীবন উৎসর্গীত হোক] শ্রেষ্ঠত্ব ও মহান মর্যাদার পরিমাপ করা যায়, যাঁর নিঃশ্বাসের বরং যাঁর কদম মুবারকের বরকতে এই ইতিহাসের ললাট আলোকিত ও গৌরবমণ্ডিত, যাঁর কারণে সমগ্র পৃথিবীতে ঈমানের উজ্জ্বল নূর ছড়িয়ে পড়েছে এবং দাওয়াত ও অটুট সংকল্প, ইসলামী রেনেসাঁ ও ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের সিলসিলা কায়েম হয়েছে, ইসলামী ইতিহাসের সমস্ত মুজাদ্দিদ, সংস্কারক ও নেতৃবৃন্দ তাঁরই প্রশিক্ষণ ও দাওয়াতের ফয়েযে উদ্ভাসিত। বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য যে, নবুওতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষার্থীর যখন ঈমান ও এখলাসের মানদণ্ড এতখানি উত্তীর্ণ এবং প্রভাববলয় ও বিপ্লবী চেতনা এতখানি সমৃদ্ধ --তাহলে স্বয়ং হুযূর আকরাম (স॰)-এর অবস্থা কি হতে পারে---যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা হিদায়েত ও সত্যসুন্দর জীবন-ব্যবস্থা তথা দীনে-হকসহ পাঠিয়েছেন, ওহী দ্বারা ধন্য করেছেন, নিত্য ও চিরন্তন কিতাব প্রদান করেছেন! আর যাঁকে হযরত জিবরাইল আমীন (আ.) দ্বারা সাহায্য ও সহায়তা প্রদান করেছেন! এরপর (পরিমাপ করা যায়) তাঁর বিশ্বস্ত ও আত্মোৎসর্গীত সাহাবায়ে কিরামের মানদণ্ডই বা কতখানি সমুন্নত হবে যাঁরা তাঁরই স্নেহছায়ায় লালিত-পালিত ও বর্ধিত এবং যাঁদের প্রশিক্ষণও তাঁরই চোখের সামনে হয়েছিল!

এত শতাব্দী পর এরূপ মুজাহিদ ও সংস্কারকদের অস্তিত্ব এবং ইসলামের কেন্দ্রভূমি থেকে এত দূরবর্তী হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের এ ধরনের প্রভাবমণ্ডিত ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে ইসলামের চিরন্তনতারই আলামত এবং একথারও সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, এ (ইসলাম) আজও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মর্দে মুজাহিদ সৃষ্টি করবার অফুরন্ত ক্ষমতা ও যোগ্যতা সংহত রাখে। এর সবুজ শ্যামল ও চিরযৌবনা বৃক্ষ আজও বরাবরের ন্যায় ফল দিচ্ছে এবং তার ভাণ্ডার আজও তেমনি সমৃদ্ধ। আর তাই কবি বলেছেন ঃ

عالم نشود ویران تا میکده اباد است

"পৃথিবী বিজন হবে না যতদিন পানশালায় জনসমাগম থাকবে।"

হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-যে পবিত্র ও মুবারক জামাত তৈরী

করেছিলেন--বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও চোখে পড়ার মতো বিষয় হ'ল তার সামগ্রিকতা। এর ভেতর জিহাদে আসগর যেমন ছিল---তেমনি ছিল জিহাদ আকবর; আল্লাহ্-প্রেম যেমন ছিল, তেমনি ছিল আল্লাহ্ভীতি; আল্লাহ্রই জন্য মহব্বত যেমন ছিল, তেমনি ছিল আল্লাহ্রই জন্য বোধ; যুহ্দ ও 'ইবাদত যেমন ছিল, তেমনি ছিল ধর্মীয় তেজস্বিতা ও ইসলামী সম্ভ্রমবোধ; এক হাতে যেমন তলোয়ার ছিল, তেমনি অপর হাতে ছিল কুরআন; বুদ্ধি, আবেগ ও প্রেরণা যেমন ছিল, তেমনি ছিল শাণিত বুদ্ধির প্রয়োগ। এতে একদিকে যেমন ছিল মসজিদ কোণে তসবীহ্-তাহলীল ও মুনাজাত, অপরদিকে তেমনি ছিল ঘোড়ার পিঠে অব্যাহত তকবীর ধ্বনি। এ সব গুণাবলী ও চরমোৎকর্ষতা অধিকাংশ জীবনী-কারদের দৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী ও সংঘর্ষমুখর বলে মনে হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এ সব ছিল বিশুদ্ধ ধর্মীয় জ্ঞান ও উপলব্ধিরই ফসল, যা সৈয়দ সাহেবের ব্যক্তিত্ব এবং সঠিক ও যথার্থ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মুজাহিদ বাহিনীর ভেতর পাকাপোক্ত ও বদ্ধমূল আসন গেড়েছিল এবং জীবনের সমগ্র বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল। এর অপর একটি কারণ ছিল এই যে, এই ধর্মীয় দল অথবা আন্দোলন ধর্মীয় প্রশিক্ষণের গুরুত্ব-পূর্ণ পর্যায়গুলো মামুলীভাবে অতিক্রম করেনি এবং বিনা প্রস্তুতিতে জীবন-যুদ্ধের খোলা ময়দানে পা রাখেনি; বরং এ ব্যাপারে অনেক চিন্তাভাবনা ও গবেষণার পরই শুধু হস্তক্ষেপ করেছিল। এজন্য সেইসব পন্থাই এখতিয়ার করেছিল---যা তাকে মনযিলে মকসূদ পর্যন্ত নিয়ে যায়। বস্তুত এটা হ'ল একজন আত্মবিশ্বাসী ও মুজাহিদ বংশোদ্ভূতের উত্তম চিত্র এবং এক-নিষ্ঠতা ও আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নিবেদিতের বিশুদ্ধ মানদণ্ড ও চিত্তাকর্ষক নমুনা--যা প্রতিটি যুগেই কাম্য আর ইসলামী শরী'আতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যও তাই।

বর্তমান পুস্তক ১৩৯৩ হিজরীর শা'বান মাসে (১৯৭৩ খৃ.) إذا هبت ريح الإيمان নামে 'আরাফাত ঘর, দায়েরায়ে শাহ 'আলামুল্লাহ্ (র) রায়-বেরেলীর পক্ষে থেকে নদওয়াতু'ল-'উলামার আরবী প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত হয়। পুস্তকটি আরব দেশগুলোতে অতি দ্রুততার সাথে খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়। মনে হচ্ছিল যেন সে একটি শূন্য-স্থান পূরণ করছিল এবং এর অপেক্ষা চলছিল বহুদিন থেকে। ফলে দু'হাজারের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র চার মাসের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যায়। প্রতিষ্ঠিত ও অভি-

জাত আরবী সংবাদপত্র ও সাহিত্য সাময়িকীগুলোতে পুস্তকটির উপর সমীক্ষা প্রকাশিত হয় এবং আরব প্রকাশক মহল থেকে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রস্তাব আসতে থাকে। সমীচীন মনে করলাম, এটাকে উর্দু ভাষায়ও রূপান্তরিত করা যাক। তাতে করে এই অবজ্ঞাত উপমহাদেশের মুসলিম যুবক ও ভবিষ্যত বংশধরদের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়ক হতে পারে।

এই দায়িত্বপূর্ণ কাজটি গ্রন্থকারের প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র মওলবী মুহাম্মদ-আল-হাসানী অত্যন্ত সুন্দর ও সুচারুরূপে আঞ্জাম দিয়েছেন। তিনি গ্রন্থকারের মূল গ্রন্থ "সীরতে সৈয়দ আহমদ শহীদ (র) (১-২ খণ্ড) সামনে রাখেন। তা থেকেই এই আরবী গ্রন্থের মূল উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছিল। তিনি প্রচেষ্টা চালান যাতে মূল গ্রন্থের বেশীরভাগ শব্দ ও বর্ণনাভঙ্গি রক্ষিত হয় এবং অনুবাদে শিল্পনৈপুণ্য ও রচনাবৈগুণ্যের পরিবর্তে মূল গ্রন্থের যে সব শব্দ ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্টরা ব্যবহার করেছেন বলে অনুমিত হয়েছে, তিনিও সেগুলো বহুল পরিমাণে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। আশা করা যায় যে, অত্র পুস্তক পাঠে এই জামাতটির সত্যিকার চিত্র সামনে এসে যাবে, ঈমানে নতুন সঞ্জীবনী শক্তি এবং প্রাণে নতুন প্রবাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে, যার উপকরণ আমাদের নতুন সাহিত্যাংগন থেকে দিন দিন হ্রাস পেয়ে চলেছে।

সমীচীন মনে করলাম যে, মূল গ্রন্থের প্রথমে এমন একটা নিবন্ধ বর্ধিত করা দরকার যাতে হযরত সৈয়দ বেরেলভীর জীবনচরিত এবং যুগ সু-সংহত ও ধারবাহিকভাবে পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত হয় আর সে সব বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর মাঝখানে একটা যোগসূত্র ও ঐক্য স্থাপন করা সম্ভব হয়। পাঠকগণ যেন এ সবের মাঝে কোন শূন্যতা ও অসমতা অনুভব না করেন। কাজটি ছিল খুবই দূরুহ ও দুঃসাধ্য। কারণ সৈয়দ সাহেবের শুধুমাত্র জীবনচরিত ও ঘটনাবলী "সীরতে সৈয়দ আহমদ শহীদ" শীর্ষক গ্রন্থে এক হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী ছড়িয়ে রয়েছে। এর সাথে যদি এ জামাতের ইতিহাস, প্রখ্যাত খলীফা ও ভক্ত-অনুরক্তদের কার্যাবলী সংযোজন করা যায় তবে তা এর থেকেও বিস্তৃত পরিসর জুড়ে নেবে। কারণ মওলানা গোলাম রসূল মেহেরের ন্যায় প্রবীণ সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকের কলমও একে ১৯২১ পৃষ্ঠার কমে সীমিত করতে পারেন নি। এই বিরাট সমুদ্রকে একটি কুঁজোয় ভর্তি করা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু গ্রন্থকারের

প্রিয় ভাতিজা এবং মাসিক 'রেদওয়ান'-এর সম্পাদক মওলবী সৈয়দ মুহাম্মদ ছানী হাসানী এই কাজটি অত্যন্ত উত্তমভাবে নেহায়েত পরিশ্রম করে সম্পন্ন করেছেন। তিনি ন্যূনতম পৃষ্ঠার মধ্যে সৈয়দ সাহেবের জীবনীর প্রয়োজনীয় অথচ সংক্ষিপ্ত একটা চিত্র তুলে ধরেছেন। সেটি এই গ্রন্থের ভূমিকা কিংবা উপক্রমণিকা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আশা করি ও এ থেকে পাঠক এই গ্রন্থের ঘটনাবলীর পটভূমি উপলব্ধিতে সহায়তা লাভ করবেন।

দায়েরায়ে শাহ্ 'আলামুল্লাহ্ হাসানী (র)
রায়বেরেলী।

আবুল হাসান আলী নদভী
২০শে রবিউল আওয়াল, ১৩১৪ হি.
১৪ই এপ্রিল, ১৯৭৪ খৃ. রবিবার।

হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (র)

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উপমহাদেশের অবস্থা

হিজরী ১৩শ শতাব্দীতে (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ) ভারতবর্ষ রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক তথা চারিত্রিক দিক দিয়ে অবনতি ও অধঃপতনের শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছেছিলো। বিরাট ও বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড ভেঙে-চূরে চুরমার হয়ে গিয়েছিলো। সমগ্র ভারতবর্ষে তখন ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কিংবা তার মিত্রদের জবর দখল প্রতিষ্ঠিত। অবশিষ্ট অংশ ছিলো দেশীয় রাজন্যবর্গ ও সর্দারদের নিয়ন্ত্রণাধীন। তারা একের পর এক পরাজয় বরণ করে নিজেদের এলাকা ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়ে চলেছিলো। মোগল সম্রাট শাহ্ আলম [যার রাজত্বকালে হযরত সৈয়দ আহ্মদ শহীদ (র)-এর জন্ম হয়] শুধু নামেমাত্র বাদশাহ ছিলেন। দাক্ষিণাত্য থেকে শুরু করে দিল্লী পর্যন্ত সমগ্র এলাকা মারাঠাদের করুণা ও অনুগ্রহের উপর বেঁচে ছিলো। পাঞ্জাব থেকে আফগানিস্তান সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র ভূ-ভাগ ছিলো শিখ শক্তির শাসনাধীন। তাদের অত্যাচার-নির্যাতন ও লুট-তরাজ থেকে ভারতবর্ষের উত্তর ও মধ্য ভূ-ভাগ মোটেই নিরাপদ ছিলো না। দিল্লী ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলো তখন শিখ ও মারাঠাদের লুট-তরাজ ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের টার্গেট ছিলো। মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিলো অবনমিত। তাদের কোন নেতা ছিলো না, ছিলোনা কোন শৃংখলা। তাদের দুর্বল ও অসহায় পেয়ে নানা ফেতনা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তারা পদদলিত ও মথিত হয়।

ভারতবর্ষের বুকে মুসলমানদের নৈতিক ও চারিত্রিক অবক্ষয় এমন পর্যায়ে নেমে গিয়েছিলো যে, অন্যায়, অশ্লীল ও গর্হিত বহু কথাবার্তা এবং

আচার-আচরণ তাদের আদব-লেহাজ ও সভ্যতায় অনুপ্রবেশ করে গিয়েছিলো আর এ নিয়ে তারা প্রকাশ্যে গর্ব ও অহংকার করতো। শরাবখোরী (মদ্যপান) অবাধে চলতো। আমোদ-প্রমোদ ও ভোগ-বিলাসের ছিলো চারিদিকে ছড়াছড়ি। আমীর-উমারা এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে শুরু করে গরীব ও নিঃস্ব শ্রেণী পর্যন্ত সবাই ছিলো এ সমাজ ব্যবস্থারই শিকার। নৈতিক ও চারিত্রিক অবনতি ও অধঃপতন এবং জাতীয় চেতনা ও অনুভূতির মান এরূপ শূন্যের পর্যায়ে পেঁৗছে গিয়েছিলো যে, হিজরী ১৩শ শতাব্দীর শুরুতে--তখনো ইংরেজ রাজত্বের শেকড় এদেশের মাটিতে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি, সে সময়ও কিছু সংখ্যক মুসলিম মেয়েকে য়ূরোপীয় বণিক ও শাসক-দের ঘরে পাওয়া গেছে। শির্‌ক ও বেদ'আত মুসলমানদের মধ্যে অধিক পরিমাণেই শেকড় গেড়ে বসেছিলো। কবর ও কবরবাসীদের সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র শরীয়তই অস্তিত্ব লাভ করেছিলো। বুযর্গানে দীন সম্পর্কে এমন সব 'আকীদা ও ধারণা অন্তর-মানসে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যেগুলোর জন্য খৃস্টান, য়াহূদী এবং আরবের মুশরিক ও পৌত্তলিকেরা নিন্দিত তথা বদনামের ভাগি-দার। হিন্দু ও শী'আ সম্প্রদায়ের অধিকাংশ আচার-আচরণ ও প্রথা-পদ্ধতি আহ্‌লে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের সমাজ জীবনের অংগীভূত হয়ে গিয়েছিলো। রসূলে করীম (স·)-এর বাস্তব জীবনাদর্শ (সুন্নত) এবং শরীয়তকে তারা ভুলতে বসেছিলো। ইসলামী রীতিনীতি উঠেই যাচ্ছিলো। বহু ভালো ভালো দীনদার ও জ্ঞানী-গুণী পরিবারেও কুরআনুল করীম ও হাদীছ পাকের বিধি-বিধানের প্রতি কোনরূপ তোয়াক্কা করা হতো না। বিধবাদের পুণর্বিবাহের, মীরাছ (উত্তরাধিকার)-এর ক্ষেত্রে মেয়েদের অংশ দেয়া, সালাম দেয়া ইত্যাদিকে অনেক স্থানে দূষণীয় মনে করা হতো। এমতভাবেই হজ্জের ন্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী রুকনকে রাস্তার কষ্ট-ক্লেশ এবং নিরাপত্তার অভাব ইত্যাদি ওজুহাত খাড়া করে এর ফরজিয়তকে রহিত করা হয়েছিলো। কুরআন শরীফকে একটি হেঁয়ালি বা প্রহেলিকা মনে করা হচ্ছিলো এবং একে বুঝতে চেষ্টা করা ও অপরকে বুঝান, এর উপর চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করা 'উলামায়ে কিরাম ব্যতীত অন্যান্যদের জন্য অসম্ভব এবং 'নিষিদ্ধ বৃক্ষের' ন্যায় অস্পৃশ্য ঘোষণা করা হয়েছিলো।

তবে এর দ্বারা এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও ঠিক হবে না যে--জ্ঞানগত, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর এ যুগটি একেবারেই তমসাচ্ছন্ন ও মরুভূমির ন্যায় বিরান হয়ে গিয়েছিলো

এবং ভারতবর্ষের বুকে কোথাও জীবন-যিন্দেগীর কোন চিহ্ন কিংবা দীপ্ত আলোকমালার কোন সুউচ্চ মিনার দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো না। ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনাকাল ছিলো ভারতবর্ষে ইসলামী ইতিহাসের অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এ যুগেই এমন কয়েকজন প্রতিভাবান ও বিশিষ্ট মনীষীর সাক্ষাত মেলে যাদের নজীর অতীত শতাব্দীগুলোতেও সহজে এবং খুব বেশী পাওয়া যাবে না। ধর্ম, 'ইল্‌ম ও 'আমলের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ, রসূলে করীম (স')-এর বাস্তব জীবনাদর্শ সম্পর্কে ব্যাপক পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান, সুষ্ঠু প্রতিভা, বুদ্ধিমত্তা ও যোগ্যতা, জ্ঞানের ক্ষেত্রে পারদর্শিতা, গঠন-পাঠন (দরস ও তদরীস), গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনা, গভীর পাণ্ডিত্য, কাব্য চর্চা ও কবিতা, তাসাওউফ ও অধ্যাত্ম সাধনা এবং জ্ঞানের অন্যান্য শাখায়ও সমান পারদর্শী কতিপয় ব্যক্তিত্বের সন্ধান এ শতাব্দীতে পাওয়া যায়। এ ছাড়াও উপযুক্ত ও সত্যিকার ব্যক্তি-সত্ত্বার এই দুর্ভিক্ষের দিনেও দীন ও ধর্মের প্রতি আগ্রহ, চাহিদা ও মর্যাদা বেশ ছিলো বলা চলে। কারণ সে সময় সমগ্র উপমহাদেশে মক্‌তব ও মাদরাসা জালের ন্যায় ছড়িয়ে ছিলো। অলিতে-গলিতে খানকাহ্‌ (আধ্যাত্মিক তথা ধর্মীয় দীক্ষা-দান কেন্দ্র) ও ছিলো। 'উলামায়ে কিরাম উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে ও শহরগুলোতে 'ইল্‌ম ও দীনের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারে ছিলেন নিরন্তর ব্যাপৃত এবং গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনায়ও ছিলেন তাঁরা মশগুল। মাদরাসাগুলো 'ইল্‌মে দীন (ধর্মীয় 'ইল্‌ম বা জ্ঞান)-এর ছাত্র এবং খানকাহ্‌গুলি আল্লাহ্‌-ওয়ালা লোকদের দ্বারা ছিলো পরিপূর্ণ। খ্যাতনামা মুদার্‌রিস ও তরীকতপন্থি সূফীদের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র আবাদকৃত মাদরাসা ও খানকাহ্‌ ছিলো। কোথাও বা এ দু'টোই পাশাপাশি সহাবস্থানের ভিত্তিতে পরিচালিত হতো।

এটা অবশ্য স্বীকৃত সত্য যে, 'ইল্‌ম ও দীনের এসমস্ত বড় বড় ভাণ্ডার ও কেন্দ্রগুলি যা পূর্ববর্তী বুযুর্গদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়ে আস-ছিলো---ক্রমাগত ব্যয় নির্বাহ---তদুপরি দীর্ঘদিন থেকে এগুলির আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে যাবার কারণে কমতে কমতে দ্রুত অবলুপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো এবং সংখ্যা বৃদ্ধি ও উন্নতির দরজাও বন্ধ বলে মনে হচ্ছিলো। যোগ্যতা ও প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিত্ব ছিলো, কিন্তু নষ্ট হয়ে যাচ্ছিলো। জীবনের সঠিক লক্ষ্য ও শক্তিসামর্থ্যের যথাযথ সদ্ব্যবহারের স্থান না হবার কারণে শৌর্য-বীর্য, দৃঢ় ও সমুন্নত মনোবল, আত্মসম্মান ও মর্যাদাবোধ এবং অন্যান্য মহৎ গুণাবলী নিকৃষ্ট ও নগণ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পেছনে ব্যয়িত হচ্ছিলো। ফলে

আবেগ ও উৎসাহ-উদ্দীপনা ভুল ও অন্যায় পথে ধাবিত হচ্ছিলো। ব্যক্তি ছিলো---কিন্তু ছিলো না জামা'আত ; পৃষ্ঠা পাতা সবই ছিলো---কিন্তু তা পুস্তকাকারে সংহত ও সুসংবদ্ধ ছিলো না। জীবন ও যিন্দেগীর দিগ-দর্শন ছিলো স্থানচ্যুত। ফলে সাধারণ ও কল্যাণকর কোন স্পন্দন ছিলো না।

এমনি মুহূর্তে এমন একজন ব্যক্তিত্ব ও এমন একটি জামা'আতের প্রয়োজন ছিলো যে দীন, 'ইল্ম ও যোগ্যতার এ পুঁজির সাহায্যে সময় মতো কাজ করিয়ে নেবে এবং সঠিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম হবে। যে ব্যক্তি ও জামা'আত খানকাহ্গুলির অবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিত ও উচ্চারিত বক্তব্য,---ওখানকার উষ্ণ-উত্তাপ আর এখানকার আলোকরশ্মি সমগ্র দেশে ছড়িয়ে দেবে--যার উত্তপ্ত জ্বালায় খানকাহ্গুলি হবে সঞ্চরণশীল, মাদরাসা ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি হবে গতিশীল ও বেগবান, 'আলিম ও 'উলামায়ে কিরাম হবেন ঘোড় সওয়ার এবং মুজাহিদ ও সৈনিক হবেন মিহরাবের মালিক। যিনি অন্তর রাজ্যের নির্বাপিত আগুন থেকে জ্বলন্ত উল্কা-পিণ্ড ছোটাবেন,-- বিমর্ষ ও হিমশীতল অন্তর-মানসকে আর একবার অগ্নিবৎ উত্তপ্ত করবেন এবং সমগ্র ভূখণ্ডের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দীন ও ধর্মের জন্য উন্মত্ত চাহিদা ও আবেগ-উদ্দীপনার আগুন জ্বালাবেন; যিনি মুসলমানদের আল্লাহ-প্রদত্ত প্রতিভা ও কর্মক্ষমতাকে লক্ষ্য বস্তুতে নিয়োজিত করতে পারবেন। যাঁর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি এবং আত্মোৎসর্গীত ব্যক্তি-সত্তা কোন অবজ্ঞাত ও ফেল্না বস্তুকেও অবজ্ঞেয় ও ফেল্না মনে করবে না; তিনি উম্মতের ভাণ্ডার থেকে প্রাপ্ত প্রতিটি দানা ও শস্য কণা এবং বাগানের পথ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া ছোট্ট ফলটি থেকেও যথাযথ কাজ আদায় করবেন। যিনি এসমস্ত গুণাবলীর আধার হবেন--তাকেই ইসলামের পরিভাষায় 'ইমাম' বলা হয়। এরূপ সমুন্নত ও মহান স্থান ত্রয়োদশ শতাব্দীর সমস্ত প্রতিভাবান মনীষী ও খ্যাতনামা লোকদের মধ্যে একমাত্র হযরত সৈয়দ আহমদ (র)-এরই ছিলো। তাঁর বাছাইকৃত ও নির্বাচিত অবস্থাদি ও কাহিনীগুলো এবং অটুট সংকল্প ও দৃঢ় মনোবল, জিহাদী স্পৃহা, রূহানী ফয়েয ও প্রভাব এবং বিপ্লবাত্মক ঘটনাবলীই এই গ্রন্থে বিধৃত।

খান্দান

হযরত ইমাম হাসান (র)-এর পৌত্র মুহাম্মদ (র), যিনি 'শহীদ নফসে যাকিয়া' নামে পরিচিত—এর দ্বাদশ অধঃস্তন পুরুষ সৈয়দ রশীদুদ্দীনের

পুত্র শেখুল ইসলাম সৈয়দ কুতবুদ্দীন মুহাম্মদ আল-মাদানী একজন ‘আলিম, ‘আরিফ ও দৃঢ়চেতা বুযুর্গ ছিলেন। আল্লাহ্ পাক তাঁকে ‘ইল্‌ম ও তাকওয়ার ন্যায় অমূল্য সম্পদ দান করার সাথে সাথে বীরত্বের খ্যাতি এবং জিহাদী জোশ্ ও জযবাও দান করেছিলেন। তিনি মুজাহিদদের একটি বিরাট জামা-‘আতের সাথে গযনীর পথ ধরে ভারতবর্ষে এসে উপনীত হন। বিভিন্ন স্থান ঘোরাফেরা ও অবস্থানের পর অবশেষে কড়া (বর্তমানে এলাহাবাদ) জয় করে সেখানেই স্থায়ী অবস্থান গ্রহণ করেন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন। এখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। সৈয়দ কুত্‌বউদ্দীনের পুত্রদের আল্লাহ্ তা‘আলা নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বসুলভ গুণাবলী দানের সাথে সাথে ‘ইল্‌ম ও ফযীলত, যুহদ ও তাকওয়ারূপ অমূল্য সম্পদ দানেও ধন্য ও সমৃদ্ধ করেছিলেন। সৈয়দ কুত্‌ব উদ্দীনের বংশেই হযরত শাহ ‘আলামুল্লাহ্ (র) এমন একজন বুযুর্গ ছিলেন যিনি সম্রাট আলমগীরের শাসনামলে একজন ‘আলিমে রব্বানী এবং তরীকতের সিলসিলার প্রখ্যাত শেখ ও ওলীয়ে কামেল ছিলেন--যিনি হযরত মুজাদ্দিদে আলফে-ছানী (র)-এর মশহুর খলীফা হযরত সৈয়দ বিন্নূরী (র)-এর এজাযতপ্রাপ্ত ছিলেন। ইনি অত্যন্ত মুত্তাকী এবং সুন্নতে রসূল (স)-এর অত্যন্ত পাবন্দ ছিলেন। হিজরী ১০৯৬ সালে (১৬৮৪ খৃ.) তিনি ইন্তেকাল করেন এবং তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রায়বেরেলীস্থ দায়রা শরীফে তাঁকে কবরস্থ করা হয়।

জন্ম

হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (র) তাঁরই পঞ্চম অধঃস্তন পুরুষ। শাহ ‘আলামুল্লাহ্ নামক দায়েরায় হিজরী ১২০১ সালের সফর মাসে এবং ইংরেজী ১৭৮৬ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম সৈয়দ মুহাম্মদ ‘ইরফান এবং পিতামহের নাম সৈয়দ মুহাম্মদ নূর (র)। চার বছর বয়সে তাঁকে মক্‌তবে পাঠানো হয়। কিন্তু বহু চেষ্টা-তদবীর সত্ত্বেও লেখা-পড়ার প্রতি তাঁর প্রকৃতি ও স্বভাবকে ধাবিত করা গেলোনা। পুঁথিগত বিদ্যায় তাঁর তেমন কোন উন্নতিও হলো না। বাল্যকাল থেকেই পুরুষোচিত ও সৈনিকসুলভ খেলাধূলার প্রতি তাঁর ছিলো ভীষণ ঝোঁক। বয়ঃপ্রাপ্তির সাথে সৃষ্টির সেবায় তথা সেবাধর্মী ও জনকল্যাণমূলক কাজের প্রতি এমনই আগ্রহের সৃষ্টি হয় যে, অনেক বিরাট বড় বুযুর্গকেও তাঁর নিকট হার মানতে হয়। দুর্বল, অসহায়, বিকলাঙ্গ ও বিধবাদের খেদমত করার প্রতি তাঁর প্রবল

আগ্রহ এবং এরই সাথে 'ইবাদত-বন্দেগী ও যিক্‌রে ইলাহীতেও ঔৎসুক্য অত্যন্ত বেশী পরিমাণে ছিলো। নিয়মিত ব্যায়াম ও পুরুষোচিত খেলাধুলার প্রতি আগ্রহও ছিলো তেমনি। প্রত্যহ পাঁচশত বৈঠক, তিরিশ সের ওজনের মুগুর ভাজা, সাঁতারসহ পানিতে অধিকক্ষণ অবস্থান ইত্যাদির অনুশীলনও তিনি বাড়িয়েছিলেন।

জীবিকার সন্ধানে লাখনৌ সফর

হযরত সৈয়দ আহমদ (র)-এর বয়স যখন বারো বছর সে সময় তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা মওলানা মুহাম্মদ 'ইরফান (র) ইন্তেকাল করেন। অবস্থার দাবী এমনই প্রবল ছিলো যে, তাঁকে দায়িত্ব ও কর্তব্যপূর্ণ জীবনের ডাকে সাড়া দিতেই হবে এবং জীবিকার সন্ধানও করতে হবে তাঁকেই। আনু-মানিক ১৬।১৭ বছর বয়সে তিনি তাঁর সাতজন বন্ধু-বান্ধবসহ রুটী-রুজীর ধান্ধায় লাখনৌয়ের পথে বেরিয়ে পড়েন। রায়বেরেলী থেকে লাখনৌয়ের দূরত্ব উনপঞ্চাশ মাইল। সওয়ারী ছিলো মাত্র একটি যার উপর সবাই পালাক্রমে আরোহণ করতো। কিন্তু সৈয়দ আহমদ (র) নিজের পালা আসা মাত্র বন্ধুদের মধ্যে কাউকে না কাউকে জোরপূর্বক সওয়ারীতে উঠিয়ে দিতেন এবং এভাবেই রাতভর তিনি সাথী-বন্ধুদের খেদমত করতেন। জিদ করেই তিনি বন্ধুদের মাল-সামান নিজের কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে পথ চলতেন। এমনি করে সাথীদের খেদমত ও পরিশ্রম করে লাখনৌ পৌঁছেন। সময়টা ছিলো নওয়াব সা'আদত আলী খানের শাসনামল যিনি নওয়াব শুজা'উদ্দৌলার উত্তরাধিকারী ছিলেন। নওয়াব ছিলেন একজন উচ্চ মনোবল ও সাংগঠনিক প্রতিভাসম্পন্ন শাসক। এতদ্‌সত্ত্বেও জমিদার ও বড় বড় ব্যবসায়ী-বণিক ছাড়া সাধারণের মাঝে বেকারত্ব ও অস্থিরতা অত্যন্ত ব্যাপক ছিলো। লাখনৌ পৌঁছে সকল বন্ধু-বান্ধব রুজী-রোজগারের সন্ধানে মত্ত হয়ে পড়লো। রুজী-রোজগারের ব্যবস্থা কদাচিৎ হতো। সারাদিন কঠোর পরিশ্রম ও মেহনতে লিপ্ত থাকার পরও কোন ক্রমে বেঁচে থাকার উপযোগী সামান্য কিছু কোনদিন জুটতো। একমাত্র সৈয়দ আহমদ (র)-ই জনৈক আমীরের ঘরে অবস্থান করছিলেন। তিনি সৈয়দ আহমদের খান্দানকে ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে দেখতেন। আমীরের নিকট থেকে যে খানা আসতো তাও তিনি নিজের সাথী-বন্ধুদের খাইয়ে দিতেন এবং নিজে ডা'ল-রুটির উপর কাল কাটাতেন।

শাহ্ 'আবদুল 'আযীয (র)-এর খিদমতে

চার মাস এভাবেই কেটে যায়। একবার লাখনৌ-এর শাসনকর্তা সফর ও শিকারের উদ্দেশ্যে পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হন। সাথে উক্ত আমীরও তাঁর সফর ও শিকার সঙ্গী ছিলেন যাঁর এখানে সৈয়দ সাহেব মেহমান ছিলেন। সৈয়দ সাহেবও তাঁর বন্ধুদের নিয়ে আমীরের সঙ্গী হন এবং আগের মতোই খিদমত করে এই সফরসূচীর সমাপ্তি টানেন। এ সফরে তাঁকে অত্যন্ত কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। রাস্তাভর সৈয়দ আহমদ স্বীয় বন্ধুদের দিল্লী যাবার জন্যে এবং হযরত শাহ 'আবদুল 'আযীয (র)-এর বিরাট সিন্ধু-তুল্য জ্ঞান ও প্রতিভার ঝলক থেকে উপকৃত ও ধন্য হবার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। অবশেষে তিনি একাই দিল্লীর পথে বেরিয়ে পড়েন।

পুরো সফরটাই পথচারী মুসাফিরদের খিদ্‌মত করতে করতে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত অবস্থায় বিরামহীন গতিতে পথ চলেছেন। চলতে চলতে তাঁর পায়ে ফোস্কা পড়ে যায়। অবশেষে এভাবেই কয়েক দিন পর তিনি দিল্লী পেঁৗছেন এবং হযরত শাহ 'আবদুল 'আযীয (র)-এর খেদমতে উপস্থিত হন। সৈয়দ সাহেবের বুযুর্গদের সাথে বহু আগে থেকেই রূহানী ও জ্ঞানগত সম্পর্ক ছিলো। সৈয়দ সাহেবকে পেয়ে প্রথমে মুসাফিহা (করমর্দন), কোলাকুলী এবং পারস্পরিক পরিচয়ের পর তিনি অত্যন্ত আনন্দ ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। অতঃপর তাঁকে আপন ভাই শাহ্ 'আবদুল কাদির (র)-এর নিকট অবস্থান করার ব্যবস্থা করেন।

হযরত শাহ্ 'আবদুল 'আযীয (র) এবং শাহ্ 'আবদুল কাদির (র)-এর সাহচর্য ও খেদমতে থেকে তিনি এরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেন এবং সেই সমস্ত উচ্চতর মকামসমূহ হাসিল করেন যা বড় বড় মাশায়েখে কিরামের বিরাট রিয়াযত ও মুজাহাদা দ্বারা হাসিল হয়ে থাকে। কিছু কাল পর শাহ্ 'আবদুল 'আযীয (র)-এর থেকে খিলাফত ও এজাযত নিয়ে তিনি নিজের জন্মস্থান রায়বেরেলী ফিরে আসেন। দু'বছর বাড়ীতে অবস্থান করার পর তিনি বিয়ে করেন।

আল্লাহ্ পাক যে মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সৈয়দ সাহেবকে তৈরী করে-ছিলেন এবং জিহাদের যে আবেগ ও উদ্দীপনা তিনি লাভ করেছিলেন, অধিকন্তু যে লক্ষ্যকে তিনি সামনে রেখেছিলেন সহজাতভাবেই তার পরিপূর্ণতা ও অধিকতর পরিপক্কতা কার্যকর অনুশীলন ও প্রশিক্ষণের দাবিদার ছিল। আর এ জন্যে প্রয়োজন ছিলো কোন একটি যুদ্ধের ময়দান।

হিজরী ১২২৬ সনে (১৮১১ খৃ.) তিনি দ্বিতীয়বার দিল্লী সফরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। দিল্লীতে কয়েকদিন অবস্থানের পর শাহ্ 'আবদুল 'আযীয (র)-এর পরামর্শক্রমে নওয়াব আমীর খান (যিনি রাজপুতানা এবং মালব প্রদেশে সৈন্যবাহিনী পরিচালনায় ও যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন)-এর সৈন্যদলে ভর্তি হন। যুদ্ধ-বিগ্রহের বাস্তব ট্রেনিং লাভ, অর্জিত ট্রেনিংকে উদ্দেশ্য ও অর্থপূর্ণ চেষ্টা-সাধনায় নিয়োগ এবং অগ্রসরমান ও সম্প্রসারণশীল ইংরেজ আধিপত্যের বিপদ ও দুর্যোগ মুকাবিলার পথে কাজে লাগাবার জন্যে তিনি তাঁর সাহচর্য ও বন্ধুত্ব লাভের চেষ্টা পান। নওয়াব আমীর খান সম্ভল (রোহিলা খণ্ড)-এর একজন দৃঢ় মনোবলসম্পন্ন আফগান বংশোদ্ভূত আমীর ছিলেন। তিনি তাঁর চার পার্শ্বে দৃঢ়চেতা, অভিযান উন্মুখ এবং বিশ্বস্ত সাথীদের উল্লেখযোগ্য একটি সংখ্যার সমাবেশ ঘটাতে পেরেছিলেন এবং এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থায় পেঁৗছে ছিলেন যে, বিভিন্ন দেশীয় রাজন্যবর্গকেও তার সাহায্য ও সমর্থনের মুখাপেক্ষী হতে হ'তো। তদুপরি ইংরেজরাও এই ক্রমবর্দ্ধমান ও উঠতি শক্তিকে উপেক্ষা করতে পারতো না।

হযরত সৈয়দ আহমদ (র) আমীর খানের সৈন্যবাহিনীতে দু'বছর ছিলেন। তিনি 'ইবাদত-বন্দেগী, আত্মিক সাধনা ও সৈনিক জীবন যাপনের সাথে সাথে সংস্কার-কর্মী এবং ধর্মীয় উপদেশ ও শিক্ষামূলক তৎপরতায়ও নিয়োজিত থাকেন। তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহে, চেষ্টা ও সাধনায় সমগ্র সৈন্যবাহিনী দাওয়াত ও তবলীগের প্রশস্ত ও বিস্তৃত ময়দানে পরিণত হয়ে যায়। সৈনিক-দের সামগ্রিক জীবনে বিপ্লবাত্মক সংস্কার সাধিত হয়। এমন কি আমীর খানের জীবনেও বিপ্লবী পরিবর্তন দেখা দেয়।

দিল্লী প্রত্যাবর্তন ও তবলীগী সফর

ছ'বছর অবস্থানের পর যখন আমীর খান কতকগুলো অবস্থার প্রেক্ষিতে বাধ্য হয়ে এবং নিজের কয়েকজন নিকটতম বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতার কারণে ইংরেজদের সাথে সন্ধি করতে ইচ্ছুক হলেন তখন সৈয়দ সাহেব এর তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁর বিরোধিতা সত্ত্বেও নওয়াব আমীর খান ইংরেজ-দের সাথে একটা নিষ্পত্তিতে উপনীত হন এবং টুংকের জায়গীর কবুল করেন। অতঃপর তিনি নিরাশ হয়ে দিল্লী চলে আসেন।

এ যাত্রায় তাঁর দিকে অস্বাভাবিক জনস্রোতের গতি প্রবাহিত হতে শুরু করে। এবারের অবস্থানকালে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিছে দেহলভী (র)-এর

খান্দানের দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রখ্যাত আলিম মওলানা 'আবদুল হাই (র) এবং মওলানা মুহাম্মদ ইসমা'ঈল (র) তাঁর হাতে বায়'আত বা শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এ দু'জনের বায়'আত গ্রহণের পর দিল্লীর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ স্তরের মানুষ, 'উলামায়ে কিরাম ও মাশায়েখের স্রোত এমনিভাবে তাঁর দিকে প্রবাহিত হ'তে শুরু করে যা ছিলো কল্পনাতীত। দিন দিন তাঁর জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি বাড়তে থাকে। তিনি তবলীগী ও সংস্কারমূলক সফর শুরু করেন। সর্বাগ্রে মুজাফফরনগর এবং সাহারানপুরের ঘন বসতিপূর্ণ ঐতিহাসিক শহরতলী ও পল্লী অঞ্চল, মুসলিম অভিজাতমহল ও 'উলামায়ে কিরামের কেন্দ্রসমূহ, নিজগড়, মুক্তেশ্বর, দোয়াবার এলাকাগুলো, রামপুর, বেরেলি, শাহাজাহানপুর এবং আরো অন্যান্য অঞ্চল সফর করেন। এসব এলাকায় শত শত খান্দান এবং ব্যক্তিবর্গ বায়'আত গ্রহণ করে, শিরক ও বিদ-'আত থেকে তওবা করে এবং 'উলামায়ে কিরাম ও মাশায়েখ তাঁর মুরীদ দলভুক্ত হন। সাহারানপুরের হাজী আবদুর রহীম সাহেব—যিনি সে যুগে অন্যতম বড় বুযুর্গ ছিলেন এবং হাজার হাজার লোক ছিলো তাঁর মুরীদ-মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত—তিনিও হযরত সৈয়দ আহমদ (র)-এর হাতে বায়'আত হন এবং মুরীদদেরও বায়'আত করান। তাঁর এ সফর ছিলো রহমতের বারিধারার ন্যায়। তিনি যে অঞ্চল এবং যেসব এলাকা দিয়ে অতিক্রম করতেন, সে সব এলাকাতেই সবুজের সমারোহ, বসন্ত ও প্রাচুর্যের সোনালী আভা পেছনে রেখে যেতেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা এরূপ যে, যেখানে তিনি অল্প কিছুক্ষণের জন্যও অবস্থান করেছেন সেখানেই মসজিদগুলো প্রাণবন্ত ও উজ্জ্বল আভা ফিরে পেয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূল (স.)-এর আলোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে। একদিকে সৃষ্টি হয়েছে ঈমানের সজীবতা, সুন্নতে নববী (স')-এর অনুসরণের প্রতি প্রবল আগ্রহ ও ইসলামী জোশ এবং অপরদিকে সৃষ্টি হয়েছে শিরক্ ও বিদ'আতের প্রতি ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা, লোপ পেয়েছে শী'আ ও রাফেজীদের বাতিল মতবাদ ও ভ্রান্ত চিন্তাধারা। গোটা সফরে মওলানা মুহাম্মদ ইসমা'ঈল (র) এবং মওলানা 'আবদুল হাই (র) তাঁর সঙ্গী ছিলেন। এঁদের ওয়াজ-নসীহতে জনসাধারণের মন-মগজে বিপ্লব সৃষ্টি হয় এবং ঈমান ও আমলের সংস্কার ও পরিশুদ্ধতা সাধিত হয়।

স্বদেশে

এই সফরের পর তিনি নিজ বাসভূমি রায়বেরেলী ফিরে আসেন। এ সময় ঐ এলাকাতে খরা ও দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছিলো। চারদিকেই চলছিলো হতাশা, অনাহার, দারিদ্র্য আর নিঃস্বতার রাজত্ব। এমতাবস্থায়ও তাঁর উপর অর্পিত ছিলো একশত লোকের রুটি-রুজির যিম্মদারী। কিন্তু তাঁর অন্তর-মানসে ছিলো আল্লাহ্ প্রদত্ত শান্তি ও তৃপ্তি এবং তাঁরই প্রতি অগাধ আস্থা ও ভরসায় (তাওয়াক্কুল) পরিপূর্ণ। তাঁর সাহচর্যে অবস্থান করছিলেন তৎকালীন ভারতবর্ষের বড় বড় 'উলামায়ে কিরাম, প্রখ্যাত সূফী এবং খানকাহ্‌বাসী ফকীর ও বুযুর্গ। প্রত্যেকেই নিজেদের জ্ঞান ও মর্যাদার দিক দিয়ে সাফল্যের সুউচ্চ সোপানে অবস্থান করা সত্ত্বেও হযরত সৈয়দ আহমদ (র)-এর জ্ঞানের কণা ও ফয়েয লাভে ধন্য হতেন। এমনি করেই তিনি নিজ সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে খেদমতে খাল্‌কের (সৃষ্ট জীবের সেবা ও কল্যাণ) কার্যক্রমে শরীক হতেন। ছোট্ট এ গ্রামটি একই সময়ে একটি ঘনবসতি ও লোকজন পরিপূর্ণ খানকাহ্, একটি দীনি মাদরাসা এবং একটি জিহাদের ময়দানে পরিণত হয়েছিলো। এ সময়টি ছিলো গভীর আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষা, নেশা ও মত্ততা, আনন্দ ও তৃপ্তি, স্বাদ ও মিষ্টতা এবং পর্যাপ্ত পরিশ্রম ও সাধনার। স্বীয় বাসভূমিতে অবস্থানকালে তিনি এলাহাবাদ, বেনারস, কানপুর এবং সুলতান-পুর সফর করেন। সামান্য দূর অতিক্রম করতে না করতেই লোকজন দলে দলে এসে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতো এবং বায়'আত হ'তো।

লাখনৌয়ে তবলীগী সফর

লাখনৌয়ের ছাউনিতে পাঠানদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বসতি ছিলো। তারা সৈয়দ সাহেবের ঊর্ধ্বতন বুযুর্গদের এবং খোদ তাঁর ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলো। তাদের মধ্যে বিশেষ করে নওয়াব ফকীর মুহাম্মদ খানের নাম উল্লেখযোগ্য। এদের আগ্রহাতিশয্যে তিনি উপকার ও কল্যাণ মানসে এবং সংস্কারের আশায় ১৭০ জনের একটি কাফেলাসহ লাখনৌ সফর করেন। তাঁর এ সফরে মওলানা মুহাম্মদ ইসমা'ঈল (র) এবং মওলানা মুহাম্মদ 'আবদুল হাই (র) সাথে ছিলেন। সময়টা ছিলো নওয়াব গাযী উদ্দীনের নবাবী এবং নওয়াব মু'তামিদ উদ্দৌলাহ্ আগা মীরের মন্ত্রীত্বকাল। এ সময়ে লাখনৌয়ে সম্পদের অপচয়, বিশৃঙ্খলা, অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ ও ছিনতাই এবং বিলাস-ব্যসনের রাজত্ব চলছিলো। আরাম-আয়েশ, ভোগ-

বিলাস, খেল-তামাশা এবং হাসি-ঠাট্টায় লাখনৌ ছিলো গুলযার। এর সাথে শহরবাসীদের মধ্যে প্রভাব-প্রতিপত্তি সৃষ্টির যোগ্যতা যেমন ছিলো, তেমনি ছিলো দীন ও ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের মহিমা ও অনুপম মর্যাদা। লাখনৌ ছিলো যেমনি 'উলামা ও মাশায়েখে কিরামের কেন্দ্র, তেমনি অন্যান্য ছোট ছোট শহর ও পল্লীর শরীফ খান্দান বা অভিজাত পরিবারের জ্ঞানী-গুণীগণ এখানে এসে জড়ো হয়েছিলেন। মানুষের এ সমৃদ্ধ ভাণ্ডারে শত শত মূল্যবান মণিমুক্তা ছিলো, যা রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার একটু স্পর্শ বা দৃষ্টির অপেক্ষায় যেন অপেক্ষমান ছিলো।

হযরত সৈয়দ সাহেব এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ গোমতীর তীরে পীর শাহ মুহাম্মদের টিলায় অবস্থান করেন। তিনি এখানে পৌঁছুতেই লোকজনের আগমন শুরু হয় এবং ভীড়ও ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে। সকাল থেকে রাত অবধি লাকজনের সমাগম ও সমাবেশ থাকে একই রূপ। মওলানা মুহাম্মদ ইসমা'ঈল ও মওলানা মুহাম্মদ 'আবদুল হাইয়ের অব্যাহত প্রভাব সৃষ্টিকারী এবং অন্তরে রেখাপাতকারী ওয়াজ-নসীহতের ফলে লাখনৌয়ের স্থায়ী অধি-বাসীদের মধ্যে বিরাট বিপ্লব সৃষ্টি হয়। তাতে হাজার হাজার মানুষের জীবনের গতিধারাই আমূল পরিবর্তিত হয়ে যায়। লোকেরা এসে তওবা করতো আর নতুনতর ঈমানী জীবন ও যিন্দেগীতে পদার্পণ করতো। সৈয়দ আহমদ শহীদ এবং তাঁর জামা'আতের কয়েকদিনের অবস্থানের ফলে লাখনৌ-বাসীদের রূহানী ফয়েয ও বরকত লাভ সম্ভব হয়। বড় বড় 'উলামায়ে কিরাম ও মাশায়েখ তাঁর দরবারে হাযির হতেন এবং ধন্য হতেন বায়'আত লাভ করে। প্রতিটি জুম'আর দিনে মওলানা 'আবদুল হাই এবং মওলানা মুহাম্মদ ইসমা'ঈলের ওয়াজ হ'তো। বিভিন্ন পরিবার ও তাদের আত্মীয়-স্বজনেরা এখানেও সৈয়দ সাহেবের নিকট বায়'আত গ্রহণ করতো এবং শিরক ও বিদ'আত থেকে তওবা করতো। বেশুমার দাওয়াত তিনি পান এবং এ সমস্ত দাওয়াতে তাঁর কারামতের প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। এসব দেখার পর আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আত ছাড়াও শী'আ এবং অমুসলিম এমনকি শাসক সম্প্রদায় পর্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়ে। শিরক ও বিদ'আতের বাজার পড়ে ঝিমিয়ে। পাপ, অন্যায় ও দুষ্কৃতিতে লিপ্ত ব্যক্তিরা তওবাকারীতে পরিণত হয়। সৈয়দ আহমদের দিকে জনস্রোতের এরূপ প্রবাহ এবং শী'আ মতবাদী-দের এরূপ সাধারণ তওবার আধিক্যের ফলে সরকার ও সরকারী কর্মচারীবৃন্দ আতংকিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তারা আকারে ইঙ্গিতে ব্যাপারটা প্রকাশ

করে। কিন্তু তিনি ও তাঁর সাথী 'উলামায়ে কিরাম 'কলেমায়ে হক' (হক-কথা) বলা এবং সত্যিকার ও বিশুদ্ধ দীনের দিকে জনগণকে আকৃষ্ট করবার ব্যাপারে কোন কিছুরই তোয়াক্কা করেন নি। তিনি অত্যন্ত ঠাণ্ডা মেযাজে নিজ কর্মে ব্যাপৃত থাকেন।

একমাস পর তিনি দেশে ফিরে আসেন। দেশে অবস্থানকালে পাঞ্জাবের মুসলমানদের উপর কৃত জুলুম-নির্যাতনের কারণে তিনি এসবের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত তীব্রভাবে অনুভব করতে থাকেন, যা প্রথম থেকেই তাঁর অন্তর-মানসে কাজ করে আসছিলো। এ অনুভূতি অবশেষে অস্থিরচিত্ততায় রূপলাভ করে। এরপর তিনি শক্ত-সমর্থ ও মোটা-সোটা চেহারার লোক দেখলেই বলতেন,---এরূপ লোকেরাই প্রকৃত কাজের এবং এ ধরনের লোকই আমাদের কাজের জন্য দরকার। অধিকাংশ সময়েই তিনি অস্ত্রসজ্জিত থাকতেন যেন অন্যেরা এর গুরুত্ব বুঝতে পারে। সামরিক প্রশাসন ও মহড়া চলতো। লক্ষ্যভেদসহ আরও বহুবিধ সামরিক কলাকৌশ-লের অনুশীলন করা হ'তো।

হজ্জ উদ্‌যাপন

সে যুগে ইসলামের অন্যান্য প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠান দুর্বল হবার সাথে সাথে হজ্জের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকনও 'উলামায়ে কিরামের ফিক্‌হী ওযর-আপত্তির ভিত্তিতে একেবারেই পরিত্যক্ত অথবা গাফলতির শিকারে পরিণত হয়েছিলো। কিছু সংখ্যক 'উলামা ভারতবর্ষের মুসলমানদের উপর থেকে হজ্জ পালনের বাধ্যবাধকতা রদ হয়ে গেছে বলে ফতওয়াও প্রদান করে-ছিলেন। সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) এ ফিতনারও মূলোৎপাটন করেন এবং এ ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজনীয় মনে করে 'উলামায়ে কিরাম ও প্রখ্যাত সুধীবৃন্দের একটি বিরাট দল নিয়ে হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে সফর শুরুকরেন। বিভিন্ন স্থানে হজ্জের তবলীগ সম্পর্কে চিঠি-পত্রাদি লেখান। সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর এই ঘোষণা এবং প্রেরিত চিঠিপত্রের কারণে বিভিন্ন স্থান থেকে হজ্জ পালনকারীদের সারিবদ্ধ আগমন শুরু হয়। লোকজন পতঙ্গের মত চতুর্দিক থেকে ধেয়ে আসতে থাকে। ১২৩৬ হিজরীর ১লা শওয়াল মুতাবিক ১৮২১ খৃস্টাব্দের ২রা জুলাইয়ে 'ঈদের সালাত আদায়ের পর চারশত সঙ্গী-সাথী সমভিব্যাহারে তিনি নিজ বাসভূমি থেকে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

প্রথমে তিনি রায়বেরেলী থেকে দালমূ আগমন করেন এবং সেখান থেকে নৌকাযোগে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে জায়গায় জায়গায় তাঁর এবং মওলানা মুহাম্মদ ইসমা'ঈল (র) ও মওলানা মুহাম্মদ 'আবদুল হাই (র)—অধিকন্তু কাফেলায় শরীক অন্যান্য 'উলামায়ে কিরামের ওয়াজ-নসীহতও হ'তো। এতে প্রচলিত শির্‌ক-বিদ'আতের উচ্ছেদ এবং 'আমল ও 'আকীদার সংস্কার সাধিত হয়। এলাহাবাদে হাজার হাজার নারী-পুরুষ আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। কেউ কেউ মনে করেন শহরে এমন কোন মুসলমান ছিলো না, যে সৈয়দ বেরেলভী (র)-এর হাতে হাত দিয়ে বায়'আত হন নি। মির্জাপুরের প্রায় পুরো শহরটাই ভক্ত-অনুসারীতে পরিণত হয়ে যায়। বেনারসে অসংখ্য মানুষ তাঁর মুরীদ হয় এবং 'উলামায়ে কিরাম ও মাশায়েখ হযরত বেরেলভী (র)-এর সিলসিলাভুক্ত হন। তাতে শির্‌ক ও বিদ'আতের উপর প্রচণ্ড আঘাত লাগে। এরপর তিনি গাযীপুর, দানাপুর হয়ে পাটনায় উপনীত হন। এখানে তিনি দু'সপ্তাহ কাল অবস্থান করেন। অবস্থানকালে ইসলামী শরীয়তের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার এবং শির্‌ক-বিদ'আতের মূলোৎপাটনের কাজ পুরোমাত্রায় অব্যাহত থাকে। 'আজীমাবাদের কতিপয় তিব্বতী মুসলমানকে তিনি তবলীগের উদ্দেশ্যে তাদের স্বদেশভূমিতে পাঠিয়ে দেন। তাদের প্রয়াস ও প্রচেষ্টা সুদূর চীন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। 'আজীমাবাদের পর তিনি কলকাতা এসে উপস্থিত হন। কলকাতা অবস্থানের মেয়াদ ছিলো তিন মাস। সৈয়দ বেরেলভী (র)-এর অবস্থানের ফলে তদানীন্তন ভারতবর্ষের বৃহত্তম নগর এবং বৃটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতায় একটি ধর্মীয় বিপ্লবের সৃষ্টি হয়। মহল্লা ও গোত্রের চৌধুরী ও সর্দারগণ নিজ নিজ মহল্লা ও খান্দানে ঘোষণা করে দেন যে, যারা এখনও পর্যন্ত সৈয়দ সাহেবের হাতে হাত দিয়ে বায়'আত গ্রহণ করেনি এবং ইসলামী শরীয়ত অনুসরণের পক্ষে দৃঢ় ভূমিকা গ্রহণ করেনি তাদের সাথে সকল প্রকার ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক রহিত হবে। এ ঘোষণা প্রচারিত হবার পরপরই তওবাকারীদের কাতার লেগে যায়। শুড়িখানায় ধূলো উড়তে থাকে। বিলাস-ব্যসন ও পাপাচারের আড্‌ডাগুলো মরুভূমি সদৃশ নিস্তব্ধ শূন্যতায় হাহাকার করতে থাকে। টিপু সুলতানের পৌত্ররাও—যাদের পূর্বপুরুষদের সাথে সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর পূর্বপুরুষদের সম্পর্ক ছিলো—তাঁর তাওয়াজ্জুহ দ্বারা উপকৃত হন। তিন মাস পর তিনি কলকাতা থেকে রওয়ানা হন। সে সময় তাঁর হজ্জের

সফর-সঙ্গী ছিলো ৭৭৫ জন। দর্শনপ্রার্থী মুসলমান, খৃস্টান এবং হিন্দুদের ভীড় এরূপ ছিলো যে, রাস্তাঘাট বন্ধ হবার উপক্রম হয়ে যেতো। লোকজনের পক্ষে রাস্তা অতিক্রম ছিলো কষ্টসাধ্য ব্যাপার। পথিমধ্যে বিভিন্ন বন্দর ও সমুদ্রোপকূলবর্তী স্থানগুলোতে অবতরণ, থামা এবং ওয়াজ-নসীহত ও ধর্মীয় উপদেশ প্রদান করতে করতে ২৩শে শা'বান ১২৩৭ হিজরীর বুধবার মুতাবিক ১৮২২ খৃস্টাব্দের ১৬ই মে তিনি জেদ্দায় গিয়ে উপনীত হন এবং ২৮শে শা'বান তারিখে হারাম শরীফে প্রবেশ করেন।

এরূপ পবিত্র স্থানেও তাঁর ফয়েয প্রদানের ধারা অব্যাহত থাকে। হারাম শরীফের ইমাম, মক্কা মু'আজ্জমার মুফতী এবং অন্যান্য বহু আরবী 'উলামা কিরাম তাঁর মুরীদ হন। অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ ও নেতৃস্থানীয় 'উলামায়ে কিরামও তাঁর নিকট থেকে ফয়েয হাসিল করেন। রমযানু'ল-মুবারক কাটে মক্কা মুকাররমায়। হজ্জের দিনগুলোতে তিনি আকাবার প্রথম প্রান্তরের যেখানে আনসারদের প্রথম দল হুযূরে আকরাম (স·)-এর হাতে হাত দিয়ে বায়'আত হয়েছিলেন এবং যেখানে হিজরতের প্রথম বুনিয়াদ স্থাপিত হয়েছিলো—সমস্ত সঙ্গী—সাথীদের থেকে জিহাদের বায়'আত গ্রহণ করেন।

এরপর মক্কা মুকাররমা থেকে মদীনা মুনাওয়ারা গমনের তিনি সিদ্ধান্ত নেন এবং সেখানে অবস্থান করেন। সেখানেও 'উলামায়ে কিরাম ও মাশায়েখ, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সর্বসাধারণ সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর খিদমতে সমান বেগে আসতে শুরু করে। মদীনা থেকে তিনি মক্কায় ফিরে আসেন। এরপর দ্বিতীয় রমযানও মক্কা মুআজ্জমায় অতিবাহিত করেন; দ্বিতীয় দফা হজ্জ সমাপনান্তে ১২৩৯ হিজরীর ১লা রমযান মুতাবিক ১৮২৪ খৃস্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল তিনি রায়বেরেলী প্রত্যাবর্তন করেন।

দেশে বিভিন্নমুখী ব্যস্ততা

১২৩৯ হিজরীর ১লা রমযান মুতাবিক ১৮২৪ খৃস্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল থেকে ১২৪১ হিজরীর ৭ই জমাদিউছ-ছানী মুতাবিক ১৮২৬ খৃস্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত এক বছর দশ মাস তিনি রায়বেরেলীতে অবস্থান করেন। এখানে এটাই ছিলো জীবনের শেষ অবস্থান। এ সময়কার অবস্থানকালের বিভিন্নমুখী ব্যস্ততার মধ্যে লোকদের জিহাদের জন্য দাওয়াত

এবং এজন্য প্রয়োজনীয় উৎসাহ-অনুপ্রেরণা দান—তৎসহ বন্ধু-বান্ধব ও সঙ্গী-সাথীদের ঈমান ও আমলের তরবিয়ত অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এই সুদীর্ঘ সময়টা এমনি এক পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যে অতিবাহিত হয় যার ভেতর একদিকে ধর্মীয় উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং জনগণের ঈমান ও আকীদা-গত উন্নতি ও বিকাশের প্রয়োজনীয় সামান-আসবাব যেমনি ছিলো, অপরদিকে তেমনি ছিলো নিরলস পরিশ্রম ও সাধনা, নিরন্তর সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার অনন্য প্রয়াস, সাদাসিধে সৈনিক জীবন এবং আত্মহনন ও আত্মত্যাগের ঐশ্বর্যমণ্ডিত শিক্ষা। গোটা অবস্থানকালীন সময়টাই ছিলো তাঁর নিজ গ্রাম দায়েরায়ে শাহ্ 'আলামুল্লাহ্ (র) কার্যকরী ও আধ্যাত্মিকতার প্রশিক্ষণ দান কেন্দ্র হিসাবে বিরাজমান।

হিজরতের প্রয়োজনীয়তা

গোটা ভারতবর্ষে সে সময় ইসলামের এবং এর ধারক বাহক-উলা-মায়ে কিরাম ও সুধী পণ্ডিতমণ্ডলীর যে করুণ, অসহায় ও দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা, তার পুরো ছবি সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর চোখের সামনে ছিলো। অমুসলিম শক্তিগুলোর বিজয়মণ্ডিত রূপ তিনি দেখছিলেন। বিশেষ করে পাঞ্জাবের মুসলমানদের উপর কৃত জুলুম-নির্যাতন সহ্যের সকল সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। সেখানকার মুসলমানেরা গোলামীর হীন, নিকৃষ্ট ও অপমা-নকর জীবন যাপন করছিলো এবং সমগ্র জাতিই ছিলো হতাশা, বঞ্চনা ও অবমাননাকর লাঞ্জনা-গন্ছনার শিকার। মুসলমানদের সহায়-সম্পত্তি ও বিত্ত-সম্পদ কথায় কথায় ছিনিয়ে নেয়া হতো। লাহোরের বিখ্যাত শাহী মস-জিদের হুজরাগুলি পরিণত হয়েছিলো শাহী আস্তাবলে; কতিপয় স্থানে আযানের উপরও বাধা-নিষেধ এবং বহুবিধ ইসলামী আচার-অনুষ্ঠান ও প্রথা-পদ্ধতির উপর নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দেওয়া হয়। ঐরূপ গোলামী ও অব-মাননাকর ঘৃণ্য আচার-ব্যবহারের ফলে মুসলমানদের মধ্যে হতাশা, অস্থিরতা ও চিত্ত বৈকল্য দেখা দেয়।

বিস্তৃত সীমান্ত প্রদেশ ছিলো সামরিক যোগ্যতাসম্পন্ন ও প্রতিভাধর মুসলিম বংশধরদের আবাসভূমি। সেখানকার মুসলমানরাও ছিলো সুস্পষ্টরূপে সংখ্যা-গরিষ্ঠ। (সারা ভারতে) মুসলমানদের একে তো অবমাননা, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা এবং পরাধীন জীবন—তদুপরি চরম মুসলিম-বিদ্বেষ অমুসলিম

শক্তিকে অত সহজে উপেক্ষা করা যায় না। এটা দিল্লীর কেন্দ্র এবং গোটা উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের জন্য—অধিকন্তু সীমান্ত প্রদেশ ও আফগানিস্তানের জন্যেও একটি স্থায়ী হুমকি ও বিপদের কারণ ছিলো। সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের এটা ছিলো বিরাট দূরদর্শিতা এবং রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচায়ক যে, তাঁরা এ জাতীয় বিপদ অনুভব করেছেন এবং অতঃপর জিহাদী তৎপরতা চালাবার ক্ষেত্রে পাঞ্জাবকেই অগ্রাধিকার প্রদান করেন।

ভারতবর্ষের বুকে ইংরেজ আধিপত্য, মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক গৃহযুদ্ধ ও বিশৃঙ্খলা এবং ইসলামের এই শোচনীয় অবনতি ও অধঃপতন দৃশ্য সৈয়দ সাহেবকে অস্থির করে তোলে। তাঁর মতে—আল্লাহ্‌র সত্য ও সমুজ্জল কলেমা ঘোষণা এবং মুসলিম বিশ্বের শৃঙ্খল মুক্তির আবশ্যকতা —প্রতিটি আত্ম-মর্যাদাবোধসম্পন্ন, কর্তব্যপরায়ণ ও দায়িত্ববোধে উদ্দীপ্ত মুসলমানের নিকট জিহাদের দাবী জানাচ্ছিলো। তাঁর দৃষ্টিতে জিহাদ ছিলো ইসলামী জীবন-দর্শনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা এবং এর পরিপূর্ণ ও শেষ ধাপ। তিনি হিজরতকে জিহাদের ভূমিকা বা পূর্ব-পদক্ষেপ হিসেবে মনে করতেন এবং তা এজন্যে যে, সে সময়কার অবস্থা ও পরিস্থিতির দাবী অনুযায়ী হিজরত ব্যতিরেকে জিহাদ সম্ভব ছিলো না। কুরআন শরীফের স্পষ্ট আয়াত এবং প্রকাশ্য হাদীছগুলোর প্রেক্ষিত এ নির্দেশ বাস্তবায়নের প্রতি তাঁকে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও তাঁরই প্রতি অসীম ভালবাসাই তাঁর অন্তর-মানসে জিহাদের প্রেরণা জাগায়। অতঃপর উল্লিখিত পরিস্থিতি তাঁর অন্তর রাজ্যে জিহাদের প্রতি প্রবল আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে।

হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর নিকট যদিও আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিলো ভারতবর্ষ গোটাটাই—যেমন ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের রাজন্যবর্গ এবং বহির্বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম নৃপতির নিকট প্রেরিত বহু চিঠি-পত্রের মাধ্যমে জানা যায়। কিন্তু পাঞ্জাবে রঞ্জিৎসিংহের নিয়মিত ও প্রতিষ্ঠিত শাসন-কর্তৃত্বাধীনে সেখানকার মুসলিম জনসাধারণ হয়ে পড়েছিলো তার নির্মম জুলুম-নির্যাতনের শিকার। আর এ কারণেই এসব অসহায় ও জুলুম-নির্যাতনে নিষ্পেষিত মুসলমানদের তাৎক্ষণিক সাহায্য করাই ছিলো তাঁর আশু কর্তব্য। অধিকন্তু সামরিক কৌশল এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতা

দাবী করছিলো যে, এ অভিযান যেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে শুরু করা হয়। কারণ সেটা ছিলো শক্তিশালী ও উৎসাহ প্রদীপ্ত আফগান (পাঠান) উপজাতির কেন্দ্রভূমি আর তাদের বহু বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও বংশীয় লোকজন সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছিলো। এদের অনেকেই তাঁর সৈন্যবাহিনীতেও শামিল ছিলো। তারা তাঁকে এ আশ্বাসও দিয়েছিলো যে, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিলের এ সংগ্রামে উপজাতিরা সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করে যাবে। অধিকন্তু এখান থেকেই স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্রের এমন একটি সিলসিলা শুরু হয়, যা তুরস্ক পর্যন্ত গিয়ে পেঁৗছে। তিনি প্রথম থেকেই এ কাজের জন্য নিজেকে এবং নিজ জামা'আতকে প্রস্তুত করে চলছিলেন।

হিজরত

১২৪১ হিজরীর ৭ই জমাদিউছ-ছানীর সোমবার মুতাবিক ১৮২৬ খৃস্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী তিনি নিজ বাসভূমি রায়বেরেলীকে বিদায়ী সালাম জানান। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পেঁৗছুবার জন্য তিনি সংযুক্ত মালব প্রদেশের এলাকাসমূহ, রাজপুতানা, মারওয়াড়, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, আফগানিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের মরুভূমি, মালভূমি, পাহাড়-পর্বত, গিরিপথ, বন-জঙ্গল, নদীনালা ও জলাভূমি এলাকা অতিক্রম করেন। এসব অতিক্রম করাটাও ছিলো এক ধরনের জিহাদ। কোথাও পানির স্বল্পতা, কোথাও রসদপত্রের ঘাটতি, চলার অনুপযোগী পথ-ঘাট, দুর্গম স্থান, লুটেরা ও ডাকাত দলের বিপদাশংকা, ক্ষুধা-তৃষ্ণার তীব্রতা, অপরিচিত দেশ ও জাতিসমষ্টি, ভাষার বিভিন্নতা, আবার কোথাও বা নরম-গরম মেযাজ—এ সবেরই সম্মুখীন হতে হয়েছে। এ ছাড়াও ছিলো সন্দেহ, সংশয় ও অবিশ্বাস, অনুসন্ধান ও গোয়েন্দাগিরি—সব কিছুই সামনে এসে দেখা দিয়েছে। এ কাফেলায় দিল্লী, অযোধ্যা এবং দোয়াবার অভিজাত লোকজন, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, 'উলামায়ে কিরাম ও মাশায়েখ, আমীর-ওমরা পরিবারভুক্ত সৌখিন ও ধনাঢ্য ব্যক্তি, শৌর্য-বীর্যের অধিকারী যুবক, জিহাদী জোশে উদ্দীপ্ত ও উদ্বেলিত ক্ষীণকায় ও দুর্বল সবাই শরীক ছিলেন। কাফেলার সদস্য সংখ্যা ছিলো ছ'শো।

প্রথম মঞ্জিল তিনি দালমূ নামক স্থানে অতিবাহিত করেন। এরপর ফতেহ্পুর, বান্দাহ, জালুন, গোয়ালিয়র ও টুংক গমন করেন। প্রতিটি

জায়গায় এবং প্রতিটি স্থানে লোকজন তাঁকে খোশ-আমদেদ জানায়। শুরু হয় বায়‘আত গ্রহণ ও মুরীদ হবার পালা। গোয়ালিয়র মহারাজার অভিলাষক্রমে তিনি তাঁকে সাক্ষাত দান করেন। মহারাজা সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর খিদমতে নযর-নেয়ায পেশ করেন। এরপর তিনি গোয়ালিয়র থেকে টুংক গমন করেন। টুংকের নওয়াব আমীর খান (যার সৈন্যদলে তিনি ছ'বছর কাটিয়েছিলেন) অত্যন্ত সাদর ও উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান এবং সামনের সফরে অনেকদূর পর্যন্ত তাঁকে অনুসরণ করেন। টুংক থেকে আজমীর ও পালি হয়ে মারোয়াড়ের দুর্গম মরুভূমি অতিক্রম করে বিভিন্ন স্থানে যাত্রা বিরতি ঘটিয়ে অবশেষে সিন্ধু প্রদেশের হায়দারাবাদে পেঁীছেন। পথিমধ্যে হাজার হাজার নারী-পুরুষ বায়‘আত গ্রহণ করে এবং বহু লোক তাঁর অনুগামী হয়। সে সময় সিন্ধু ছিলো স্বায়ত্তশাসিত শাসকদের অধীন। তাঁরা ছিলেন একই খান্দানের লোক এবং তাঁদের শাসনাধীন এলাকায় লাখ লাখ যুদ্ধবাজ, নিপুণ লড়াকু ও অভিজ্ঞ যোদ্ধা ছিলো। অনুরূপ বিরাট সংখ্যক লোক সর্বজনমান্য একজন বুযর্গ-মাশায়েখের অনুসারী ছিলো। তারা সারা সিন্ধুতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান করছিলো। এরা সবাই হযরত বেরেলভী (র)-কে সাদর অভ্যর্থনা জানায় এবং তাঁকে সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করে। হায়দরাবাদের শাসনকর্তা মীর মুহাম্মদ, অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও মাশায়েখ সৈয়দ বেরেলভী (র)-এর হাতে হাত রেখে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন।

এক সপ্তাহকাল হায়দরাবাদ অবস্থানের পর তিনি পীরকোট গমন করেন এবং সেখানে দু'সপ্তাহকাল অবস্থান করেন। সেখান থেকে তিনি শিকারপুর যান এবং সিন্ধুর বুযুর্গ ও মাশায়েখে কিরামের সাথে মুলাকাত করেন।

শিকারপুর থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন স্থানে যাত্রা বিরতি করে জিহাদের দাওয়াত দিতে দিতে তিনি ছত্তরভাগ ও ঢাডর নামক স্থানে পেঁৗছান। ঐ সমস্ত এলাকায় ‘উলামায়ে কিরাম, সূফী সম্প্রদায় এবং সাধারণ মানুষ তাঁর পবিত্র হাতে চুমা দিতে ও সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভে সক্ষম হয়। তিনি তাঁর পুরো কাফেলা নিয়ে বোলান গিরিপথের সংকীর্ণ ও বিপদজনক রাস্তা অতিক্রম করেন। বোলান গিরিপথ একটি প্রাকৃতিক রাস্তা। আল্লাহ্‌র অপার কুদরত দৃঢ়চেতা ও উদ্যমী বিজেতা এবং প্রয়োজন মুখাপেক্ষী

মুসাফিরদের জন্য এই দীর্ঘ পর্বতশ্রেণীর ভেতর এটা সৃষ্টি করে রেখেছেন। এটাই ভারতবর্ষকে আফগানিস্তান থেকে আলাদা করে রেখেছে। বোলান গিরিপথ অতিক্রম করে তিনি শাল (কোয়েটা) পৌঁছান। শালের আমীর তাঁকে অত্যন্ত খাতির ও সমাদর করেন এবং স্থানীয় 'উলামায়ে কিরাম সৈয়দ সাহেবের নিকট বায়'আত হন ।

আফগানিস্তানে

শাল (কোয়েটা) থেকে রওয়ানা হয়ে তিনি কান্দাহার গমন করেন। সে সময় আফগানিস্তানে বার্কযাঈ ভাইদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত ছিলো। তাদের বলা হতো দুররাণী। কান্দাহারে দুল খান, গযনীতে মীর মুহাম্মদ খান, কাবুলে দোস্ত মুহাম্মদ খান ও সুলতান মুহাম্মদ খান এবং পেশোয়ারে ইয়ার মুহাম্মদ খান শাসন কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাদের মধ্যে বিরাট অনৈক্য ও মতবিরোধ ছিলো। তাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ লেগেই থাকতো। সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর এও একটি কাজ ছিলো যে, তিনি এদের মধ্যে বিরাজিত পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও মতানৈক্য দূর করে একসূত্রে আবদ্ধ করবেন এবং তাদের ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদে উদ্দীপ্ত করে তুলবেন।

তিনি কান্দাহার গিয়ে পৌঁছুলে কান্দাহারের শাসনকর্তা আগু বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানায়। এমনিভাবে শহরের হাজার হাজার 'উলামায়ে কিরাম ও অভিজাত ব্যক্তিবর্গ পায়দল এগিয়ে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়। প্রচণ্ড ভীড়ের ফলে সড়ক-পথ বন্ধ হয়ে যায়। চার দিন তিনি কান্দাহার অবস্থান করেন। প্রতিটি ব্যক্তিই ছিলো হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর সাথে জিহাদে শরীক হবার জন্য অস্থির ও ব্যাকুলপ্রায়। এরপর তিনি কান্দাহার থেকে গযনী গমন করেন। প্রায় চার শো' সম্মানিত 'উলামা ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, মাদরাসার ছাত্র ও খানকাহ্‌বাসী মাশায়েখ জিহাদী জোশে উদ্দীপিত ও উদ্বেলিত--শির দেবার জন্যে তৈরী হয়ে হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর সহগামী হয়। এদের মধ্যে বাছাই করে চূড়ান্ত পর্যায়ে মাত্র দু'শো সত্তরজন তিনি সাথে রাখেন । কান্দাহার ও গযনীর পথে তিনি গযনীর শাসনকর্তা মীর মুহাম্মদ খান ও কাবুলের শাসনকর্তা সুলতান মুহাম্মদ খানকে পত্র লেখেন এবং স্বীয় আগমনবার্তা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যক্ত

করে তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেন। গযনী পৌঁছুলে শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, জ্ঞানী-গুণী ও বয়োঃবৃদ্ধজন ছাড়াও অগণিত মানুষ কেউবা পশুতে সওয়ার হয়ে, কেউবা পায়ে হেটে হেটে--দু'ক্রোশ পথ এগিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়। তিনি সুলতান মাহমূদ গযনবীর মাযার সন্নিকটে সৈন্যদের ছাউনী ফেলেন এবং এখানেও বহু সংখ্যক মানুষ তাঁর হাতে হাত রেখে বায়'আত হয়।

গযনীতে দু'দিন অবস্থানের পর তিনি কাবুল গমন করেন। নেতৃস্থানীয় ও সরকারী দায়িত্বে উচ্চ পদে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ এবং হাজার হাজার সাধারণ মানুষ সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-কে অভ্যর্থনা জানাবার উদ্দেশ্যে শহর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। ঘোড়ার খুরে এবং লোকজনের প্রচণ্ড ভীড়ের চোটে এত ধূলো উড়তে থাকে যে, চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়। ফলে কোন কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো না। কাবুলের শাসনকর্তা সুলতান মুহাম্মদ খান আপন তিন ভাইসহ পঞ্চাশজন ঘোড়সওয়ার সমভিব্যাহারে অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়ে থাকেন। সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) দেড় মাস কাল কাবুলে অবস্থান করেন। এখানে তিনি জিহাদ, আত্মিক, ও নৈতিক পরিশুদ্ধি এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ব্যাপৃত থাকেন। তাঁর পবিত্র সাহচর্যে সর্বসাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সবাই উপকৃত হতে থাকে। তাঁর কাফেলার ঈমানী আভায় দীপ্ত ও সমুজ্জ্বল অবস্থা, জিহাদী জোশ্ ও জযবা এবং আল্লাহ্র রাহে জান কুরবান করবার প্রবল আগ্রহ ও আকুতি লক্ষ্য করে তারাও এ পবিত্র কাফেলায় শরীক হচ্ছিলো। তিনি বার্কযাঈ ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে সন্ধি ও সমঝোতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং এজন্যে ছ'সপ্তাহ অবস্থানও করেন। কিন্তু এ প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। বাধ্য হয়ে তিনি পেশোয়ারের পথে যাত্রা শুরু করেন। পথিমধ্যে মুসলিম জনসাধারণ উৎসাহ ও আবেগের সাথে তাঁকে অভ্যর্থনা জানায় আর গোটা সফরকালেই এ দৃশ্য আবর্তিত হতে থাকে। পেশোয়ারে তিন দিন অবস্থানের পর তিনি হশ্ত নগরে কয়েক দিন অবস্থান করেন এবং সেখানে মুসলমানদের জিহাদের জন্য প্রস্তুত করেন। অতঃপর নওশেহরা আগমন করেন। এখান থেকেই তিনি জিহাদের ন্যায় প্রিয় আমল এবং শ্রেষ্ঠ ও মহান 'ইবাদতের শুভ উদ্বোধন করেন। এটা ছিলো তাঁর বছরের পর বছরের দাওয়াত, তবলীগ, চেষ্টা ও সাধনার ফলশ্রুতি এবং এটাই ছিলো কষ্টকর, দুর্গম ও দুঃসাধ্য সফরের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

আকুড়ার যুদ্ধ

নওশেহরা থেকে তিনি লাহোর সরকারকে চরমপত্র পাঠান। তাতে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিলো,---অন্যথায় জিযিয়া প্রদানের এবং আনুগত্য ঘোষণার দাবী জানানো হয়েছিল। এ দু'টি দাবীর একটিও কবূল না করলে যুদ্ধের হুমকি প্রদর্শন করা হয়। শেষে এটাও লেখা হয়েছিলো যে, সম্ভবত মদও তোমাদের নিকট এতখানি প্রিয় নয়, যতখানি প্রিয় আমাদের নিকট শাহাদত লাভের গৌরব অর্জন। এরূপ চরমপত্রের জবাবে লাহোর গভর্নমেন্ট সৈয়দ সাহেবের মুকাবিলায় এক বিরাট শিখ সৈন্যবাহিনী পাঠায়। এ খবর পাওয়া মাত্র সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) যুদ্ধ প্রস্তুতির নির্দেশ দেন। সে সময় মুজাহিদবৃন্দের মন-মগজে জিহাদের অত্যাশ্চর্য এক নেশা কাজ করছিলো। প্রত্যেকেই ছিলো শাহাদাতের নেশায় পাগলপারা। সৈয়দ সাহেবের সঙ্গী-সাথীদের সংখ্যা ছিলো সে সময় ৭০০। অপর দিকে প্রতিপক্ষের সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ছিলো ৭ হাজার। ১২৪২ হিজরীর ২০শে জমাদিউল আওয়াল মুতাবিক ২০শে ডিসেম্বর ১৮২৬ খৃস্টাব্দের রোজ বুধবার মধ্যরাতের দিকে নিজে-দের দশগুণ বেশী শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সাথে এই মুষ্টিমেয় বাহিনীর যুদ্ধ শুরু হয়। মুজাহিদ বাহিনী অত্যন্ত হিম্মত ও বীরত্বের সাথে লড়াই করে। ফলে দুশমন পিছু হটতে থাকে এবং রাত ভোর হবার সাথে সাথে শত্রু-পক্ষ সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হয়ে যায়। এই যুদ্ধের ফলে মুসলমানদের মনো-বল অত্যন্ত বেড়ে যায়। এরপর বিভিন্ন গোত্রের সর্দার, 'উলামায়ে কিরাম ও অভিজাত ব্যক্তিবর্গ সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর খেদমতে উপ-স্থিত হয়ে বায়'আত গ্রহণ করতে থাকে। তাঁর উপর এদের সবার আস্থাও বেড়ে যায়। তিনি বিবদমান সর্দারদের মধ্যে সন্ধি ও সমঝোতা স্থাপন করেন। হিণ্ড কেল্লার সর্দার খাবে খানও এসে মুরীদ হয় এবং তারই প্রবল ইচ্ছা ও আগ্রহে তিনি কাফেলাসমেত হিণ্ড কেল্লায় তিন মাস কাল অবস্থান করেন।

হাজারুতে হামলা ও ইমামতের বায়'আত

আকুড়ার সফল যুদ্ধাভিযানের পর দেশীয় লোকেরা অভিপ্রায় ব্যক্ত করে যে, হাজারু নামক শিখ শাসনাধীন বাজারে রাতের অন্ধকারে হামলা করা হোক। সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) এর অনুমতি দেন; কিন্তু নিজে যোগদানে বিরত থাকেন। রাত্রিকালীন অতর্কিত এ হামলায় দেশীয়

ও স্থানীয় লোকজন মালে গনীমতের (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) লুটতরাজে অত্যন্ত নীতিহীনতার আশ্রয় নেয়। তারা সৈয়দ সাহেবের নির্দেশের মোটেও পরওয়া করেনি এবং অধিকাংশই কোনরূপ ব্যবস্থা ও নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে যার যা খুশী করে। এজন্য সৈন্যবাহিনীতে অবস্থানরত 'উলামায়ে কিরাম সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, সর্বাগ্রে আশু প্রয়োজন একজন ইমাম ও আমীর নিযুক্ত করার, যেন তাঁর অধীনে ও নেতৃত্বে জিহাদ পরিচালিত হতে পারে।

অতঃপর হিণ্ড-এ ১২৪২ হিজরীর ১২ই জমাদিউ'ছ-ছানী মুতাবিক ১৩ই জানুয়ারী ১৮২৬ খৃস্টাব্দ সর্বসম্মতভাবে সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর হাতে হাত রেখে তাঁরই ইমামত ও খিলাফতের উপর আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করা হয়। খাবে খান, আশরাফ খান, ফতেহ্ খান, বাহ্রাম খান এবং ছোট-বড় যত খান ও নেতৃবৃন্দ সেখানে ছিলেন সবাই এসে ইমামতের বায়'আত নেন। এ ছাড়া ভারতবর্ষের 'উলামায়ে কিরামও তাঁর ইমামত কবূল করে। হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) ইমামতের বায়'আত সম্পর্কিত তথ্য ও সংবাদ জানিয়ে সমস্ত উপজাতীয় সর্দার, দেশীয় রাজ্যের বিভিন্ন রাজন্যবর্গ, 'উলামায়ে কিরাম, খানকাহবাসী সূফী সম্প্রদায়, ভারতবর্ষের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের নিকট চিঠিপত্র ও দাওয়াত পাঠান। পেশোয়ারের শাসকদ্বয় সর্দার ইয়ার মুহাম্মদ খান ও সুলতান মুহাম্মদ খান প্রমুখ তাঁর জনপ্রিয়তা ও আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাঁকে নিবেদিতচিত্ত দেখে বিরাট দল নিয়ে আসেন এবং বায়'আত কবূল করেন। হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) আমীর নির্বাচিত হবার পর গোটা এলাকায় শরীয়তী ব্যবস্থাপনা চালু করে দেন। সমস্ত ফয়সালা ও বিধান শরী'য়তের নির্দেশ মাফিক সম্পন্ন ও নিষ্পন্ন হতে থাকে। এতদসম্পর্কিত কড়াকড়ি আরোপ ও জিজ্ঞাসাবাদের প্রভাব এতদূর গিয়ে পৌঁছে যে, বহুদূর অবধি বেনামাযীর কোন সাক্ষাত মিলতো না।

শায়দূর যুদ্ধ এবং বিষ প্রয়োগ

হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর ইমামত ও খিলাফত প্রতিষ্ঠার ফলে গোটা এলাকা একটি অখণ্ড ও ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ছোটবড় সর্দারদের নিজ কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে এদের অন্তর-মানসে হিংসা-বিদ্বেষের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে।

যদিও পরিবেশ ও পরিস্থিতির চাপে নিতান্ত বাধ্য হয়ে তারা সৈয়দ সাহেবের হাতে বায়'আত হয়েছিলো—তথাপি তারা ভেতরে ভেতরে এর প্রতি মারমুখো রকমের বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে এবং গোপনে গোপনে লাহোর গভর্নমেন্টের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

শিখদের সাথে ছোট-খাটো ও খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ-বিগ্রহের পর ঐ সমস্ত সর্দার যারা মুখে হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর সাথে ছিলো বটে, কিন্তু তাদের মন-মানস ছিলো লাহোর দরবারের গোলাম--তারা এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করে যে, শিখদের বিরুদ্ধে একটি সুশৃঙ্খল, সুসংবদ্ধ ও ও সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধ করা হোক। এ সব সর্দারের অভিপ্রায় ও পরামর্শে শায়দূর প্রশস্ত ময়দানকে যুদ্ধক্ষেত্র হিসাবে নির্বাচিত করা হয়। যুদ্ধ প্রস্তুতি চলতে থাকে। এমনি এক মুহূর্তে এক রাতে সে সব মুনাফিকের তরফ থেকে সৈয়দ সাহেবের খাবারে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়। সে সময় মুসলিম সেনাবাহিনীতে দেশীয় ও বিদেশী সবাই অন্তর্ভুক্ত ছিলো। সকল সর্দারই নিজ নিজ সৈন্যবাহিনীসহ যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, যুদ্ধের মোড় মুসলমান-দের স্বপক্ষে যাচ্ছিল---ঠিক এমনি মুহূর্তে আকস্মিকভাবে পেশোয়ার সর্দার শিখদের পক্ষে ভিড়ে যায়। সুলতান ইয়ার মুহাম্মদ খান নিজের সঙ্গী-সাথীসহ যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করে। এ যুদ্ধের পর হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর মুকাবিলা শুধু শিখদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রইলো না ; বরং শিখদের সাথে সাথে পেশোয়ারের বিভিন্ন সর্দার এবং দেশীয় লোক-দের সাথেও চলতে থাকে। মুনাফিকদের একটি অস্ত্রসজ্জিত বাহিনীর সাথেও সৈয়দ সাহেবকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়।

পাঞ্জেতার নামক স্থানে

নতুন উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে পাঞ্জেতারের শাসনকর্তা ফতেহ খানের অভিলাষ ও আগ্রহে তিনি হিণ্ড থেকে পাঞ্জেতার গমন করেন এবং একেই আন্দোলনের কেন্দ্র হিসেবে মনোনীত করেন। পাঞ্জেতার সোয়াত এলাকার নিকট পাহাড়ের মাঝখানে একটি সুরক্ষিত স্থান। দীর্ঘদিন ধরে এটা মুজাহিদ বাহিনীর সদর দফতর ছিলো। পাঞ্জেতার ইসলামী সৈন্যবাহিনীর ছাউনী, আত্মিক ও নৈতিক পরিশুদ্ধি এবং হিদায়াত ও ধর্মপথ প্রদর্শনের কেন্দ্র হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছিলো। এই ছোট্ট পাহাড়টি ছিলো মুজাহিদ বাহিনীর জমকালো ছাউনী আর তার কোণে কোণে ছিল মুজাহিদ ও

‘ইবাদতকারীদের আস্তানা। যিক্‌র ও তিলাওয়াতে কালামে মজীদ, জিহাদ ও মুজাহিদ বাহিনী, প্রেম-প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব এবং সেবা ও কুরবানী তথা আত্মোৎসর্গ দ্বারা এটি ছিলো সমুজ্জ্বল ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত।

পাঞ্জেতার আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি ও আবাস হবার ফলে হিণ্ডের শাসনকর্তা খাবে খান অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন, হয়ে পড়েন ঈর্ষাকাতর। তিনি সৈয়দ সাহেবের প্রতিও বিরূপ হয়ে ওঠেন এবং ক্ষতি সাধনের জন্য মন্ত্রদানে নেমে পড়েন। শায়দূর যুদ্ধের অনভিপ্রেত এবং অন্তর-মন চূর্ণকারী ঘটনা সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর সুদৃঢ় ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ও হিম্মতে এবং দাওয়াতে জিহাদ ও জিহাদী মগ্নতার মধ্যে এতটুকু ফাটল সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। তিনি বুনীর, সোয়াত এবং অতঃপর হাজারা সফর করেন। এ সফর ইসলামের প্রচার-প্রসার, জনগণের পক্ষে কল্যাণ, হিদায়াত ও জিহাদের তবলীগ তথা প্রচারের দিক থেকে অত্যন্ত সফলও ফলপ্রসূ হয়েছিলো। তিনি পাঞ্জেতার থেকে সোয়াতের কেন্দ্র খাহ্‌র সফর করেন এবং সেখানে এক বছর কাল অবস্থান করেন। এখানে অবস্থান কালেই খাহ্‌রে মওলানা ‘আবদুল হাই (র) ইন্তেকাল করেন। মুজাহিদ বাহিনীতে তাঁর মর্যাদা ছিলো শেখুল ইসলামের এবং তাঁকে স্বয়ং সৈয়দ সাহেবও অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন।

রঞ্জিৎ সিংহের ফরাসী জেনারেলের সাথে মুকাবিলা

রঞ্জিৎ সিংহের একজন ফরাসী জেনারেল ভ্যান্টোরা দশ-বারো হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে মুজাহিদ বাহিনীর উপর হামলা চালায়। হিণ্ডের শাসনকর্তা খাবে খান এতে ভ্যান্টোরাকে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করে। জেনারেল ভ্যান্টোরা মুজাহিদ বাহিনীর জিহাদী জোশ ও জযবা এবং শাহাদাত লাভের প্রতি প্রবল আগ্রহ দেখে পশ্চাদপসরণ করে এবং পিছু হটে গিয়ে অবশেষে লাহোর প্রত্যাবর্তন করে। কয়েকমাস পর ফরাসী জেনারেল ভ্যান্টোরা দ্বিতীয় দফা অগ্রসর হয়ে সিম্মার দিকে অভিযান শুরু করে। খাবে খান তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানায় এবং পেছন থেকে মদদ যোগাতে থাকে। হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) ভ্যান্টোরার আগমন সংবাদ এলাকাবাসীদের অবহিত করেন, চতুর্দিকে চিঠিপত্র লিখে পাঠান এবং একটি প্রতিরক্ষা প্রাচীর নির্মাণ করান। মুজাহিদ বাহিনী সৈয়দ সাহেবের হাতের উপর হাত রেখে শহীদী শপথ পাঠ করে।

ভ্যান্টোরা দেখতে পায়, মুজাহিদ বাহিনী পাহাড়ের টিলা ও শিখরদেশ এবং গিরিপথ ও সুড়ঙ্গ পথে ছড়িয়ে রয়েছে। আর এটা দেখতে পেয়ে ভীত ও সন্ত্রস্থ অবস্থায় সে পশ্চাদপসরণ করে। এতে মুজাহিদ বাহিনীর দৃঢ়তা এবং আল্লাহ্‌র নিকট তাদের গ্রাহ্যতা সম্পর্কে চারদিকে আলোচনা-চর্চা শুরু হয়ে যায়। দলে দলে লোকজন আসতে থাকে এবং বায়'আত হতে থাকে। হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) ছোট-খাটো শহর ও পল্লীতে ব্যাপক সফর শুরু করেন এবং ইসলামের শরীয়তী ব্যবস্থাপনাকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। খাবে খান পারস্পরিক সমঝোতা ও বোঝাপড়া থাকা সত্ত্বেও শত্রু পক্ষের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এ কারণেই অবশেষে সৈয়দ সাহেব বাধ্য হয়ে হিণ্ড কেল্লার উপর হামলা পরিচালনা করেন এবং তা হস্তগত করেন। এ হামলায় খাবে খান নিহত হয়।

মায়দার যুদ্ধ এবং ইয়ার মুহাম্মদ খানের হত্যা

খাবে খানের ভাই আমীর খান সর্দার ইয়ার মুহাম্মদ খানের সাথে মিলিত হয়ে ষড়যন্ত্র পাকাতে থাকে। এই লোকটিই সৈয়দ সাহেবকে শায়দূর যুদ্ধে বিষ প্রয়োগ করেছিলো। হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) ইয়ার মুহাম্মদ খানের সাথে আলোচনায় মিলিত হন। তিনি তাকে অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি তদুপরি বিপর্যয়মূলক ও ধ্বংসাত্মক তৎপরতা থেকে নিবৃত্ত করার জন্য বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু সে এতে নিবৃত্ত হওয়া তো দূরের কথা, যায়দা নামক স্থানে মুজাহিদ বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। মুজাহিদ বাহিনীর ধৈর্য ও দৃঢ়তার ফলে দুররাণী বাহিনীর চরম বিপর্যয় দেখা দেয় এবং তাদের কামান -গোলা মুজাহিদ বাহিনী হস্তগত করতে সমর্থ হয়। ফলে গোটা বাহিনী পালাতে তৎপর হয়। এ যুদ্ধে ইয়ার মুহাম্মদ খান নিহত হয়। মুজাহিদ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন হিণ্ড কেল্লায় দুররাণী বাহিনী অতর্কিতে হামলা করে। কেল্লায় অবস্থিত মুজাহিদ বাহিনীর সংখ্যা ছিলো সে সময় পঞ্চাশ-ষাট জনের মতো। এতদ্‌সত্ত্বেও তারা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে প্রতিরোধ যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং এ হামলা ব্যর্থ করে দিতে পুরোপুরি সমর্থ হয়।

এ সময় একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, মুজাহিদ বাহিনী দুররাণী গোত্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে পেশোয়ারের উপর সত্বর হামলা করবে। ফলে দুররাণীরা

হিণ্ড থেকে পিছু হটে এসে পেশোয়ারের দিকে অগ্রসর হয়। ইত্যবসরে ‘আশারা ও আম্বের উপর মুজাহিদ বাহিনী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে।

হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) মনে করলেন কাশ্মীরের দিকে অগ্রাভিযান করা দরকার। এজন্যে প্রয়োজন ছিলো ফুলড়ে হস্তগত করা। এতদুদ্দেশ্যে নিজ ভাতিজা সৈয়দ আহমদ আলীর নেতৃত্বে মুজাহিদ বাহিনীর একটি দল পাঠিয়ে দেন। শিখ বাহিনী এলাকাটির উপর অতর্কিত হামলা করে বসে। অতর্কিত হামলার কারণে বহু মুজাহিদ শাহাদত প্রাপ্ত হন। স্বয়ং হযরত সৈয়দ আহমদ আলীও বীরের ন্যায় লড়তে লড়তে শাহাদত লাভ করেন। অতঃপর সৈয়দ সাহেব আম্বে অবস্থান নেন এবং বিচার বিভাগ, নৈতিক ও চারিত্রিক পরিশুদ্ধির ব্যবস্থাপনা চালু করেন।

মায়ার যুদ্ধ

সুলতান মুহাম্মদ খান মুজাহিদ বাহিনীর সাথে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধের সুদৃঢ় ফয়সালা গ্রহণ করে। সে দুররাণীদের একটি বড় বাহিনীর সাথে করে চমকনী হয়ে চরসাদ্দায় পৌঁছয়। হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) তাঁর সংগী-সাথী সমভিব্যাহারে তূর্দ নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন করেন এবং পেশোয়ারের বিভিন্ন সর্দারদের নিজেদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে নিবৃত্ত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু পেশোয়ারের সর্দারবৃন্দ এই সমঝোতা প্রচেষ্টার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাতে ব্যর্থ হয়। সুলতান মুহাম্মদ খান এবং তার ভাই ভাতিজাদের নিকট কুরআন হাতে নিয়ে শপথ করে। গোটা সৈন্যবাহিনী এমন একটি দরজা দিয়ে অতিক্রম করে যেখানে কুরআন মজীদ লটকানো ছিলো। তূর্দ ও হোতীর মধ্যবর্তী মায়ার নামক ময়দানে উভয় পক্ষের মধ্যে রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মওলানা মুহাম্মদ ইসমা‘ঈল এবং শেখ ওয়ালী মুহাম্মদ সাহেব বিপক্ষ দলের গোলা ও কামান হস্তগত করতে সক্ষম হন। দুররাণী বাহিনীকে চরমভাবে বিপর্যস্ত হতে হয় এবং মুজাহিদ বাহিনী স্পষ্ট বিজয় লাভে সমর্থ হয়। এ যুদ্ধ মুজাহিদ বাহিনীর বীরত্ব, জীবনপণ সংগ্রাম, ঈমানী কুওত, আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতে সন্তুষ্টি ও আত্মসমর্পণ এবং পরকাল প্রীতির এমন সব দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয় যা প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের কথাই নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেয়।

পেশোয়ার বিজয় ও প্রত্যর্পণ

হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) মায়ার যুদ্ধে জয়লাভের পর পেশোয়ার অভিমুখে যাত্রা করেন। এটি ছিলো লাহোর এবং কাবুলের পর উত্তর পশ্চিম এলাকার অন্যতম বৃহত্তম শহর। প্রাচীনকাল থেকে পেশোয়ার সীমান্ত প্রদেশের কেন্দ্র ও রাজধানী। অবস্থার চাপে বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি পেশোয়ারকে সরাসরি নিজস্ব ব্যবস্থাপনার অধীনে আনয়ন করার সিদ্ধান্ত নেন। সুলতান মুহাম্মদ খান দেখতে পেলো যে, মুজাহিদ বাহিনী পেশোয়ার দখল করার জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছে, তখন সে তার খান্দা-নের লোকজন এবং বন্ধু-বান্ধবসহ পেশোয়ার থেকে বাইরে চলে যায়। সেখান থেকে সৈয়দ সাহেবের সাথে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ শুরু করে। সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) পেশোয়ার প্রবেশ করলে শহরবাসী আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। জায়গায় জায়গায় শরবত বিতরণের লাইন লেগে যায়। কোথাও আলোকসজ্জা করা হয়। মুজাহিদ বাহিনী প্রাথমিক যুগের ইসলামী সৈন্যবাহিনীর ন্যায় ইসলামী আচার-আচরণ ও প্রশিক্ষণ এবং সংযম ও আমানতদারীর অপূর্ব পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। সুলতান মুহাম্মদ খান সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে এবং আনুগত্যের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়। শরী'আত মুতাবিক হলফ গ্রহণের মাধ্যমে ওয়াদাবদ্ধ হয় যে, দ্বিতীয় দফা পেশোয়ার তার নিকট সোপর্দ করা হলে সে শরী'আতী ব্যবস্থাপনা চালু করবে এবং এদেশকে ইসলামী হুকুমতে পরিণত করবে। সৈয়দ সাহেব এই ভিত্তিতে যে, তাঁরা রাজ্য শাসনের জন্য নয় বরং ইসলামী হুকুমত স্থাপনের ও শরী'আতের আইন-কানূন সমাজ ও রাষ্ট্রের বুকে চালু করবার জন্যই দীর্ঘ এ সফরের কষ্ট-ক্লেশ অকাতরে সহ্য করেছেন এবং এ ব্যাপারে তাদের অন্য কিছুর উপর গুরুত্বারোপ ঠিক হবে না, তার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তিনি তাকে আরও একটি সুযোগ দেবার সিদ্ধান্ত নেন। এরপর পেশোয়ারকে পুনরায় সুলতান মুহাম্মদ খানের কর্তৃত্বাধীনে প্রত্য-র্পণ করা হয়। তিনি পেশোয়ার থেকে রওয়ানা হয়ে অতঃপর পাঞ্জেতার প্রত্যাবর্তন করেন।

কাযী ও তহশীলদারদের গণ-হত্যা

ইসলামী শরী'আতভিত্তিক ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠা, যাকাত আদায়ের জন্য কর্মচারী ও তহশীলদার নিয়োগ এবং শর'য়ী আইন-কানূন প্রবর্তনে গোত্রীয়

ও উপজাতীয় সর্দারমণ্ডলী, বিশেষ করে সুলতান মুহাম্মদ খান এবং পার্থিব কামনা-বাসনা লিপ্সু দুনিয়াদার 'উলামাদের বৈষয়িক ও জাগতিক স্বার্থে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছিলো। ইসলামী ব্যবস্থায় তারা পরিষ্কার নিজেদের ক্ষতি দেখতে পেলো। এ জন্য এসব বাধ্য-বাধকতা থেকে মুক্তি ও পরিত্রাণ পাবার জন্য তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

পেশোয়ার সোপর্দ করবার পর মাত্র কয়েকদিন অতিবাহিত হয়েছিলো। এরই মধ্যে সুলতান মুহাম্মদ খান একটি ষড়যন্ত্র খাড়া করে। সে সকল স্তরের মানুষের মধ্যে মুজাহিদ বাহিনীর দুর্নাম ও কুৎসা ছড়াতে শুরু করে। 'উলামায়ে সূ'(জঘন্য ও নিকৃষ্ট মন-মানসিকতা সম্পন্ন, স্থূল কামনা-বাসনার সেবাদাস আত্মকেন্দ্রিক 'আলিম দল) থেকে একটি কাগজের উপর স্বাক্ষরযুক্ত ফতওয়া গ্রহণ করে যে, সৈয়দ সাহেব এবং তাঁর সঙ্গী-সাথী মুজাহিদ বাহিনীর 'আকীদা (ধর্মাবিশ্বাস) ভ্রান্ত। পেশোয়ার ও সিম্মার গোটা এলাকাতেই সৈয়দ সাহেবের নিযুক্ত শর'য়ী হুকুমতের কর্মচারী, তহশীলদার কাযী পুলিশ ও বিজয়ী সৈন্যবাহিনীর সদস্য (গাযী) যাদের পাঞ্জেতার ব্যতিরেকেও সমগ্র এলাকাতে স্থানে স্থানে মোতায়েন ও নিযুক্ত করা হয়েছিল, সে তাদের সবাইকে একই সময়ে হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং তাদের অত্যন্ত নির্দয় ও নির্মম গণ-হত্যার শিকারে পরিণত করে। কেউ সালাত সম্পাদনরত অবস্থায় শহীদ হয়, কেউ মসজিদে আশ্রয় গ্রহণরত অবস্থায় আর কেউ বা যুদ্ধ করতে করতে মারা যান। এই নিষ্ঠুর জালিমেরা সত্যাশ্রয়ী 'উলামা, নেতৃস্থানীয় মহিলা এবং অমুসলিম ব্যক্তিবর্গের প্রাণভিক্ষার সুপারিশ ও আবেদনের পর্যন্ত কোনরূপ তোয়াক্কা করেনি। তাদের ভেড়া বকরীর ন্যায় যবাই করে। এটাই ছিলো শত শত বছরের প্রশিক্ষণের পরিণতি, জীবনব্যাপী সাধনার অর্জিত ফসল এবং ভারতবর্ষের সারকথা।

দ্বিতীয় দফা হিজরত

এরূপ নির্দয় ও নির্মম পাশবিক গণহত্যায় হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর মন-মানস একদম ভেঙে পড়ে। স্থানীয় লোকদের বিশ্বাসঘাতকতা, কৃতঘ্নতা, অত্যাচার-নির্যাতন ও বর্বরোচিত আচরণের ফলে তাঁর অন্তর-মানস অত্যন্ত ক্ষিপ্ত ও বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে। তিনি এ স্থান থেকে হিজরত করার সংকল্প গ্রহণ করেন। তিনি সর্বাগ্রে 'উলামায়ে কিরাম ও নেতৃস্থানীয় খানদের পাঞ্জেতারে একত্র করেন এবং সংঘটিত ভয়াবহ

ঘটনা ও তার পেছনের কার্যকারণসমূহ পর্যালোচনা করেন। স্বীয় আগমনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং নিজেদের চেষ্টা ও সংগ্রাম-সাধনার কথা বর্ণনা করেন। যখন তাঁর স্থির বিশ্বাস জন্মে যে, তাঁর সঙ্গী-সাথীরা এ ব্যাপারে নিতান্তই বেকসূর এবং মজলুমও বটে; অধিকন্তু স্থানীয় অধিবাসীদের মেযাজ-মানসিকতা ও ভূমিকা মোটেই স্বচ্ছ নয়, তখনই তিনি হিজরতের পাকাপোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

হিজরতের এ খবর ছড়িয়ে পড়ার পর স্থানীয় 'উলামায়ে কিরাম, নেতৃবৃন্দ, একনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত সেবকদের জামা'আত এবং ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ী প্রমুখ খান যারা পাঞ্জেতারে অবস্থান করছিলো---অত্যন্ত চিন্তামগ্ন ও বিমর্ষ হয়ে পড়ে। দলে দলে লোকজন এসে সৈয়দ সাহেবকে হিজরত না করবার জন্য দরখাস্ত পেশ করতে থাকে। কিন্তু তিনি এতে রাযী হন নি এবং তা এজন্যে যে, তিনি খুব ভালোভাবেই জানতে পেরেছিলেন যে, সুলতান মুহাম্মদ খানের ষড়যন্ত্র এবং কর্মচারী ও তহশীলদারদের নির্মম হত্যা পরিকল্পনায় ফতেহ্ খান এবং তার গোত্রের লোকজনও জড়িত ছিলো। আর ফতেহ্ খান নিজেও তাঁকে সেখানে অবস্থানের জন্য কোন অনুরোধ জানায়নি বরং পরোক্ষে হিজরতের সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন যোগায়। তথাপি হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) কোনরূপ প্রতিশোধাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণের পরিবর্তে ফতেহ্ খানের সাথে ক্ষমাশীলতা ও সদয় ব্যবহারের পরিচয় দেন। তাকে উপহার-উপঢৌকন দিয়ে তুষ্ট ও ধন্য করেন। এতদ্‌সত্ত্বেও এ এলাকা থেকে তাঁর হিজরত করবার সুদৃঢ় সংকল্পে কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটেনি। অতঃপর তিনি পাঞ্জেতার এলাকাকে ফতেহ্ খানের হাতে সোপর্দ করে রাজদোয়ারী নামক স্থানে অবস্থান করেন। পথিমধ্যে সিম্মার (যেখানে গাযী, বিচারক ও শুভানুধ্যায়ী একনিষ্ঠ ভক্তবৃন্দকে শহীদ করা হয়েছিলো)-এর লোকজন দৌড়ে দৌড়ে এসে উপস্থিত হয় এবং ফিরে যাবার দরখাস্ত পেশ করতে থাকে। জবাবে তিনি বলেছিলেন,

لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين

"কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে একই গর্ত থেকে দু'বার দংশন করা যায় না।" অর্থাৎ ঈমানদারের পক্ষে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি সমীচীন নয়।

কাশ্মীর অভিমুখে

এরপর তিনি ভবিষ্যত পরিশুদ্ধি ও জিহাদী তৎপরতার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলবার জন্য কাশ্মীরকে মনোনীত করেন এবং জীবিত অবশিষ্ট মানবীয় পুঁজি, আত্মোৎসর্গিত ও বিশ্বস্ত সঙ্গী-সাথী যারা এরূপ নিরূপায়, অনিশ্চয়তা ও জটিল পরিস্থিতিতেও সৈয়দ সাহেবকে পরিত্যাগ করতে রাযী ছিলো না—তাদের নিয়ে তিনি কাশ্মীর অভিমুখে রওয়ানা হন। আর এটা হলো একটি প্রশস্ত ও সুরক্ষিত উপত্যকা। এর এমন এক প্রাকৃতিক প্রতি-রক্ষা ব্যূহ রয়েছে, যার থেকে একজন সতর্ক ও বিচক্ষণ নেতৃত্ব বহুবিধ কল্যাণ হাসিল করতে পারেন; অধিকন্তু এখানে থেকে একদিকে ভারতবর্ষে প্রভাব বিস্তারকারী বাতাস প্রবাহিত হতে পারবে, অপরদিকে মধ্য-এশিয়ার যেসব মুসলিম রাষ্ট্র বংশগত ও সামরিক দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং যারা অতীতে সুদৃঢ় ইসলামী সালতানাত কায়েম করেছিলো, তাদের সাথেও যোগাযোগ সৃষ্টি করা সম্ভবপর হবে।

বালাকোটে

সে সময় পাখলী এবং কাগান উপত্যকার অভিজাত ও এলাকাবাসীদের শাসনকর্তৃত্ব—কতকাংশ শিখদের হামলার ফলে আর কতকাংশ পারস্পরিক তিক্ত সম্পর্কের কারণে নড় বড়ে হয়ে গিয়েছিলো। এরা সবাই ছিলো হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থী। অধিকন্তু তাদের রাজ্যগুলো কাশ্মীর যাবার পথেই পড়ে। এগুলোকে সৈয়দ সাহেব নিজের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চাচ্ছিলেন। দ্বিতীয় দফার এই হিজরতও সেই দিকেই হতে চলেছিলো। তাদের সবাইকে সাহায্য করা, তাদের সহযোগিতা ও সামরিক শক্তির সহায়তা লাভ করা এবং কাশ্মীরের দিকে অগ্রসর হবার প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান ছিলো বালাকোট। এটি কাগান উপত্যকার দক্ষিণ মুখে অবস্থিত। এখানে পৌঁছে উপত্যকাকে পাহাড়ী প্রাচীর বন্ধ করে দিয়েছে। কুনহার নদীর উৎসমুখ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন রাস্তাও বালাকোট প্রবেশের নেই। পাহাড়ের দু'ধারী প্রাচীর সমান্ত-রাল রেখায় এগিয়ে গেছে। মাঝখানে উপত্যকা ভূমি। এর প্রশস্ততা আধা মাইলের বেশী নয়। এর মাঝখান দিয়েই কুনহার নদী প্রবাহিত। বালা-কোটের পূর্বদিকে কালূ খানের সুউচ্চ চূড়া এবং পশ্চিমে মাটিকোট পর্বত-শিখর অবস্থিত।

হিজরতের এ দ্বিতীয় সফরটিও ছিলো অত্যন্ত কষ্টকর, দুঃসাধ্য ও বিপদজনক। পাহাড়ের শিখর দেশ এবং উপত্যকা ভূমি ছিলো বরফ দ্বারা আচ্ছাদিত। রাস্তা ছিলো আঁকা-বাঁকা ও উঁচু-নিচু। রাস্তায় রসদপত্র এবং মাল-সামানের বাহনেরও কোন ব্যবস্থা ছিলো না। এ সফরও ছিলো তাঁর সুউচ্চ মনোবল, দৃঢ় চিত্ততা, সঙ্গী-সাথীদের সহনশীলতা, ঈমানী কুওত, ধৈর্য-স্থৈর্য এবং স্বীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি সীমাহীন প্রীতির একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। তিনি পাঞ্জেতার থেকে বিভিন্ন স্থান হয়ে সচুন পৌঁছেন। সেখান থেকে বালাকোট অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। সচুন থেকে ১২৪৬ হিজরীর জিলকদ মাসের ৫ তারিখে মুতাবিক ১৮৩১ খৃস্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল রওয়ানা হয়ে বালাকোট প্রবেশ করেন।

শেষ যুদ্ধ এবং শাহাদত লাভ

রাজকুমার শের সিংহ (যে স্বীয় পিতা রঞ্জিত সিংহ কর্তৃক মুজাহিদ বাহিনীর সাথে শেষ শক্তি পরীক্ষার অভিযানে আদিষ্ট হয়েছিলো) যখন জানতে পায় যে, সৈয়দ সাহেব তাঁর গাযীদের নিয়ে বালাকোটে অবস্থান করছেন তখনই সে শিখদের একটি বিরাট বাহিনীসহ কুনহার নদীর পূর্ব তীরে বালাকোট থেকে দু'-আড়াই ক্রোশ দূরে ছাউনী ফেলে এবং ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে বালাকোটের নিকটে গিয়ে পৌঁছে।

এ সত্য যখন দিবালোকের ন্যায় পরিস্ফুট হয়ে গেলো যে, শিখ সৈন্য বাহিনী মাটিকোট থেকে অবতরণ করে বালাকোটের উপর হামলা করবে—তখন কার্যকর ও ফয়সালামূলক একটি যুদ্ধের ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করা হয়। পল্লীর অবস্থান এবং যুদ্ধের ময়দানের প্রাকৃতিক অবস্থা ছিলো মুজাহিদ বাহিনীর পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল।

রাজকুমার শের সিংহ বালাকোটের এরূপ প্রাকৃতিক অবস্থা দেখে একে অবরোধ করার পরিকল্পনা সম্পর্কে হতাশ ও নিরাশ হয়ে পড়ে এবং প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছে করতে থাকে। ঠিক এমনি মুহূর্তে স্থানীয় অধিবাসীদের কেউ পল্লীতে পৌঁছুতে পথ প্রদর্শকের ভূমিকা নেয়। দেখতে দেখতে শের সিংহের সৈন্যবাহিনী মাটিকোটের উপর ১২৪৬ হিজরীর ২৪শে জিলকদ মুতাবিক ১৮৩১ খৃস্টাব্দের ৬ই মে তারিখে পঙ্গপালের মতো ছেয়ে যায়। মাটিকোট থেকে অবতরণ করে শের সিংহের বাহিনী গাযীদের উপর প্রচণ্ড

হামলা শুরু করে। সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) ছিলেন অগ্রভাগে এবং মুজাহিদ বাহিনী ছিলো তাঁর পেছনে। শিখ বাহিনীর গোলাগুলী বৃষ্টি-ধারার ন্যায় বর্ষিত হচ্ছিলো। তিনি অগ্রসর হয়ে তকবীর ধ্বনি করেন এবং দুশমনের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। বাঘ যেমনি শিকারের উপর ক্ষিপ্র ও তীব্র গতিতে পড়ে ঠিক তেমনি ক্ষিপ্র ও তীব্র গতিতে তিনি অগ্রসর হচ্ছিলেন। পঁচিশ-তিরিশ কদম দূরে ক্ষেতের একটি বড় পাথর খণ্ড মাটি খুড়ে বেরিয়ে ছিলো, তিনি তারই আড়ালে গিয়ে থামেন। তিনি ও তাঁর সাথী গাযীবৃন্দ বন্দুক পিস্তলের গুলী বৃষ্টিধারার ন্যায় ছুড়তে থাকেন। এরূপ নিক্ষেপের ফলে অসংখ্য দুশমন প্রাণ হারায় এবং ছত্র-ভঙ্গ হয়ে পাহাড়ের দিকে পিছু হটতে থাকে। মুজাহিদ বাহিনী পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে উপস্থিত হয়। দুশমনের ঠ্যাং ধরে ধরে টেনে নীচে নামাতে থাকে এবং তলোয়ারের আঘাতে নির্মূল করতে থাকে।

ইত্যবসরে সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) লোকজনের দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যান। মুজাহিদ বাহিনীর মনে এরূপ প্রতীতি জন্মাতে থাকে যে, সম্ভবত তিনি শহীদ হয়ে গেছেন এবং তারা তাঁর লাশের সন্ধান করতে থাকে। এদিকে মওলানা মুহাম্মদ ইসমা'ঈল (র)-এর মাথায়'ও গুলী লাগে এবং তিনিও শাহাদত লাভ করেন। দুশমন বাহিনী তাঁর শাহাদতে মুজা-হিদ বাহিনী বিব্রত ও পেরেশান হয়ে পড়েছে দেখতে পেয়ে নতুন উদ্যম ও উৎসাহে পুনরায় ব্যাপক হামলা শুরু করে। শুরু করে বিরামহীনভাবে কামান ও বন্দুকের গোলা-গুলী নিক্ষেপ। ফলে বহু মুজাহিদ শাহাদত বরণ করেন এবং এতে যুদ্ধের চিত্রও যায় পাল্টে। বড় বড় 'উলামায়ে কিরাম, বুযুর্গ মাশায়েখ এবং মুজাহিদীন শাহাদতের পেয়ালা পান করেন। এঁরা মরণপণ সংগ্রাম করে জীবন বিলিয়ে দেন। যুদ্ধে তিন শ'এর অধিক মুজাহিদ শাহাদত বরণ করেন।

বালাকোটের এই ভূমি খণ্ডে সেই সব পবিত্র ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গের পবিত্র সফরের সমাপ্তি ঘটে। এ সফর শুরু হয়েছিলো ১২৪১ হিজরীর ৭ই জমাদিউছ'-ছানী মুতাবিক ১৮২৬ খৃস্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারীর ভোর-বেলা। সৈয়দ আহমদ শহীদ (র)-তাঁর মুজাহিদ ও গাযী বাহিনীর সাথে স্বদেশ ও স্বগ্রাম রায়বেরেলী থেকে যাত্রা শুরু করে ১২৪৬ হিজরী ২৪শে জিলকদ মুতাবিক ১৮৩১ খৃস্টাব্দের ৬ই মে তারিখে আপন মঞ্জিলে মক-

সূদে গিয়ে পৌঁছেন, যেখানে পৌঁছুবার লক্ষ্যে তিনি তাঁর ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেছনে ফেলে প্রান্তরভূমি, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল এবং উপ-ত্যকা ভূমি অতিক্রম করেন, দুররাণীদের বিশ্বাসঘাতকতা ও অবিশ্বস্ততা এবং নির্মম পাশবিকতার মুকাবিলা করেন,—মুকাবিলা করেন বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপের। বালাকোটের এ যুদ্ধে সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) মওলানা মুহাম্মদ ইসমা'ঈল (র) এবং অন্যান্য এমন সব মানব সত্তা শাহাদত বরণ করেন যাঁদের অন্তরে ঐশী-প্রেমের প্রজ্বলিত শিখা ছিলো অস্থির ও অধীর এবং আল্লাহ্র রাস্তায় শাহাদত লাভের সত্যিকার আবেগ উদ্দীপনার এমনি প্রেরণাদায়ক শক্তি পয়দা হয়ে গিয়েছিলো যে, তাঁদের নিজেদের জীবনও দুঃসহ ও বিরক্তিকর এবং নিজেদের মস্তিষ্কও দুর্বহ ভার বলে মনে হচ্ছিল। তাঁদের প্রতিটি লোমকূপ থেকে এ আওয়াজ উচ্চারিত হচ্ছিল ঃ

প্রেমের বাজারে বন্ধুর গলিতে রয়েছে জীবনের মূল্য,
এই সুসংবাদ লাভের পথে শির হয়েছে প্রতিবন্ধক।

সৈয়্যদ আহ্মদ শহীদ (র)

আচ্ছা! তাহলে এর নাম আহমদ রাখো

হযরত সৈয়দ আহ্মদ শহীদ (র) ১৩৩৩ হিজরীতে দিল্লী ও সাহা-রানপুরে একটি তবলীগী এবং নৈতিক ও চারিত্রিক পরিশুদ্ধিমূলক সফর করেন। শহর ও পল্লী অঞ্চলে কয়েকদিন ও কয়েক সপ্তাহ্ ধরে অবস্থান করেন। মুসলমানদের রসূলে করীম (স')-এর বাস্তব জীবনাদর্শ (সুন্নত) অনুসরণ এবং বিদ'আত (নব-সৃষ্ট ধর্মীয়রূপ প্রথা-পদ্ধতি ও আচার অনু-ষ্ঠান) পরিত্যাগের আহ্বান জানান। আত্মিক পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি এবং চারিত্রিক সৌকুমার্য হাসিলের দিকে তিনি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ সফরে সৈয়দ সাহেবের মুখপত্র এবং জামা'আতের প্রতিনিধি মওলানা মুহা-ম্মদ ইসমা'ঈল (র) সাধারণত ওয়াজ-নসীহত করতেন। এ মুবারক সফরে আল্লাহ্ পাকের ফযলে হাজার হাজার মানুষ হিদায়াত প্রাপ্ত হয় এবং বহু লোকের ভাগ্যে তওবা করার সৌভাগ্য জোটে।

এ ধরনেরই একটি ঘটনার যিনি প্রত্যক্ষ শিকার তার নিজস্ব ভাষায় ঘটনার বর্ণনা এখানে পেশ করা হলো

হাজী শেখ আহ্মদ বলেন,—সৈয়দ সাহেব মওলবী শাহ্ রমযান আলী রুড়কীওয়ালাকে খিলাফত দান করেছিলেন এই জন্যে যে, তিনি আশে-পাশের গ্রামাঞ্চলে ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার এবং ওয়াজ-নসীহতের উদ্দেশ্যে সফর করবেন। মওলবী সাহেব এ ধরনেরই একটি সফরে অধমের বাসভূমি জাটকা নামক স্থানে উপস্থিত হন। তিনি সেখানে একটি মসজিদে ওয়াজ-নসীহত করেন। আমার বয়স তখন ন' বছর

এবং আমি ছিলাম একজন হিন্দু। আমি মসজিদের নীচে বসে মওলবী সাহেবের ওয়াজ শুনি। তিনি নামায, রোযাসহ আরও বহুবিধ নেক 'আমলের ফযীলত বয়ান করেন। তিন দিন পর্যন্ত এভাবেই তাঁর ওয়াজ শুনতে থাকি। আমার অন্তরে একথার উদয় হয় যে, মওলবী সাহেবের ধর্ম যখন এত ভালো তখন আমিও যদি এ ধর্ম গ্রহণ করি তবে কতই না ভালো হয়। আমার এ আগ্রহ দিন দিন বাড়তে থাকে। তৃতীয় দিনে আমি মওলবী সাহেবের খিদমতে উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়ে যাবার সাহস সঞ্চয় করি। মসজিদে উপস্থিত হয়ে আমি দেখতে পাই, বহু মুসলমান তাঁর ওয়াজ শুনবার জন্য বসে আছে এবং অনেক হিন্দুও আলাদা আলাদা ভাবে মসজিদের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। আমিও গিয়ে দাঁড়িয়ে যাই। কিছুক্ষণ পর আমার অন্তরে এমনি আনন্দ ও তৃপ্তির আমেজ সৃষ্টি হয় যে, আমি এর নেশায় বিভোর হয়ে পড়ি। এমন কি আমি আমার সকল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মওলবী সাহেবের কাছে গিয়ে আরজ করি যে, আমি মুসলমান হচ্ছি,—আপনি আমাকে মুসলমান বানিয়ে নিন। মওলবী সাহেব আমাকে পাশে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—তুমি মুসলমান হচ্ছো? আমি বললাম, জী, হাঁ! অতঃপর তিনি আমাকে তাঁর এক ভাইয়ের সাথে সৈয়দ সাহেবের খেদমতে সাহারানপুর পাঠিয়ে দেন। আমি ঠিক একই রূপ আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে তাঁর হাতে হাত দিয়ে মুসলমান হই।

মুহ্সিন খান এবং মুহাম্মদ হোসেন সাহারানপুরী বর্ণনা করেন যে, এই বালক হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর খেদমতে পৌঁছলে তিনি তাকে কাছে বসান। বারবার নিজের হাত বালকটির মাথায় বুলিয়ে দিতে থাকেন এবং বলতে থাকেন, সেই সর্বশক্তিমান হিদায়াত দানকারীর শান লক্ষ্য করো,—তাঁর হিদায়াতের নূর যার অন্তরে গিয়ে পড়ে সে তখন নিজেই রাস্তার অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। এরপর তিনি মওলানা 'আবদুল হাই সাহেবকে বলেন,—'আল্লাহ্‌র নামে এই বালককে কলেমায়ে তওহীদের তা'লীম দিন, আর এরূপ নেক কাজে একটুও দেরী করবেন না।' তিনি আরও বললেন—এর ভালো দেখে একটা নামও রেখে দেবেন। মওলানার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়,—"করীমুদ্দীন।"

এ সময় মজলিসে শহরবাসী লোকজনের অসম্ভব ভীড় লেগে ছিলো। তারা বললো, এ নাম রাখায় কতক লোক অসন্তুষ্ট হবে। কেননা শহরের

নেতৃস্থানীয় কতিপয় ব্যক্তির একই নাম রয়েছে। এতে তিনি বললেন, "আচ্ছা! তাহ'লে এর নাম আহমদ রাখো।" এটা এজন্যই রাখো যে, এটা আমার নাম। অতঃপর তিনি বালককে হাকিম মুগীছুদ্দীনের নিকট সোপর্দ করেন এবং বলে দেন যেন তাকে সালাত আদায় সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়। পবিত্র কুরআনের তা'লীম, ইসলামের হুকুম-আহ্কাম ও প্রয়োজনীয় মসলা-মাসায়েল জ্ঞাত করানো হয় এবং হজ্জ যাত্রা সম্পর্কে সংবাদ জানানো হলে এ বালককেও যেন সাথে নিয়ে আসা হয়। আল্লাহ্ চাহে তো সে হাজী হবে।

এরপর তিনি সকল সঙ্গী-সাথী, মজলিসে উপস্থিত শহরবাসী, অধিকন্তু মওলানা 'আবদুল হাই (র) ও মওলানা ইসমা'ঈল (র)-কে একত্রিত করেন। তাদের দু'জনকে সম্বোধন করে বললেন ঃ অন্ধ ও জাহিলী যুগের কতিপয় ধ্যান-ধারণা মানুষের মন-মগজে এরূপভাবে বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, যদি তা সেখান থেকে ঝেটিয়ে বিদেয় করা না যায় তবে তা শেষ অবধি দীন ও ঈমানের পক্ষে ক্ষতির কারণ হবে।

প্রথমত, যখনই কারো বাচ্চা মারা যায় এবং আল্লাহ্ পাক পরবর্তীতে তাকে দ্বিতীয় বাচ্চা দান করেন, তখন প্রথম বাচ্চার নামে দ্বিতীয় বাচ্চার নামকরণ করে না এই ভয়ে, কি জানি—তার এ বাচ্চাটিও যদি এতে মারা যায়।

দ্বিতীয়ত, কোন গরীব মুসলমান তার বাচ্চার নাম নেতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তির নামে রাখতে পারে না।

তৃতীয়ত, ধনাঢ্য ব্যক্তি ও আমীর-ওমরা শ্রেণীর লোক গরীব শ্রেণীর লোকের দাওয়াত এড়িয়ে চলতে চায় এবং এতে তার যিল্লতি ও অবমাননা বোধ হয়।

চতুর্থত, যে খানা আমরা রান্না করি---বেচারা গরীব মানুষ তা পাকাতে পারে না, পাছে সে আমাদের সমপর্যায়ে ও সমকক্ষতায় উন্নীত হয়ে পড়ে।

এছাড়া আরো কতিপয় এ ধরনেরই কথাবার্তা তিনি বলেছিলেন এবং এ ধরনের মনগড়া অলীক কল্প-কথাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর তিনি মওলানা 'আবদুল হাই সাহেবকে ওয়াজ করতে বলেন। মওলানা এমন সাবলীল ও সুমিষ্ট ভাষায় ওয়াজ করেন যে, সবারই চোখ অশ্রু-

ভেজা হয়ে গেলো। সকলের মুখেই 'আমরা শুনলাম এবং সত্য বলে বিশ্বাস করলাম'---উচ্চারিত হচ্ছিল। ওয়াজ শেষ হবার পর তিনি ঐশী বিধানের (আহকামে ইলাহীর) প্রতি আনুগত্যের জন্য দোয়া করেন। যে সমস্ত লোক করীমুদ্দীন নাম রাখার ব্যাপারে আপত্তি উঠিয়েছিলো তারা পুনরায় নতুন-ভাবে বায়'আত হয় এবং সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর হাতে হাত দিয়ে তওবাহ করে।

সত্যিকার তওবাহ্

১২৩৪ হিজরীতে সৈয়দ বেরেলভী (র) প্রথমবার নিজ কাফেলার সাথে লাখনৌ আগমন করেন এবং টিলাওয়ালা 'আলমগীর মসজিদ (শাহ পীর মুহাম্মদ সাহেবের মসজিদ)-এর নিকট অবস্থান করেন। মাঝখানে তিনি নৈতিক ও চারিত্রিক পরিশুদ্ধি এবং তবলীগের পবিত্র কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। এটা ছিলো নওয়াব গাযীউদ্দীন হায়দার (সিংহাসন আরোহণ কাল ১২২৯ হিজরী)-এর নবাবী এবং মু'তামিদ উদ্দৌলা আগা মীরের ওযারতীর আমল। লাখনৌয়ে তখন সম্পদের প্রাচুর্য ও অপচয়, অপরের ন্যায্য অধিকারে অন্যায় ও অবৈধ হস্তক্ষেপ, অধিকার হরণ এবং ভোগ-বিলাসের ছড়াছড়ি।

মানুষের মন-মানসিকতা এবং তা গণ্য-মান্য ব্যক্তি থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষটি পর্যন্ত---সবারই ঝোঁক ও প্রবণতা ছিলো তখন ভোগ-বিলাসের দিকে। সৈয়দ ইনশা (মৃত্যু ১৩৩৩ হিজরী)-এর "দরিয়ায়ে লতাফত" নামক কাব্য-গ্রন্থ (যার রচনায় মীর্যা কাতীলও শরীক ছিলেন) পাঠ করলে সে সময়কার সাহিত্যে আদবের নামে বেআদবী, হীন ও নীচু প্রকৃতির ঠাট্টা-মস্করা, সাহিত্যিক অনাচার ও আত্মমর্যাদাহীন ক্রিয়াকাণ্ডে নিমগ্ন থাকার পুরো তথ্য অবগত হওয়া যায়।

সাম্রাজ্যের কেন্দ্র হওয়ার কারণে লাখনৌ ও তার অভিজাতমহল যেমন ব্যবসায়ী ও চাকুরীজীবী লোকদের আশ্রয়স্থল হ'য়ে উঠেছিল, তেমনি চাকুরী-প্রার্থীদের প্রয়োজন ও প্রার্থনা পূরণের কেবলায় পরিণত হয়েছিলো। ক্ষুদ্র শহরাঞ্চলের শত শত ভাগ্যান্বেষী অভিজাত ব্যক্তি ও পরিবার এবং শত শত চাকুরীপ্রার্থী অযোধ্যা সরকারের অনুগ্রহ লাভের মাধ্যম অনুসন্ধানে ও ভাগ্য পরীক্ষার জন্যে এখানে সমবেত হতো। এদের মধ্যে ভালো মন্দ সব ধরনের

লোকই ছিল। একদিকে লাখনৌ ছিলো জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-কলা, শিক্ষা ও প্রকাশনার কেন্দ্র—অন্যদিকে ছিলো ভোগ-বিলাস, পথভ্রষ্টতা, নীতি ও চরিত্রহীনতা এবং বিবিধ পাপাচারের আড্ডা।

সৈয়দ সাহেবের আগমন এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের আমল-আখলাক ও কার্যকলাপের খ্যাতি দেখতে দেখতে গোটা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। 'উলামায়ে কিরামের ওয়াজ-নসীহত, জামা'আতের সহজ সরল ও অনাড়ম্বর সাদা-সিধে কঠিন পরিশ্রমী জীবন, ইসলামী সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব, তাদের রাত্রি জাগরণ, বীরত্ব ও সাহসিকতা, অশ্বারোহণ পটুতা, আত্মোৎসর্গ ও কুরবানী, খিদমত ও আনুগত্য---মোটের উপর এই সমস্ত গুণ শহরের আবহাওয়া ও পরিবেশকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। শত শত এমনকি হাজার হাজার মানুষ তাঁর কাছে আসা শুরু করে। এদের মধ্যে অনেকেই আবার তামাশা দেখবার জন্য যেমন আসতো—তেমনি আবার থাকতো সত্য-সন্ধানীও, নিজেদের অতীত ভুল-ভ্রান্তির জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত ব্যক্তিরা যেমন আসতো---তেমনি আসতো পারলৌকিক কল্যাণের প্রার্থীরাও, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনাকারী যেমন আসতো, তেমনি আসতো সন্দেহ ও সংশয়-বাদিতার জালে আবদ্ধ ব্যক্তিরাও। এখানে তাদের সবারই নিজ নিজ জখমের ব্যাণ্ডেজ ব্যথার মলম এবং রোগের উপযুক্ত দাওয়াই মিলতো। সৈয়দ সাহেব তাদের সবার সাথে হাসিমুখে মিশতেন, প্রীতি ও সম্মানের সাথে তাদেরকে কাছে নিয়ে বসাতেন,---সান্ত্বনামূলক কথাবার্তা বলতেন, করতেন সালাতের কাতারে শরীক। এ সবের বাস্তব উপকারিতা এই হতো, অত্যন্ত নির্মম ও কঠিন হৃদয়ের অধিকারীও তাঁর কাছে এসে নরম ও দ্রবীভূত হয়ে যেত। লোকের সত্যিকার ও খালেস তওবা এবং অবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংঘটিত হ'তো, জাহিলী আচার-অভ্যাস থেকে ফিরে আসতো এবং এমন অবস্থায় এখান থেকে ফিরে যেত যে তাকে আর পূর্বের মানুষ হিসাবে চেনাই যেত না। সে তখন পরিবর্তিত, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক মানুষ। ঈমান ও একীনের উজ্জ্বল আলোকমালায় অন্তর তার পরিপূর্ণ, তাকওয়ার ন্যায় অমূল্য সম্পদ তার হাতের মুঠোয়, প্রশংসা গীতিতে মুখর সে তখন হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) এবং তাঁর সঙ্গীসাথীদের।

সে সময়েই একবার তিনি প্রতিদিনের স্বাভাবিক নিয়ম মাফিক মসজিদে অবস্থান করছিলেন। ইতিমধ্যে আমানুল্লাহ্ খান ও তার ভাই সুবহান খান

এবং তাদের সঙ্গী আরও কতিপয় ব্যক্তি চুরি, নানাবিধ পাপাচার ও অসামাজিক কার্যকলাপে যারা ইতিমধ্যেই কীর্তিমান হয়ে উঠেছিল, সৈয়দ সাহেবের খেদমতে এসে হাযির হয়। লোকজন তাদের আসতে দেখে সৈয়দ সাহেবকে এদের সম্পর্কে অবহিত করে এবং বলে যে, লোকগুলো অত্যন্ত বদমাশ প্রকৃতির ; তারা বিভিন্ন অবৈধ ক্রিয়াকাণ্ডে জড়িত। এতে তিনি সবাইকে সাবধান করে দেন যেন এদের সামনে এসব প্রসঙ্গে কোন আলোচনা না ওঠে। আল্লাহ তা'আলার দরবারে আশা রাখি তিনি যেন এদেরকে খারাপ কাজ থেকে ফিরিয়ে ভালো কাজ করবার তওফীক দেন আর এদের মৃত্যুটাও যেন উত্তম মৃত্যু হয়।

তারা এসে সৈয়দ সাহেবের সাথে মুসাফিহা ও কোলাকুলী করে। তিনি এদের অত্যন্ত সম্মান ও সমাদরে বসতে দেন এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে গভীর আগ্রহে তাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। কিছুক্ষণ পর তারা বিদায় প্রার্থনা করলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন,—"তোমাদের পেশা কি ?"

এতে তারা বহু ওযর-আপত্তি পেশ করে এবং বলে যে, তিনি যেন মেহেরবানী করে একথা জিজ্ঞেস না করেন। এটা যেমন আছে তেমন থাকলেই বরং তারা খুশী হবে। এদের সম্পর্কে জানে এমন কেউ বলে বসে,—বলো না, ক্ষতি কি! এতে তোমাদের জন্য ভালোও তো হতে পারে! হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) ও বললেন,—ঠিক আছে, বলেই ফেলো।

এরপর তারা চুরি ও অবৈধ ক্রিয়াকাণ্ডের গোটা কাহিনীর সবটাই খোলাখুলি ও পরিষ্কারভাবে বলে ফেলে। পরিশেষে বলে যে, এ পর্যন্ত এগুলোই ছিলো আমাদের পেশার মোটামুটি ফিরিস্তি। কিন্তু এখন আমরা আপনার পবিত্র হাতে হাত রেখে তওবাহ করছি। আমরা গত কাল যখন আপনার কাছে এসেছিলাম—তখন আমাদের কোন ধারণাই ছিলো না, শুধুমাত্র প্রমোদ ভ্রমণের উদ্দেশ্যেই আমরা এদিকে এসেছিলাম। মুরীদ হবার আদৌ কোন ইচ্ছা আমাদের ছিলো না। কিন্তু আমরা যখন আপনার কাছে বসলাম,—আপনার আমল-আখলাক দেখলাম, তখন আমাদের অন্তর মানসে এক অত্যাশ্চর্য অবস্থার সৃষ্টি হলো যা এখন বর্ণনাতীত। আকস্মিকভাবেই এমন এক ভাবানুভূতির উদয় হলো যে, ঘর-বাড়ী স্ত্রী-পুত্র ও পরিবার-পরিজন সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আপনার খিদমতেই পড়ে থাকি।

আমাদের আগমনের কারণও এটাই। সব শুনে হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) বললেন,---তোমাদের সকল সিদ্ধান্ত আজকের মতো মুলতবী রাখো। ইনশাআল্লাহ জুম'আর দিনে তোমাদের মুরীদ করবো। একথা শোনার পর তারা চলে যায়।

জুম'আর দিন বেলা কিছু বাড়লে তারা পুনরায় এসে হাযির হয়। তিনি তাদের বললেন,---জুম'আর সালাত সম্পাদনের পর বায়'আত নেওয়া হবে। সালাত সম্পাদনের পর তারা বায়'আত হয় এবং কিছু নগদ অর্থ-কড়ি সৈয়দ সাহেবের খিদমতে নযরানাস্বরূপ পেশ করে। তিনি তাদের থেকে এসব গ্রহণ করে পুনরায় এই বলে তা ফেরত দেন যে, এটা আমাদের তরফ থেকে আপন পুত্র-পরিজনদের দেবে। অতঃপর তারা আরজ জানায় কি করে তাদের পরিবার-পরিজনদের তারা বায়'আত করাতে পারে। সৈয়দ সাহেব বললেন,---"কোন দিন ঐ দিকে গেলে মুরীদ করে নেবো।"

একদিন তিনি গোলাগঞ্জের উঁচু ভূমির দিকে যাচ্ছিলেন। আমানুল্লাহ খান আরজী পেশ করে যে, তার গরীবখানা খুব নিকটেই। যদি মেহের-বানী করে হুযূর তার ওখানে কদম মুবারক রাখেন তাহলে অধম অত্যন্ত ধন্য হবে। সঙ্গী-সাথীরা ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। তিনি তার বাড়ীতে তশ্‌রীফ নেন এবং পরিবারস্থ সবার স্বীয় দস্ত মুবারকে বায়'আত নেন।

আমানুল্লাহ খান, সুবহান খান এবং মীর্জা হুমায়ূন বেগ তো এদিকে হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর হাতে বায়'আত নিয়ে ফেলেছে। কিন্তু তাদের দলেরই গোলাম রসূল খান, গোলাম হায়দার খান এবং সদর খান নামে তিনজন তখনও বাকী। তারা এসব ব্যাপারে কিছুই জানতো না। একদিন এই তিনজন আমানুল্লাহ্ খানের নিকট এসে উপস্থিত হয়ে বলে যে, তাদের এখন খুবই হাত টানাটানির ভেতর দিয়ে চলতে হচ্ছে। কিছু চেষ্টা-তদবীর করা দরকার,---অর্থাৎ চলো কোথাও গিয়ে কিছু চুরি-টুরি করি। জবাবে তারা বললো,---এখন আমাদের দ্বারা কিছু হবে না। এতে তারা অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে, ব্যাপার কি! আজকাল যাবে না---নাকি কখনোই নয়---ঘটনাটা কি?

মীর্জা হুমায়ূন বেগ তখন বললো,---আসল ব্যাপার এই যে, আমরা ভাই তওবাহ করেছি। আল্লাহ চাহে তো এখন থেকে আমাদের দ্বারা

এসব কাজ আর হবে না। তারা বললো,—কবে থেকে তোমরা তওবা করলে? হুমায়ুন বেগ উত্তরে জানায় যে, শাহ পীর মুহাম্মদ টিলার উপর বেরেলীর যে সৈয়দ সাহেব অবতরণ করেছেন তাঁরই নিকট আমরা মুরীদ হয়েছি। এরপর তারা সৈয়দ সাহেবের ফযীলত ও কামালিয়াতের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলে যে, একদিন আমরা চার-পাঁচজন লোক ভ্রমণ ও তামাশা দেখার উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট গিয়ে উপস্থিত হই। গিয়ে দেখি যে, হায় আল্লাহ! এ কি অবস্থা! সাক্ষাত-সন্দর্শন সবই হলো। তাঁর সম্পর্কে যেমনটি শুনেছিলাম ঠিক তেমনটিই পেলাম এবং তাঁর হাতে হাত রেখে অবশেষে আমরা মুরীদও হ'লাম। তিনি আমাদের তাওয়াজ্জুহ্ প্রদান করলেন যদ্দ্বারা আমরা খুবই উপকৃত হই। একথা শুনে গোলাম রসূল খান এবং তার সাথীদের মনেও সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর সাক্ষাত লাভের আকুল আগ্রহের সৃষ্টি হয়। সৈয়দ সাহেবকে কেউ কেউ ব্যাপারটা অবহিত করে। তিনি এদেরকেও সাক্ষাতের অনুমতি দান করেন। তারা খেদমতে হাযির হয়ে সৈয়দ সাহেব সম্পর্কে বাইরে-লোকমুখে যতখানি শুনেছিলো তার থেকে বরং কিছু বেশীই পায়। তারা সেই মুহূর্তেই তওবা করে, সেদিন থেকেই তাদের জীবনের গতিধারা আমূল বদলে যায়। হারাম পথে উপার্জিত সম্পদকে তারা ঘৃণা করতে শুরু করে। নিজেদের বাড়ী-ঘরে সন্দেহজনক বস্তুর ব্যবহারটাও তাদের জন্য কণ্টকর হয়ে ওঠে। সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছে প্রকাশ করলে তারাও তাঁর সাহচর্য কামনা করে। কারণ বাড়ীতে থেকে সেখানকার নাজায়েয ও সন্দেহজনক বস্তুর ব্যবহার থেকে বেঁচে থাকা তাদের জন্য খুবই মুশকিল ছিলো। সৈয়দ সাহেব তাদের তা'রীফ করেন এবং এ ধরনের সাহসিকতার সমাদর করেন। তাদের জন্য তিনি বরকতের দোয়া করেন এবং হালাল রুযী অন্বেষণ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন।

সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) যখন জিহাদের জন্য হিজরত করেন তখন তাদের অধিকাংশই তাঁর সাথে ছিলো। এদের মধ্যে কেউ আল্লাহ্র রাস্তায় শাহাদত লাভ করে এবং কেউ কেউ জীবিতও ছিলো যারা সারা জীবন জনগণের আত্মিক ও নৈতিক পরিশুদ্ধি, তাকওয়া তথা আল্লাহ্ ভীতি, ইস-লামের খেদমত, মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণ, ওয়াজ-নসীহত এবং দুনিয়ার বুকে—আল্লাহর কলেমার ঝাণ্ডাকে সুউচ্চ ও সমুন্নত রাখার মহান প্রচেষ্টায় ও শ্রম-সাধনায় অতিবাহিত করে।

ত্যাগ স্বীকারই প্রেমিকের নীতি

মওলানা বেলায়েত ‘আলী ‘আজীমাবাদী ছিলেন একজন আমীর-ওমরা পরিবার এবং উঁচু ও অভিজাত বংশের নন্দন। লালিত-পালিত হয়েছিলেন এমনই সম্পদ ও বিলাস-প্রাচুর্যের ভেতর দিয়ে যেমনটি নওয়াব ও আমীর-ওমরাদের বেলায় ঘটে। তাঁর পিতা মওলানা ফতেহ ‘আলী একজন বিশিষ্ট ‘আলিম ও শহরের নেতৃস্থানীয় বুযুর্গ ছিলেন। নানা মওলানা রফী‘উদ্দীন হোসেন খান ছিলেন বিহার প্রদেশের একজন হাকীম (শাসক)।

মওলানা বেলায়েত ‘আলী প্রাথমিক শিক্ষা নিজ পরিবার ও শহরেই লাভ করেন। এরপর তিনি লাখনৌ আসেন যা সে সময় অযোধ্যার রাজ-ধানী, সভ্যতা-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের কেন্দ্রভূমি হিসাবে পরি-গণিত ছিলো। এখানে তার উত্তম বসন-ভূষণ, নিশ্চিন্ত ও স্বাধীন একক জীবন, সুরুচিকর ও সৌন্দর্যমণ্ডিত এবং সুসজ্জিত জীবনের পুরো রাজত্ব চলছিলো। তিনি দামী থেকে দামী এবং উন্নত থেকে উন্নততর পোশাক-পরিচ্ছদ আর অত্যধিক পরিমাণে সুগন্ধি ব্যবহার করতেন।

হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) যখন লাখনৌ আগমন করেন তখন মওলানা মুহাম্মদ আশরাফ লাখনবী স্বীয় শাগরিদ বেলায়েত ‘আলীকে নিয়ে সৈয়দ সাহেবের সাথে সাক্ষাত করবার জন্য আসেন। উদ্দেশ্য ছিলো, সৈয়দ সাহেবের যোগ্যতার ও উপযুক্ততার পরীক্ষা করা। বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ শাগরিদও সম্ভবত এজন্যই এসেছিলো যে, আপন উস্তাদের বিজয় লাভে সে আমোদ ও তৃপ্তি পাবে। মওলানা মুহাম্মদ আশরাফ সৈয়দ সাহেবকে বলেনঃ وما ارسلنك الا رحمة للعلمين (আমি তোমাকে বিশ্ব জাহানের জন্য রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছি)-এর তফসীর আপনার যবান থেকে শুনতে আগ্রহী।

হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) এর উপর কিছু তকরীর (আলো-চনা ও বক্তৃতা) করেন এবং বিশেষ ভঙ্গিতে তার ব্যাখ্যাও করেন। মওলানা মুহাম্মদ আশরাফ সাহেব এই ব্যাখ্যা কোনদিন কোন কিতাবে পড়েন নি। মওলানার উপর এর অত্যন্ত প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তিনি এত বেশী পরিমাণে কাঁদেন যে, তার দাঁড়ি অশ্রুতে ভিজে যায়। এরপর দু’জনেই তৎক্ষণাৎ সৈয়দ সাহেবের হাতে বায়‘আত হন এবং শাগরিদ মওলবী বেলা-য়েত ‘আলী সৈয়দ সাহেবের আঁচল এমনিভাবে আঁকড়ে ধরেন যে, মৃত্যুর

পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তা ছাড়েননি। এখন এই যুবক (যে ছিলো পাটনার বিখ্যাত সৌখিন যুবক, বিহারের শাসকের অত্যন্ত আদুরে দৌহিত্র এবং বিলাস-ব্যসন ও সৌন্দর্য-চর্চায় নিজের উদাহরণ নিজেই) বাগাড়ম্বরপূর্ণ, কথাবার্তা, শান-শওকত ও জাঁক-জমকের প্রতি একদম অনাগ্রহী হয়ে পড়েছিলেন। খাওয়া পরার স্বাদের চাইতেও অনেক বেশী উন্নত ও সুউচ্চ এবং সূক্ষ্ম বস্তু তার অন্তর ও মনশ্চক্ষুকে বন্দী করে ফেলেছিলো। এখানকার এই ছোট্ট গ্রামটি (দায়েরায়ে শাহ 'আলামুল্লাহ্ (র)-তে তিনি এমন একটি জীবন ও যিন্দেগী প্রত্যক্ষ করেন, যা তার অতীত জীবনের তুলনায় অনেক বেশী মাধুর্যমণ্ডিত ও সৌন্দর্যময় এবং যা ছিলো প্রাকৃতিক স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের নিকটতর। তিনি এ জীবনের সাথে একদম একাত্ম হয়ে যান। যেভাবে তার অন্যান্য সাথীরা মেহনত ও খেদমতে মশগুল ছিলো ঠিক তেমনিভাবে তিনিও তাতে আত্মনিয়োগ করেন। অনুভব করতে শুরু করেন যে, আগের তুলনায় তিনি অনেক বেশী আরাম ও শান্তিতে আছেন এবং এখানে যে আনন্দ ও তৃপ্তি তিনি পাচ্ছেন—নিজের বাড়ী ঘরে তিনি তা কোনদিন পান নি।

দুররে মনছূরে প্রণেতা মওলানা 'আবদুর রহীম সাদেকপুরী বর্ণনা করেন যে, একদিন তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা মওলবী ফতেহ 'আলী সাহেব একজন খাদিমকে যে শৈশব থেকেই তাঁর (মওলানা বেলায়েত 'আলীর) খিদমতে নিয়োজিত ছিলো—চার শো টাকা নগদ এবং দশ-পনেরটা উৎকৃষ্ট কাপড় ও জুতা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিয়ে রায়বেরেলীতে তাঁর নিকট পাঠিয়ে দেন। খাদিম বেরেলী পেঁ ৗছে কাফেলায় গিয়ে শুধোয় যে, "পাটনার মওলবী বেলায়েত 'আলী কোথায় আছেন?" উত্তরে লোকেরা জানান যে, "তিনি নদীর ধারে মাটির কাজ করছেন।" নওকরটি নদীর ধারে গিয়ে দেখতে পায়—সেখানে বহু লোক মাটির কাজে ব্যস্ত। এদের মধ্যে জনাব মওলানাও কালো রং-য়ের একটি মোট তহবন্দ পরে এবং ধূলো কাদায় মলিন হয়ে নিজের কাজ করছিলেন। সে সময় তাঁর চেহারা এমনিভাবে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিলো যে, বহু পুরাতন ঐ নওকর যে নাকি তিরিশ বছর যাবত তার খাদেম হিসাবে কাজ করেছিলো—তাঁকে চিনতেই পারেনি। সে স্বয়ং মওলানাকেই জিজ্ঞেস করলো যে, পাটনার মওলবী বেলায়েত 'আলী সাহেব কোথায় আছেন? তিনি উত্তরে বলেন যে, ভাই! বেলায়েত 'আলী তো আমার নাম। এতে সে রাগান্বিত হয়ে বলে, আমি তোমাকে খুঁজছি না। আমি সেই বেলায়েত 'আলীকে খুঁজছি যিনি মওলবী ফতেহ 'আলী সাদেকপুরী আজীমাবাদীর

সাহেবযাদা (পুত্র)। এবার তিনি বললেন, ভাই! সাদেকপুর নিবাসী বেলায়েত 'আলী তো আমিই। এতে নওকরটি আরও রাগান্বিত হয়ে বলতে থাকে, —তুমি আমার সাথে ঠাট্টা-মস্করা করছো।

তিনি দেখলেন, লোকটির একথা কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না যে, তিনিই পাটনার সাদেকপুর নিবাসী মওলবী বেলায়েত 'আলী। অগত্যা তিনি বললেন, ঠিক আছে, যাও কাফেলায় তাকে তালাশ করো গিয়ে। সে অন্যদিকে গিয়ে জিজ্ঞেস করাতে প্রতিটি ব্যক্তিই তারই দিকে ইশারা করে দেখিয়ে দিতে থাকে যে, মওলবী বেলায়েত 'আলী সেই ব্যক্তি, যার সাথে তুমি নদীর ধারে কথাবার্তা বলে এসেছো। এরপর সে দ্বিতীয়বার মওলবী বেলায়েত 'আলী সাহেবের কাছে এসে নিজের ধৃষ্টতার জন্য লজ্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে। তিনি নওকরটিকে গলার সাথে জড়িয়ে ধরেন এবং অত্যন্ত সমাদরের সাথে গ্রহণ করেন। সে তখন চিঠি-পত্রসমেত টাকা-কড়ি ইত্যাদি সব কিছু তাঁর হাওয়ালা করে এবং আর্জী জানায় যেন তিনি কাপড়গুলি পরেন এবং টাকা-কড়ি নিজস্ব প্রয়োজেনে ব্যয় করেন। তার এরূপ বলার কারণ এই যে, সম্ভবত অজ্ঞ লোকটি মনে করেছিলো যে, টাকা-পয়সা হাতে না থাকার দরুনই তাঁর চেহারা এরূপ পরিবর্তিত হয়েছে। মওলবী বেলায়েত সাহেবের প্রাথমিক অবস্থাদি, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি স্মরণ করে সে জার জার হয়ে কাঁদতে থাকে। তিনি তাকে সান্ত্বনা বাক্যে আশ্বস্ত করেন। রাত হওয়া মাত্রই তিনি ঐ সব টাকা-পয়সা ও পোশাক-পরিচ্ছদ যেমন বাঁধা অবস্থায় এসেছিলো ঠিক তেমনিভাবেই নিয়ে গিয়ে হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর খেদমতে হাজির হন এবং সবগুলিই তাঁর সামনে রেখে দিয়ে নিঃশব্দে উঠে চলে আসেন। পরদিন ভোর বেলায় রোজকার মতো ছেড়া-ফাটা লুঙ্গি পরে নিজের মামুলী কাজ করতে থাকেন।

গতিময় ইসলামী সমাজ

ভারতবর্ষের বুকে দীর্ঘকালব্যাপী হজ্জ পালনের ফরযিয়ত বা অত্যাবশ্যকীয়তার বিধান পরিত্যক্ত ছিলো। কিছু সংখ্যক যুক্তিবাদী 'আলিম বলতেন, এদেশের মুসলমানদের জন্য হজ্জব্রত পালন ফরয নয়। কারণ পবিত্র মক্কায় পৌঁছার সামর্থ্য ও পরিবেশ থাকা হজ্জ ফরয হওয়ার একটি শর্ত। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ "সেখানে যাওয়ার যার সামর্থ্য রয়েছে।" আর এদেশ থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে পাল তোলা নৌকায় সমুদ্র সফর নিরাপদ

নয়। সুতরাং এ দেশের মুসলমানদের উপর হজ্জব্রত পালন ফরয হওয়ার কথা বলা পবিত্র কুরআনের উক্ত আয়াতের পরিপন্থী। হজ্জ ফরয না হওয়া এবং ভারতীয় মুসলমানদের উপর থেকে হজ্জের ফরযিয়ত অবসান ঘটার ব্যাপারে তারা রীতিমত ফতওয়াও প্রদান করেছিলো। কিন্তু ধর্মীয় তেজস্বিতা, ঈমানী দিক দিয়ে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং পাণ্ডিত্যের অধিকারী 'উলামায়ে কিরাম অনুভব করলেন যে, এটা একটা ধর্মীয় বিধানের বিকৃতি ও ফিতনা হিসেবে দেখা দেবে। সময়মতো এটা প্রতিরোধ করা না গেলে ভবিষ্যতে এর উৎসাদন ও উচ্ছেদ কষ্টকর হয়ে দেখা দেবে, দাঁড়াবে কঠিন হয়ে এবং ইসলামের বিরাট ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরয ও ধর্মের এই গুরুত্বপূর্ণ রুকনকে দ্বিতীয়বার জীবন্ত করে তুলতে স্থায়ী রেনেসাঁ ও জিহাদের আবশ্যকতা দেখা দেবে। তাতে ইসলামের মযবুতী ও সুদৃঢ় দুর্গে এমন একটি ফাটল দেখা দেবে, যা পূরণ করা মোটেই সহজসাধ্য ব্যাপার হবে না।

সুতরাং সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) এবং তাঁর দু'জন সাথী মওলানা আবদুল হাই বুরহানভী ও মওলানা মুহাম্মদ ইসমা'ঈল (র) জ্ঞানপূর্ণ, বাস্তব এবং কার্যকর উপায়ে এ ফিতনার উৎখাত করার জন্য প্রচেষ্টা শুরু করেন।

এরপরই সৈয়দ সাহেব হজ্জ গমনের প্রকাশ্য ঘোষণা প্রদান করেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন লোকজনের নিকট চিঠি-পত্র লেখেন, প্রতিনিধি পাঠান এবং সমস্ত সফর সঙ্গীর সাকুল্য ব্যয় নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেন। দেখতে দেখতে সমগ্র দেশব্যাপী এ খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) হজ্জে গমন করছেন এবং এ জন্যে তিনি সবাইকে দাওয়াত দিচ্ছেন। এ আন্দোলন ও উৎসাহের ফলে প্রেমের ছাই চাঁপা আগুনের ফুলকি বাইরে বেরিয়ে আসে এবং আগ্রহাতিশয্যের নির্বাপিতপ্রায় আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। দুর্বলচেতা লোকদের হিম্মত যায় বেড়ে। লোকেরা আগ্রহের আতিশয্যে নিজ নিজ জায়গা জমি বিক্রি করেও হজ্জের প্রস্তুতি নিতে থাকে। মুসলমানদের মধ্যে নতুনতর ঈমানী যিন্দেগীর একটি উচ্ছল স্রোতধারা বয়ে যায়। লোকজনের চিঠি-পত্র ও প্রতিনিধি দল আসতে শুরু করে। এমন একটি দিনও খালি যেতো না—যে দিন 'ইবরাহীম খলীলের' আহবানে সাড়া দানকারীদের কোন না কোন প্রতিনিধি দল না এসেছে। শেষ

অবাধি সেই পবিত্র দিনটিও এসে যায় এবং শওয়াল মাসের শেষ তারিখ সোমবার (১২৩৬ হিজরী) দিন চার শো'[১] সাথীসহ তিনি তাকিয়া নামক স্থান থেকে রওয়ানা হন। সী নদী[২] পার হয়ে অপর পাড়ের সমবেত লোকজনকে বিদায় দেবার এবং তাদের থেকে বায়'আত নেবার উদ্দেশ্যে তিনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন। এরপর তিনি রওয়ানা হন দালমূর[৩] অভিমুখে—যেখান থেকে তাঁর নৌকাযোগে কলকাতা যাবার কথা ছিলো। নিজ শহর ছাড়ার সময় সফরসঙ্গীদের সংখ্যা ছিলো চারশো।

এ কাফেলা ছিলো একটি ভ্রাম্যমাণ মাদরাসা, একটি চলমান সেনাছাউনী এবং খালেস ইসলামী পরিবেশে। এতে 'উলামায়ে কিরাম ওয়াজ করতেন। অন্য লোকজন দীন ও শরীয়ত সম্পর্কিত হুকুম-আহকাম এবং ইসলামের আদব-আখলাক শিখতো। কাফিলার সকল সঙ্গী-সাথীই সর্দি-গরম বরদাশ্ত করতে প্রস্তুত ছিলো এবং অভাব-অনটনেও আল্লাহর যিকরে থাকতো মুখর। কখনও ভীষণ বৃষ্টিপাত হতো, কখনও বা রৌদ্রের প্রচণ্ড দাবদাহ। পথে জলাভূমি, কাদামাটি এবং নদী-নালা পড়তো। যদি কখনও কারও পা পিছলিয়ে যেতো সে হাসি মুখে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতো এবং বলতো, তোমার প্রতিদানের কুরবান যে তোমারই রাস্তায় পড়ে গেছি; পেছনের সমস্ত হোঁচট খাওয়া, বেকার ও অর্থহীন ঘোরাফিরার এটাই কাফফারা। কেউ কেউ আবার খাজা হাফিজের এ কবিতাও কোন সময় আবৃত্তি করতোঃ

কা'বার উদ্দেশ্যে যদি মরু প্রান্তরে পা রাখো,
বাবলা গাছের কাঁটার আঘাতে দুঃখ করো না।

চারদিন চলার পর কাফেলা কিছুটা পথ অতিক্রম করে। 'এশার সালাত আদায়ের পর সৈয়দ সাহেব সমবেত কাফেলাকে লক্ষ্য করে বলেন, ভাই সব! তোমরা আজ কয়েকদিন যাবত মওলানা 'আবদুল হাইয়ের ওয়াজ

---

১. কলকাতা পৌঁছুতে পৌঁছুতে এ সংখ্যা সাতশ'তে গিয়ে দাঁড়ায়—যাদের নিয়ে তিনি হজ্জ সফরে রওয়ানা হন।

২. উল্লিখিত নদী হযরত শাহ 'আলামুল্লাহ (র)-এর নির্মিত মসজিদের ঠিক নিম্নদেশ দিয়ে প্রবাহিত। এ নদী হরদই-এর একটি স্থান থেকে উৎসারিত এবং রায়বেরেলী, প্রতাপগড় ও জৌনপুর জেলা অতিক্রম করে গঙ্গায় পতিত হয়।

৩. রায়বেরেলী জেলার একটি তহশীল ও ঐতিহাসিক ছোট শহর। এটি উচ্চ ভূমিতে গঙ্গার তীরে অবস্থিত।

শুনছো। ফজরের সালাত আদায়ের পর কিছু কথা অতঃপর আমারও শুনবে।

পরদিন ভোরবেলা ফজরের সালাত আদায়ের পর সবাই হাযির হলে তিনি ওয়াজ শুরু করলেন ঃ

"ভাইসব! যদি তোমরা ঘর-বাড়ী ছেড়ে দিয়ে হজ্জ পালন ও ওমরাহ্ আদায় করতে এজন্যেই যাও যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন—তাহলে তোমাদের কর্তব্য হবে পরস্পরে সবাই মিলিত হয়ে এমনি ঐক্য ও সদ্ভাব গড়ে তোলা যেমনি একই বাপ-মায়ের একাধিক সৎ ও আদর্শ সন্তান হয়ে থাকে।—প্রত্যেকের আরাম-আয়েশকে নিজের আরাম-আয়েশ এবং প্রত্যেকের দুঃখ-কষ্টকে নিজের দুঃখ-কষ্ট মনে করবে। প্রত্যেকের কাজ-কর্মে ও কায়-কারবারে বিনা অস্বীকৃতি ও বিনা ওজরে সাহায্য ও সহযোগিতা করবে। একে অপরের খেদমতকে লজ্জা ও অপমানজনক মনে করবে না; বরং এটাকে ইযযত ও গর্বের বিষয় বলে মনে করবে। আর এগুলোই আল্লাহ্র রিযামন্দী পাবার জন্য করণীয় কাজ। যখন তোমাদের মধ্যে এমনি ধরনের স্বভাব-চরিত্র গড়ে উঠবে তখন অন্যান্য লোকজনেরও আগ্রহ সৃষ্টি হবে যে, সত্যিই এরা আশ্চর্য ধরনের সব লোক; এদের সাথে শরীক হওয়া উচিত।

"আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল রাখো। প্রকৃত রিযিকদাতা তিনিই আর একমাত্র তিনিই পারেন সবার সব ধরনের অভাব-অভিযোগ দূর করতে ও পূরণ করতে। তিনিই দুনিয়া জাহানের পরওয়ারদিগার; তাঁর হুকুম ব্যতিরেকে কেউ কাউকে কিছু দেয় না।

"আল্লাহ রাব্বু'ল-'আলামীনের দয়া ও বদান্যতার প্রতি আমার রয়েছে পুরো একীন যে, বর্তমান সফরে আল্লাহ্ তা'আলা আমার হাতে লাখো মানুষকে হিদায়াত দান করবেন এবং এমন সব লোক পাকা তৌহীদবাদী ও মুত্তাকী হয়ে যাবে—যারা শির্ক ও বিদ'আত, অন্যায় ও পাপাচারের সমুদ্রে ডুবে আছে এবং যারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ইসলামী প্রথা-পদ্ধতি ও আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে। আমি দরবারে ইলাহীতে ভারতবাসীদের জন্য অনেক দোয়া করেছি যে, প্রভু! ভারতবর্ষ থেকে তোমার কা'বার রাস্তা বন্ধ। হাজার হাজার ধনাঢ্য ব্যক্তি যারা যাকাত দেবার সামর্থ্য রাখতো—তারা মারা গেছে। নিজ প্রবৃত্তি এবং শয়তানের এই প্রতারণায় যে, পথের নিরাপত্তা নেই, হজ্জ পালন থেকে

তারাও মাহ্‌রূম। ধনাঢ্য বহু ব্যক্তি এখনও জীবিত এবং এরূপ ওয়াস-ওয়াসার কারণে তারা হজ্জে যায় না। অতএব তুমি নিজ অসীম রহমত দ্বারা এমন রাস্তা খুলে দাও যেন মানুষ ইচ্ছা করা মাত্রই নিশ্চিন্তে ও নির্ভয়ে হজ্জে যেতে পারে, এরূপ একটি মহামূল্যবান নিয়ামত থেকে কেউ যেন বঞ্চিত না থাকে। আমার এই দোয়া সেই মহান সত্তা কবুল করেছেন। ইরশাদ হয়েছে যে, হজ্জ থেকে ফিরে আসবার পর এ রাস্তা সাধারণের সামনে খুলে দেয়া হবে। অতএব আল্লাহ্ চাহেনতো যেসব মুসলমান ভাই আগামী দিনের জন্য জীবিত থাকবেন তারা স্বয়ং স্বচক্ষে এরূপ অবস্থা দেখতে পাবেন।"

অতঃপর তাই হয়। তাঁর এ সফরের বরকতে হজ্জের দরজা খুলে যায় এবং তা এমনিভাবে খোলে যে, হাজীদের তালিকা বরাবর বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হতে থাকে এবং এটা পরিত্যাগ করার কাহিনী পুরনো কিসসা-কাহিনীতে পরিণত হয়। এর স্থান এখন শুধু ইতিহাসের দূরদিগন্ত রেখার একটি কোণে কিংবা ইতিহাসের টিকায় নিবদ্ধ।

খিদমতে খাল্‌ক বা জনসেবা

কলকাতার পথে মির্জাপুর পৌঁছে তিনি দেখতে পান, ফেরী ঘাটে তুলো ভর্তি একটি নৌকা দাঁড়িয়ে। তুলোর মালিক এসব গুদামে নিয়ে যাওয়ার জন্য মজুরের অপেক্ষা করছিলো। তিনি সঙ্গী-সাথীদের বললেন, "তুলোর গাইটগুলো উঠিয়ে নাও"। শতাধিক মানুষ নৌকায় নেমে যায় এবং দেখতে দেখতে নৌকা খালি করে গুদাম ঘরের দরজায় পৌঁছিয়ে দেয়। মানুষ এদৃশ্য দেখে রীতিমত বিস্মিত ও হতচকিত। তারা পরস্পর বলাবলি করতে থাকে,—এসব লোক তো সত্যিই আশ্চর্য ধরনের। জানা নেই শোনা নেই, —তুলোওয়ালার কাজ বিনা মজুরীতে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এভাবে করে দিলো। নিশ্চয়ই লোকগুলো অত্যন্ত আল্লাহ্‌ওয়ালা হবে।[১]

ইসলামী সাম্য

শত শত বর্ষব্যাপী ভারতবর্ষের বুকে বসবাস করার ফলে মুসলমানেরা অনৈসলামিক ধ্যান-ধারণা ও অভ্যাস দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত হয়ে যায়। এদের ধর্মীয় শিক্ষাও ছিলো অপূর্ণ; প্রয়োজনের তুলনায় তা মোটেই যথেষ্ট

১. ওয়াকায়ে' আহমদী, ৬৪৬ পৃষ্ঠা।

নয়। বিশেষ করে শাসকশ্রেণী এবং নেতৃস্থানীয় পর্যায়ের লোকেরা এ ব্যাধিতে আরও বেশী রকমে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলো। এদের ভেতর পার্শ্ববর্তী জাতিগোষ্ঠির প্রভাবে জাহেলিয়াতের কতিপয় নিকৃষ্ট অভ্যাস ও প্রথা সৃষ্টি হয়। এ সবের মধ্যে একটি ছিলো, জাতিভেদ প্রথা অর্থাৎ বিশেষ গোষ্ঠি ও বংশকে উঁচু ও সম্ভ্রান্ত মনে করা, কতিপয় পেশাকে হীন ও নিকৃষ্ট মনে করা এবং বংশ ও আভিজাত্যের গর্বে গর্ববোধ করা। এরূপ শ্রমজীবি ও পিছিয় পড়া মানুষের সাথে মেলামেশা, তাদের সাথে খানাপিনা এবং তাদের হর্ষ-বিষাদে তথা দুঃখে-সুখে যোগদান করাকে অনেক অভিজাত লোক লজ্জা ও অবমাননার বিষয় বলে মনে করতো।

মির্জাপুরের সাত ঘর মুসলমান ইটের ভাটার কাজ করতো। এরা ছিলো বেশ ধনী লোক। এদের প্রত্যেকের বাড়ীতেই পঞ্চাশ-ষাটটি করে গাধা ও খচ্চর ছিলো। যারা এদের থেকে ইট কেনাকাটা করতো এবং পরিবহন খরচ দিতো—তারা এ সমস্ত গাধা ও খচ্চরের পিঠে বোঝাই করে পাঠিয়ে দিতো। শহরে এরা পরিচিত ছিলো গাধাওয়ালা নামে। যদিও এরা ছিলো নিজ কওমের মধ্যে অত্যন্ত শরীফ—কিন্তু শুধুমাত্র এই নাম ও পেশার হীনতা ও নীচতার কারণে মির্জাপুরের অভিজাত এমনকি গরীব মুসল-মানেরাও এদের বাড়ীতে খানাপিনা করতো না।

এরা একদিন হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর খেদমতে গিয়ে আরজ জানায় যে, তিনি যেন মেহেরবানী করে তাদের গরীবখানায় তশরীফ রাখেন এবং তাদেরকে বায়'আত করে ধন্য ও গৌরবান্বিত করেন। তিনি এ আবেদন মঞ্জুর করেন। সেখানকার মুসলমানরা আরজ করলো সৈয়দ সাহেব যেন সেখানে না যান। কেননা এরা গাধাওয়ালা হিসাবে পরিচিত—যেজন্য শহরের কোন মুসলমানই তাদের ওখানে খানাপিনা গ্রহণে করে না। সৈয়দ সাহেব উত্তর বললেন, এটা কি কথা? তারা তো তোমাদের মুসলমান ভাই। তারা হালাল পেশা অবলম্বন করেই জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। আর এ পেশাতে কোনই দোষ নেই। এটাকে দোষ ভাবাটাও অত্যন্ত দোষের বিষয় আর তা এজন্য যে, গাধা ও খচ্চর পালা-পোষা এবং এতে সওয়ার হওয়া সুন্নত। আম্বিয়ায়ে কিরাম ও আওলিয়াকুল খচ্চর পুষেছেন এবং তার উপর সওয়ারও হয়েছেন। এখন পর্যন্ত মক্কা মু'আ-জ্জমা এবং মদীনা মুনাওয়ারাতে এ রীতিই প্রচলিত। এরপর তিনি তাদের

নসীহতও দিক-নির্দেশ দেন এবং ইট পোড়ানে ওয়ালাদের এই বলে সান্ত্বনা দেন যে, আমরা অবশ্যই তোমাদের ওখানে আসবো এবং দাওয়াতও খাবো। অতঃপর তিনি তাদের ওখানে তশরিফ নেন এবং খানাপিনা করেন।[১]

ভাইয়াকে বলে দিন যেন তিনি তাকে এখানে পাঠিয়ে দেন

সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর এরূপ সতর্কতা ও বিচক্ষণতা এবং বাস্তব ও কার্যকরী নমুনার বরকতে ঐ সমস্ত লোকদের এবং শহরবাসীদের মধ্যে অস্পৃশ্যতা ও অপরিচিতির যে প্রাচীর ও ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিলো তা এমনিতেই ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়। এরপর সমস্ত লোকই তাদের সাথে খানাপিনা শুরু করে।

মওলানা 'আবদুল হাই (র) ছিলেন এই গোটা কাফেলা ও মুজাহিদ বাহিনীর শেখুল ইসলাম এবং নির্দিষ্ট কোন স্থানে অবস্থানকালে কিংবা সফরে প্রতিটি স্থানে ওয়াজ-নসীহত করা ছিলো তাঁর নিত্য দিনের কর্মসূচীর অঙ্গ। যখন এ কাফেলা কোন জনবসতিতে অবতরণ করতো এবং অব-স্থান নিতো মওলানা 'আবদুল হাই সাহেব ওয়াজ করতেন এবং লোকদের অবস্থার সংস্কার সাধন ও পরিশুদ্ধি, তওবাহ ও আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য এবং যাবতীয় গোনাহ থেকে দূরে থাকার নসীহত করতেন; বিদ'আত এবং মুশরিকদের রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান থেকে তওবা করার দাওয়াত দিতেন। তাঁর ওয়াজ-নসীহতে অধিকাংশ লোকের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠতো, সৃষ্টি হতো অন্তর-মানসে ঈমানের তপ্ত প্রেরণা। সে নতুনভাবে ইসলাম ও ঈমানী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হ'তো এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (স)-এর আনুগত্যের এবং সকল পাপ কাজ ছেড়ে দেবার দৃপ্ত শপথে উদ্দীপ্ত হতো। আল্লাহর অপার কুদরত! একবার জনৈক বারবণিতা মওলানার কোন এক ওয়াজ মাহফিলে এসে উপস্থিত হয়। এখানে স্বল্পকালীন অব-স্থানের পর পুরনো পেশার প্রতি তার ঘৃণার সৃষ্টি হয়। সে তক্ষুণি পুরনো পেশা থেকে তওবা করে এবং ঈমান ও আনুগত্য, পবিত্র ও সৎজীবন যাপনের জন্য মওলানার হাতে শপথ নেয়।

কিন্তু মুসলিম খানদানগুলোতে বহুবিধ জাহিলী অভ্যাস তখন শেকড় বসেছিল। তাদের মধ্যে খান্দানী শরাফতী তথা বংশগত আভিজাত্যের গর্ব

১. ওয়াকায়ে' আহমদী।

ও অহংকার সৃষ্টি হয়ে যায়। তারা মনে করতে শুরু করে যে, অন্যদের থেকে তারা উত্তম। বিশেষ করে যাদের সম্পর্কে তারা জানতে পারতো যে, তারা পাপী এবং আল্লাহ্দ্রোহিতামূলক ও অন্যায় কাজে লিপ্ত—তাহলে তারা তাদেরকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখতো। শরীফ খান্দানের (অভিজাত বংশের) মেয়েরা সে সমস্ত মেয়েদের সাথে উঠাবসা করাকে মোটেই পছন্দ করতো না—যারা তাদের তুলনায় বংশীয় মর্যাদায় খাটো এবং একে অত্যন্ত দুষণীয় মনে করতো। এত কঠো রভাবে পর্দাপালিত হতো যে, কখনও কখনও এর কারণে তাদের আল্লাহ্ নির্দেশিত ফরয তথা অবশ্য পালনীয় কার্যাদি ও সালাত পরিত্যাগ করা অপরিহার্য হয়ে পড়তো।

উল্লিখিত মহিলাটি তওবা করার পর সৈয়দ সাহেব তার ভাতিজা সৈয়দ 'আবদুর রহমানকে বলেন যে, একে নৌকায় উঠিয়ে দাও। মহিলাটিকে নৌকায় নিয়ে যাওয়া হলে সমবেত মহিলাবৃন্দ চিৎকার শুরু করলো যে, এখানে কোন জায়গা নেই; একে অন্য কোন নৌকায় উঠাও। সৈয়দ 'আবদুর রহমান সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর নিকট আরজ জানালেন। তিনি অতঃপর মওলবী ওহীদুদ্দীন সাহেবকে বলেন যে, নেকবখ্ত এই মহিলাটিকে কোন একটি জায়গায় নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দাও। তিনি সমবেত মহিলাদের নিকট একে জায়গা দেবার জন্য বলাতে তারা বলতে শুরু করে যে, যেহেতু মহিলাটি একটি বাজারী স্ত্রীলোক,—সেহেতু তারা তাকে তাদের নৌকায় বসতে দেবে না। এ ঘটনাও সৈয়দ 'আবদুর রহমান সৈয়দ সাহেবের নিকট বিবৃত করেন। মওলানা 'আবদুল হাই সাহেব একথা শোনেন এবং সেখান থেকে উঠে নৌকার কাছে যান এবং সমবেত সমস্ত মহিলাকে লক্ষ্য করে বলতে থাকেন যে, তোমরা এই নেকবখত মহিলাটিকে নিজেদের নৌকায় কেন বসতে দিচ্ছো না? আজ থেকে এই নেকবখ্ত মহিলাটি বিগত দিনের সকল পাপ কাজ থেকে তওবা করেছে আর এ মুহূর্তে সে আমাদের সবার থেকে উত্তম। আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের শর'য়ী হুকুম তোমাদের উপর যেমন ফরয—এর উপরও ঠিক তেমনি ফরয। প্রত্যুত্তরে সবাই জানায় যে—যদি কথা এটাই হয়ে থাকে তবে পর্দাবৃত করে ছাদের উপর নিয়ে গিয়ে তাকে আলাদাভাবে বসিয়ে দিন। মওলানা বলেন,—ছাদের উপর! যখন তোমাদের ভেতর কেউ ছাদের উপর গিয়ে বসতে পারে না—তখন সে কেন সেখানে বসবে! এরপর আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলে। এতে তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে বলেন যে, এদের মধ্যে 'আবদুল হাইয়ের স্ত্রী যিনি আছেন—

'তিনি চাদরমুড়ি দিয়ে নেমে আসুন নৌকা থেকে। এ নির্দেশ তিনি তিনবার দেন। দু'বার বলার পরও অবতরণ না করাতে তিনি তৃতীয়বার বলেন যে, যেরূপ শর'য়ী পর্দা সম্পর্কে তোমাকে বলা হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে চাদর দিয়ে নিজেকে আবৃত করে নৌকা থেকে নেমে এসো। অতঃপর মওলানা সাহেবের স্ত্রী তদ্রূপ আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে নৌকা থেকে অবতরণ করে তীরে এসে দাঁড়ান। মওলানা অদূরে দাঁড়িয়ে বলতে থাকেন, ঘরে কি আমি তোমাকে বলিনি যে, এ সফরে তোমাকে যাতা ঘোরাতে হবে, রুটিও প্রস্তুত করতে হবে, প্রয়োজনীয় সকল কাজই করতে হবে। এমনকি পদব্রজেও চলতে হবে। এসব স্বীকার করার পরই আমি তোমাকে সাথে নিয়েছি। এরপর তিনি সমবেত মহিলাদের সম্বোধন করে বলতে থাকেন, দেখুন! 'আবদুল হাইয়ের স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে এবং শর'য়ী পর্দা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (স')-এর হুকুম মুতাবিক একেই বলা হয়। একথা তিনবার বলার পর তিনি স্ত্রীকে বলেন, এখন ঐ নৌকায় গিয়ে বসো। এরপর তিনি মওলানা ওহীদুদ্দীন সাহেবকে বলেন যে, আমাদের বোন বিবি রোকাইয়াকে বলে দিন যেন সে মহিলাটিকে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে বসতে দেয়, তাকে উপদেশমূলক কথা বলে এবং দীন-ইসলাম সম্পর্কিত কথাবার্তা ও মসলা-মাসায়েল শেখায়। বিবি রোকাইয়াও এসব কথা শুনছিলেন। তিনি মওলবী সাহেবকে বললেন, "ভাইয়াকে বলে দিন যেন তিনি তাকে এখানে পাঠিয়ে দেন।"[১]

তওবা ও ঈমানের বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে

হাজীদের এ কাফেলাকে রায়বেরেলী থেকে কলকাতা পর্যন্ত যুক্ত প্রদেশ, বিহার ও বাংলা—এই তিনটি প্রদেশের বহু শহর বন্দর গ্রাম অতিক্রম করতে হয়। শহরের জনবসতি, তার গুরুত্ব এবং শহরবাসীদের চাহিদা ও আগ্রহ মাফিক কাফেলা বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করতো। এ সমস্ত জায়গায় ঐ কাফেলাকে যেরূপ উষ্ণ উৎসাহ, গভীর আগ্রহ ও পরম সমাদরে অভ্যর্থনা জানানো হ'তো, সেসব দৃশ্য ছিলো সত্যি বিরল। মনে হচ্ছিলো এদেশ যেন নতুন করে জেগে উঠছে এবং তওবার যেন গণ-আমন্ত্রণ জানান হয়েছে। লোকজন দলে দলে স্রোতধারার ন্যায় সৈয়দ সাহেবের খেদমতে হাযির হয়ে বায়'আত হ'তো, তাঁর হাতে হাত দিয়ে তওবা করে

১. ওয়াকায়ে' আহমদী, ৬৪৯-৬৫১ পৃষ্ঠা।

তৌহীদ ও খালেস দীনের জন্য হতো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। শির্ক ও বিদ'আত, পাপ, অন্যায় এবং গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকবার শপথ নিত। আল্লাহ্র নির্দেশাবলীর মর্যাদা এবং রসূলে করীম (স')-এর সুন্নত (বাস্তব জীবনা-দর্শ)-এর প্রতি মহব্বত, তাদের মন ও মগজে দৃঢ় বদ্ধমূল হয়ে যেত। এ বায়'আত গ্রহণের প্রভাব তাদের জীবনে অত্যন্ত দ্রুত দেখা দিত। শির্ক, বিদ'আত ও নিন্দনীয় কাজের নাম নিশানা মুছে ফেলা হতো। তা'যিয়া ভেঙে ফেলা হতো। চবুতরা, ইমামবাড়া মসজিদে রূপান্তরিত করা হতো। অনেক সময় দেখা গেছে যে, লোকজন নিজেরাই কাগজের নির্মিত তা'যিয়া জ্বালিয়ে এর দ্বারাই তাঁর কাফেলাকে দাওয়াত করেছে। শহরের সমস্ত অধিবাসী তাঁর অভ্যর্থনায় বেরিয়ে আসতো, কেউই অবশিষ্ট থাকতো না। লোকজনের ধারণা ছিলো, কোন কোন সময় গ্রামাঞ্চল ও শহরের এমন কাউকে দেখা যেত না যে তওবাহ ও ঈমানের নতুন শপথে উদ্দীপ্ত না হয়েছে।

বেনারসে একবার ১৫-১৬ দিন অবধি পানি বর্ষণ অব্যাহত থাকে। মুষলধার এ বৃষ্টিতেও সেখানকার লোকেরা সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) কে বায়'আতের উদ্দেশ্যে নিজেদের বাড়ী-ঘরে নিয়ে যেত। কোন কোন সময় বাসায় ফিরতে তার গভীর রাত হয়ে যেত। রাস্তায় কাদা পানি থাকা সত্ত্বেও যাতায়াতের ব্যাপারে কখনো তিনি কারো সাথে ওজর-আপত্তি করেন নি। মিঞা দীন মুহাম্মদ বলেন, বেনারসে যে সময় লোকজন তাঁকে নিতে আসতো—ঠিক সে মুহূর্তেই তিনি তাদের সাথে চলে যেতেন। অন্ধ-কার রাত, বিজলী চমকাচ্ছে, বৃষ্টির অবিশ্রান্ত ধারা—এমতাবস্থায়ও তিনি হারিকেন হাতে লোকজনের ঘরে ঘরে গিয়ে হাযির হতেন। লোকজন বায়আত হ'তো। কোন কোন সময় তিনি লোকদের বলতেন, ভাইয়েরা! এরূপ পানি কাদায়- তোমাদের চলাফেরা সে তো শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দে-শ্যেই। যদি আল্লাহ্ পাক পরওয়ারদিগার তোমাদের এই চলাফেরাকে পছন্দ করে আপন বান্দাদের—তাঁর তাবেদার বান্দার ভেতর শামিল করে নেন তবে তা খুবই সুখের হবে। একথা শুনে আমরা খুশী হয়ে যেতাম এবং ঐ মুহূর্তের কষ্টকে আরাম ও শান্তির বলে মনে করতাম আর এতে আমরা ঘাবড়াতাম না মোটেই।[১]

---

১. ওয়াকায়ে' আহমদী ;

কোন কোন সময় একই মহল্লাতে কয়েক হাজার লোক তাঁর নিকট বায়‘আত হয়েছে। দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিন এক মহল্লার লোকেরা সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-কে নিয়ে যায় এবং বলে যে, আজ দু’বেলায়ই আপনার যিয়াফত। তারা কয়েকশো তা’যিয়া ভেঙে-চূরে তার কাগজ ও লাকড়ী-গুলো জমিয়ে বেশ রাশ করে তোলে। সৈয়দ সাহেবকে নিয়ে গিয়ে তারা সে সব দেখিয়ে বলে যে, আপনার দাওয়াতের খানা রান্না করবার জন্য এগুলোই জ্বালানী হবে; দু’বেলাই লাকড়ীগুলো জ্বালানো হবে। এরপর ঐ লাকড়ীগুলো দিয়েই তারা পোলাও পাক করে এবং পুরো কাফেলাকে খাওয়ায়। অগণিত লোক যারা তখনও বায়‘আত হয়নি তারাও এ সময় বায়’আত নেয়।[১]

এখানে মুসলমানদের বিভিন্ন বংশ ও গোষ্ঠির মধ্যে বহুকাল থেকে ঝগড়া-বিবাদ চলে আসছিলো। একে অপরের মুখ দেখা ও পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সালাম-কালাম ইত্যাদিতেও অনভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। কয়েক বছরের ভেতরেও একে অন্যের সাথে মোলাকাতের সুযোগ আসতো না,—আর এ শত্রুতা ও সম্পর্কচ্ছেদ উত্তরাধিকারসূত্রেই পুরুষানুক্রমে চলে আসছিলো।

হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) সেখানকার মুসলমানদের মধ্যে সন্ধি সমঝোতা স্থাপন এবং বিবাদ-বিসম্বাদ নিরসনে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি কতিপয় বংশ ও গোষ্ঠির চৌধুরী, নেতৃস্থানীয় ও অভিজাত ব্যক্তিবর্গকে, যাদের মধ্যে সাপে-নেউলের সম্পর্ক বিরাজ করতো, একের সাথে অপরকে হাতে মিলিয়ে দেন। একবার তিনি এদের সবাইকে একত্র করে বলেছিলেন যে, “আমার অনেক লোকের নিকট থেকে শুনছি যে, বহু বছর ধরে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও অনৈক্য বিরাজ করছে আর তা কোনভাবেই নিরসন হচ্ছে না। এসবই শয়তানী চক্রান্ত এবং এতে বিভিন্ন রূপ ক্ষতির আশংকা প্রচুর। দীন-ধর্মের জন্যও বটে আর দুনিয়ার জন্যও বটে। দুনিয়ার বুকে সবচেয়ে ক্ষতিকর বিষয় হলো আত্মীয়তা বিচ্ছেদ। আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাদের ধনী ও মালদার বানিয়েছেন আর দিয়েছেন সর্বপ্রকার বুদ্ধি-কৌশল। এসব দুনিয়ার কাজের জন্যে যেমনি ইচ্ছে করছো ব্যয় করছো। নিজের নাম ও খ্যাতি

---

১. ওয়াকায়ে‘ আহমদী।

প্রতিষ্ঠার জন্য মৃত্যুবরণ করছো। তোমাদের উচিত আল্লাহ্ তা'আলার এসব নেয়ামতের তোমরা শুকরিয়া আদায় করবে এবং তাঁর নেয়ামতের না-শোক্রীকে ভয় করবে। অতএব তোমরা আজ থেকে পরস্পরের সাথে মিলে মিশে যাও।" একথা শোনা মাত্রই সবাই একে অপরকে বুকে জড়িয়ে ধরে এবং পরস্পর পরস্পরের সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়, নিজেদের মধ্যে সন্ধি সমঝোতা করে নেয়। এরই পরিণতিতে সৈয়দ সাহেবের অনুসারী হাজার হাজার পরিবারের লোকজন নিজেদের পারস্পরিক অনৈক্যের হাত থেকে তওবাহ করে। তাদের ছাড়া অন্যান্য যেসব হিন্দু-মুসলমান সেখানে উপস্থিত ছিলো—এই অবস্থা দেখে তারাও আশ্চর্য ও বিস্মিত হয়ে যায় এবং বলাবলি করতে থাকে যে, বছরের পর বছর এখানকার শেঠ ও সম্মানিত মহাজন অভিজাত ও আমীর-ওমরা শ্রেণীর লোকজন তাদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য মধ্যস্থতা করতে চেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন, কিন্তু কারো চেষ্টাতেই কোন ফলোদয় হয়নি। আর কিনা সৈয়দ সাহেব একটিমাত্র জলসাতেই সে সবের নিষ্পত্তি করে দিলেন![১] তওবা ও বায়'আতের গুঞ্জন ধ্বনি ক্রমে ক্রমে হাসপাতালের রোগীদের নিকট পর্যন্ত পেঁছে যায়। বেনারসের প্রসিদ্ধ পুরনো টাকশালটিতে ইংরেজরা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে-ছিলো। এখানে ৫০-৬০ জন মুসলমান রোগীও ছিলো। তারা নিজেদের লোক পাঠিয়ে সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর খিদমতে দরখাস্ত পেশ করে যে, আমরা অক্ষম বিধায় আপনার ওখানে আসা আমাদের পক্ষে খুবই কঠিন। মেহেরবানী করে আল্লাহ্র ওয়াস্তে আপনি যদি এখানে আসেন তবে আমরাও বায়'আত হতে পারবো। একদিন তিনি কতিপয় লোকজনসহ সেখানে তশরীফ রাখেন এবং মুসলমান রোগীদের বায়'আত গ্রহণ করেন।

নফল থেকে ফরয পর্যন্ত

'আজীমাবাদ (পাটনা) পৌঁছুবার পর কতিপয় তিব্বতীয় মুসলমানের সাথে সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তারা হজ্জ-ব্রত পালনের উদ্দেশ্যে পথে ক্ষণিক যাত্রা বিরতি করেছিলো। তিনি তাদের নিজের দেশ এবং সে দেশের মুসলমানদের অবস্থা ও কুশলাদি জিজ্ঞেস করেন। তারা বললো যে, সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম আর

১. ওয়াকায়ে' আহমদী;

অধিকাংশই শুধু নামে মাত্র মুসলমান। এরা কবর পূজা ও পীর পূজায় লিপ্ত।

সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) এদের জিজ্ঞাসা করেন,—তোমরা যে বায়তুল্লাহ্ শরীফ যাবার নিয়্যত করেছো,—তা কি পরিমাণের পাথেয় তোমাদের সঙ্গে আছে? যদি এমত পরিমাণে থাকে যে খেয়ে দেয়ে যেতে ও আসতে পারবে তবে ভালো কথা—তোমরা যাও।

তারা আরজ করলো যে, এমত পরিমাণ খরচের টাকা তো আমাদের কাছে নেই কিন্তু আমরা শুনেছি যে, আপনি সাধারণ অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তিই যেতে ইচ্ছে করবে তাকেই আপনি সাথে নিয়ে যাবেন। আমরাও তাই পথে বেরিয়ে পড়েছি।

তিনি বললেন,—কথা তো সত্যি, যে শর্তের ভিত্তিতে আমরা সাধারণ ঘোষণার অনুমতি দিয়েছিলাম তা এই ছিলো, যে ব্যক্তিই ইচ্ছে করবে সেই হজ্জে যেতে পারবে, কিন্তু যেহেতু পথের সম্বল তোমাদের কাছে কম আছে—সেহেতু তোমাদের উপর হজ্জও ফরয হয়নি এবং বায়তুল্লাহ্ শরীফ যাবার অর্থ এটাই যে, আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট ও রাযী হবেন। এখন যদি তোমরা সবাই একথা মেনে নাও তবে তোমাদের আমি একটি কথা বলবো যা এমনি ধরনের হজ্জ করা থেকে দ্বিগুণ পুরস্কার ও ছওয়াব,—বরং এর থেকেও বেশী কল্যাণকর হবে। তারা আরয করলো, এর থেকে আর কি উত্তম ব্যবস্থা হতে পারে। আমরা প্রস্তুত আছি।

তিনি বললেন যে, আমি তোমাদের সবাইকে খিলাফতনামা প্রদান করে আমার খলীফা নিযুক্ত করবো এবং আমি তোমাদের যেখানে পাঠাবো তোমরা সেখানে যাও। তারা জানায়—আমরা এ কাজের জন্য প্রস্তুত আছি। সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) বললেন, আমি তোমাদের স্বদেশেই ফেরত পাঠাচ্ছি এবং পরিচিতি পত্র লিখে দিচ্ছি। সেখানে গিয়ে মুসলমানদের তওহীদ ও সুন্নতে রসূল (স') সম্পর্কে অবহিত করবে,—শিরক্ ও বিদ'আত থেকে বাঁচাবে। কিন্তু একটি কাজ অবশ্যই করবে যে, যদি কেউ তোমাদের চেলাকাঠ, পাথর, লাথি, ঘুষি—যা দিয়েই মারতে আসুক না কেন—সর্বাবস্থায় ধৈর্য ধারণ করবে আর তাদের কিছুই বলবে না। এ ভাবেই শিক্ষা প্রদানের কাজ চালিয়ে যাবে। আল্লাহর ফযলে দেখতে পাবে—অতি অল্পদিনেই দীন-

ইসলামের কেমন উন্নতি হয়েছে আর তোমাদের কষ্ট প্রদানকারী স্বয়ং নিজে এসে তোমাদের থেকে মাফ চেয়ে নিচ্ছে।

এ সমস্ত কথা শুনে তারা নিজেদের ওজর-আপত্তি বর্ণনা করতে শুরু করে যে, আমরা লেখাপড়া জানি না আর ওয়াজ-নসীহত করার জন্য তো 'ইল্‌ম দরকার। তিনি বললেন,—চিন্তার কোন কারণ নেই। ইসলাম আল্লাহ্‌র এবং তিনিই তোমাদের মদদ করবেন। ইনশাল্লাহ্‌ তোমাদের হাত দিয়েই হাজার হাজার মানুষ হিদায়াত পাবে। অতঃপর কয়েকটি পাতায় তওহীদ ও সুন্নতে রসূল (স') সম্পর্কে তাকীদ এবং শির্‌ক ও বিদ'আত রদ হওয়া সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনের সমস্ত আয়াত ও হাদীছ পাক লিখে তাদের দিয়ে দেন এবং আল্লাহ্‌র নামে এদের রওয়ানা করে দেন।

পরবর্তী ঘটনাবলীতে সৈয়দ সাহেবের উক্তি সম্পূর্ণ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রারম্ভে তাদের অনেক দুঃখ-কষ্ট ও অসুবিধার মুখোমুখী হতে হয়েছে। কিন্তু তারা পুরুষোচিত হিম্মত, দৃঢ়তা ও ধৈর্যের সাথে সত্যের পথে অটল ও অবিচল থাকে এবং পরিণতিতে যে সমস্ত লোক এদের দুঃখ-কষ্ট ও জ্বালা-যন্ত্রণা দিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলো তারাই এদের পায়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা চায়। হাজার হাজার লোক এদের দ্বারা হিদায়াত-প্রাপ্ত হয়। তিব্বতে দীন-ইসলাম ভালোভাবে বিস্তার লাভ করার পর এদেরই কতিপয় লোক কলেমার পয়গাম নিয়ে চীনে গিয়ে উপস্থিত হয়। চীন দেশেও এদের দ্বারা ইসলামের প্রসার লাভ ঘটে এবং চীনারা ঈমানের মিষ্টতার সাথে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভে ধন্য হয়।

আমরা এখন ট্যাক্স দিতে পারবো না

হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীরা হজ্জব্রত পালনের অভিপ্রায়ে কলকাতা পেঁৗছেন। এখানে তাঁর কয়েক দিনের অবস্থানেরও সুযোগ ঘটে। সত্য-সন্ধানীরা পতঙ্গের ন্যায় তাঁর সাক্ষাত সন্দর্শনের আশায় ঝাঁপিয়ে পড়ছিলো। অত্যধিক ভীড়ের কারণে সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর বিশ্রাম নেওয়া এবং খানাপিনার সুযোগ করাও কঠিন হয়ে গিয়েছিলো। মওলানা 'আবদুল হাই (র) এবং মওলানা ইস-মা'ঈল (র)-এর ওয়াজ-নসীহতের ধারা জোরে-শোরেই অব্যাহত ছিলো। সাধারণ মানুষের ভাগ্যে বহু দিন পর ঈমানের স্বাদ ও মিষ্টতা উপভোগের

মওকা জোটে। অধিকাংশ লোকই বলতো যে, আমরা নতুনভাবে মুসলমান হয়েছি। প্রথম দিকে আমরা শুধুমাত্র ইসলামের নাম এবং ধর্মের বেশ-ভূষা ও চেহারা-সূরতের সাথে পরিচিত ছিলাম; তার হাকীকত সম্পর্কে ছিলাম সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

মওলানা 'আবদুল হাই সাহেব জুম'আর ও মঙ্গলবার দিনে সালাতুজ্জো-হর বাদ সন্ধ্যা পর্যন্ত ওয়াজ করতেন। লোকজন পতঙ্গের ন্যায় সমবেত হ'তো। প্রতি দিন ৫০ থেকে ১০০ জন হিন্দু মুসলমান হ'তো। এদের থাকবার জন্য একটি আলাদা বাসগৃহ ছিলো। তাদের খিদমত ও আরাম-আয়েশের দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য কাফেলার দশ-বারো জন লোক সর্বদা নিযুক্ত থাকতো।

এ সময় গোটা বাংলাদেশে একটা রেওয়াজ অধিক মাত্রায় প্রচলিত ছিলো যে, প্রথম বিয়ে তো পিতা-মাতাই দিয়ে দিতেন। এরপর যখনই যার ইচ্ছে হ'তো কোন মহিলাকে নিজের বাড়ী উঠিয়ে আনতো এবং তাকে বিয়ে-শাদী ব্যতিরেকেই তার সাথে দাম্পত্য জীবন-যাপন করতো। কয়েক-জন 'আলিমকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয় যে, বায়'আত গ্রহণের পর তারা যেন পঞ্চাশ থেকে একশো জন মানুষের এক একটি দলকে আলাদা আলাদা বসিয়ে তাদের অবস্থাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। যে সব নারী-পুরুষকে বিয়ে-শাদী ব্যতিরেকে দাম্পত্য জীবন যাপনরত পাওয়া যেতো এবং তারা যদি উপস্থিত থাকতো তবে ঐখানেই তাদের বিয়ে পড়িয়ে দেওয়া হ'তো। দু'জনের ভেতর কেউ অনুপস্থিত থাকলে তাদের ডেকে এনে বিয়ে পড়িয়ে দেওয়া হ'তো। কারো উপস্থিতি সম্ভব না হ'লে তাকে শক্তভাবে তাকীদ করা হ'তো যেন অতি সত্বর এ ফরযটি সম্পন্ন করা হয়।

বিভিন্ন গোত্র ও খান্দানের চৌধুরী এবং সর্দারগণ নিজ নিজ গোত্র ও খান্দানের মধ্যে প্রকাশ্য ঘোষণা করে দেয় যে, যারা সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর হাতে বায়'আত এবং শরী'আতের বিধি-বিধানের প্রতি পাবন্দ হয়নি তাদের সাথে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক ছিন্ন করা হলো, তাদের সঙ্গে আমাদের এবং আমাদের সঙ্গে তাদের কোনরূপ যোগসূত্র থাকবে না। এ ঘোষণায় বেশ জনসমাগম হতে থাকে। সৈয়দ সাহেবের প্রতি জনগণের আকর্ষণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। দীন-ধর্মের ব্যাপক প্রচলন ও নবী করীম (স·)-এর বাস্তব জীবনাদর্শ অনুসরণ তৎপরতা জীবন্ত হয়ে ওঠে। এ অবস্থাটাই মাখখান প্রণেতার ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে ঃ

এ জগত ও জনসমাজে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে,
তুমি বলতে এ যেন নবীর যুগ পুনরুজ্জীবন লাভ করেছে।

এরূপ পরিস্থিতিতে কলকাতার শরাব বিক্রয়ের দোকানগুলোতে আক-স্মিকভাবে শরাব কেনাবেচা বন্ধ হয়ে যায়। দোকানদারেরা ইংরেজ সরকারের নিকট অভিযোগ পেশ করে যে, আমরা বিনা কারণে সরকারী ট্যাকস্ যুগিয়ে যাচ্ছি। কেননা একজন বুযুর্গের বিরাট কাফেলাসহ এই শহরের বুকে পদার্পণের ফলে আমাদের দোকানগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। শহর ও গ্রামাঞ্চলের সমস্ত মুসলমান তাঁর নিকট মুরীদ হয়েছে এবং তাদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। তারা সকল প্রকার নেশা জাতীয় মাদকদ্রব্য থেকে তওবাহ করেছে। এখন কেউ আর আমাদের দোকানের কোলও ঘেষে না।[১]

অতএব সরকারী হুকুমনামা বের হ'লো যে, যতদিন পর্যন্ত সৈয়দ সাহেব এবং তাঁর দলবল কলকাতায় অবস্থান করবে ততদিন পর্যন্ত ট্যাকস্ দেওয়া লাগবে না। তাঁর বিদায় নেবার পর যদি সাবেক অবস্থার পুনর্বহাল হয় এবং শরাবের ক্রয়-বিক্রয় স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকে তবে কর পুনরায় ধার্য করা হবে।

মূর্খতার আসবাব অথবা কল্যাণ ও হিদায়াতের সমান ?

সেই যুগে ভারতবর্ষের মুসলমানদের অশ্বারোহণ ও বীরত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যা-বলী দ্রুত লোপ পাচ্ছিলো। বিজয়ী জাতির কর্মনৈপুণ্য যা তাদের অতীতকে উজ্জ্বল ও চমকপ্রদ বানিয়েছিলো এবং যার সাহায্যে তারা সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প হয়েও এই বিশাল ও বিস্তৃত দেশটাকে করতলগত করেছিলো—এখন আর তা তাদের ভেতর পরিদৃষ্ট হচ্ছিলো না। তাদের স্বভাবে আরামপ্রিয়-তার অনুপ্রবেশ ঘটেছিলো। ইসলামী সহমর্মিতা ও ধর্মীয় চেতনাবোধ গিয়ে-ছিলো নিস্তেজ ও দুর্বল হয়ে। বৃটিশ রাজশক্তি একের পর এক রাজ্য ও প্রদেশ গ্রাস করে চলেছিলো। অন্য দিকে মুসলমানেরা ছিলো দিবা স্বপ্নে বিভোর এবং আরাম-আয়েশে মত্ত। আর এরূপ দুঃখজনক ও কষ্টকর পরিস্থিতিদৃষ্টে তাদের ভেতর চাঞ্চল্য ও অস্থিরতার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছিলো না। এটা এত বেশী বেড়ে গিয়েছিলো যে, তারা অশ্বারোহণ, দুঃসাহস, শৌর্য-বীর্য ও যুদ্ধোপকরণকে অবজ্ঞার সাথে দেখতে শুরু করে

---

১. ওয়াকায়ে' আহমদী ;

এবং এগুলোকে জাহিল, গোঁয়ার ও নীচু শ্রেণীর লোকদের কাজ বলে মনে করতে শুরু করে। অধিকন্তু তাদের এরূপ 'আকীদা-বিশ্বাস বদ্ধমূল হচ্ছিলো যে, 'ইল্‌ম ও 'ইবাদত-বন্দেগী এবং মর্যাদা ও আভিজাত্যের সাথে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই।

অন্যদিকে হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর অন্তর রাজ্যে 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌র জোশ ও জয্‌বা তোলপাড় করেছিলো। এদেশকে জালিম-দের খপ্পর থেকে আযাদ করা, আল্লাহ্‌র কালিমাকে বুলন্দ ও সমুন্নত রাখা এবং ইসলামী শান-শওকতের পুনর্জাগরণের চিন্তা-ভাবনায় তাঁর সমগ্র সত্তা ও অনুভূতি ছেয়ে গিয়েছিলো। তাঁর সমগ্র ধ্যান-ধারণা এই একটি চিন্তা-ভাবনাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত ও বিবর্তিত হচ্ছিলো।

হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর বাল্যকাল থেকেই খেলাধূলার প্রতি ছিলো প্রবল আগ্রহ, বিশেষ করে বীরোচিত ও সৈনিকসুলভ খেলাধূলার প্রতি। কাবাডি অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎসাহের সাথেই খেলতেন এবং অধিকাংশ সময় বালকদের দু'দলে বিভক্ত করে দিতেন। একদল অন্য দলের কেল্লার উপর হামলা করতো ও জয় করে নিতো। এরূপ অজ্ঞাতসারেই তাঁর শারীরিক ও সামরিক ট্রেনিং অব্যাহত ছিলো। ১২২৭ হিজরীতে তিনি টুংক রাজ্যের নওয়াব আমীর খানের সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেন এবং তাদের সাথে কয়েকটি যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিলো, এভাবেই এদেশের বুকে শর'য়ী হুকূমত কায়েম করার মওকা মিলবে এবং ছিনতাই-কারী ও জালিমদের হাত থেকে আযাদী হাসিলের রাস্তা সহজতর ও সুগম হবে। অতঃপর যখন তিনি (নওয়াব আমীর খান) ইংরেজের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করে ছোট্ট একটি রাজ্য নিয়েই পরিতুষ্ট হন তখন তিনি তার সাহচর্য পরিত্যাগ করেন।

তাঁর এ আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য সাথীদের মাঝেও সংক্রামিত হয় এবং এ ছোট্ট গ্রামটি যা প্রথমে শুধু 'ইবাদত-বন্দেগী এবং যিক্‌র ও তসবীহ পাঠের কেন্দ্র ছিলো—দেখতে দেখতে একটি সামরিক ছাউনিতে রূপান্তরিত হয়। সেখানে লক্ষ্যভেদ, অশ্বারোহণ এবং যুদ্ধ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় এবং তার বাস্তব ও কার্যকর অনুশীলন ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হ'তো না। বড় বড় 'উলামায়ে কিরাম ও মাশায়েখ, শরীফ খান্দা-নের আদরের দুলাল, আমীর-ওমরা ও ধনাঢ্য শ্রেণী, ফকীর-গরীব এবং

বুড়ো জোয়ান নির্বিশেষে সম্মিলিতভাবে তাতে অংশ নিতো। নতুন কথা, এরূপ নতুনতর জীবন-যাপন পদ্ধতি কতক 'উলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখ, 'ইবাদত-গোযার, রিয়াযত ও মুজাহাদাকারী, যারা বহু দূর-দরাজ থেকে হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি শুনে এসেছিলেন তাদের নিকট অত্যন্ত বিস্বাদ লাগে। তাঁরা অনুভব করেন যে, তাঁদের অতীত দিনগুলো কতই না ভালো ছিলো। তখন তারা তাদের 'ইবাদতের স্বাদ ও মিষ্টতা অনুভব করতেন আর যিক্র ও তসবীহ ব্যতিরেকে এই শিলাময় পর্বতগাত্র ও প্রাচীর থেকে অন্য কোন আওয়াজই শোনা যেতো না তাঁরা সবাই মিলে হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর সাথে এব্যাপারে অনেক আলাপ-আলোচনাও করেন। কিন্তু তিনি তাঁদের রায় কবূল করেন নি। তাঁদের সেই সব হাদীছ স্মরণ করিয়ে দেন যা জিহাদ, পাহারাদারী এবং জিহাদের রাস্তায় কঠিন মেহনত ও দুঃখ-কষ্টের ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।[১]

লাখনৌয়ে একবার তিনি কান্দাহারীদের ছাউনীতে তশরীফ নিয়েছিলেন। তিনি নিজেও যেমন অস্ত্রসজ্জিত ছিলেন—তেমনিই ছিলো অন্যান্যরাও যারা তাঁর সঙ্গে ছিলেন। 'আবদুল বাকী খান সাহেব এ দৃশ্য দেখে বলেন যে, হযরত! আপনার সব কথাই তো ভালো, কিন্তু একটি কথা আমার অত্যন্ত অপসন্দনীয় এবং তা আপনার বংশীয় আভিজাত্য ও মর্যাদার খেলাফও বটে। আজ পর্যন্ত কেউ এ তরীকা ইখতিয়ার করেনি। আপনার পক্ষে এমন কাজ শোভনীয় যা আপনার পিতা, পিতামহ ও পূর্বপুরুষ করে গেছেন। সৈয়দ সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—"সেটা কি?" বললেন,—"এ ঢাল তলোয়ার বন্দুক ইত্যাদি সজ্জিত হওয়া সব কিছুই জিহালত ও মূর্খতার উপকরণ ; আপনার পক্ষে এটা মোটেই সমীচীন নয়।" একথা শুনতেই তাঁর চেহারা রাগে ও ক্রোধে লাল হয়ে যায় এবং তিনি বললেন, "খান সাহেব ! আপনার একথার কি জবাব দেব? যদি বুঝতে পারেন তবে এটুকুই যথেষ্ট হবে যে, এগুলি কল্যাণ ও বরকতের উপকরণ, যা আল্লাহ্ তা'আলা আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ)-কে দান করেছেন যেন তাঁরা কাফির ও মুশরিকদের সাথে

---

১. তিরমিযী শরীফে হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, দু'টো চোখকে দোযখের আগুন স্পর্শ করতে পারবে না—তন্মধ্যে একটি চোখ যা আল্লাহর ভয়ে অশ্রু-বিসর্জন করেছে, অপরটি যা আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দিতে গিয়ে জাগরিত রয়েছে। অন্য হাদীছে বলা হয়েছে,--আল্লাহ্র যে বান্দার দু'পায়ই আল্লাহর রাস্তায় ধূলি ধূসরিত হয়েছে--আগুন তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

জিহাদ করেন। বিশেষ করে আমাদের পয়গম্বর আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স·) এ সব আসবাব ও সমরোপকরণ দ্বারাই সমস্ত কাফির ও দুষ্ট শক্তিকে দমন করে দুনিয়া জাহানের বুকে 'দীন-ই হক' তথা সত্য-সুন্দর ও কল্যাণবাহী ধর্ম ও জীবন দর্শনের আলোকোজ্জ্বল আভা দান করেছিলেন। যদি এ আসবাব ও সামান না হ'তো তবে তুমি হতে না—আর হলেও আল্লাহ্ জানেন কোন্ দীন ও মিল্লাতের অন্তর্ভূক্ত হতে।"

তাঁর সব কিছু অপেক্ষা জিহাদের খেয়ালই বেশী থাকতো এ সময়। যাকেই তিনি মযবুত ও সুঠাম দেহের অধিকারী দেখতেন, বলতেন,—"এ কাজের উপযুক্ত বটে।" মুরাঈ (আনাউ জেলা)-এর শমশীর খান, ইলাহ বখশ, শেখ রমযান এবং মেহেরবান খান এ সময়ে একদিন সৈয়দ সাহেবের মুলাকাত লাভের উদ্দেশ্যে আসে। চারজনই ছিলো লম্বা ও দীর্ঘদেহী যুবক। তিনি তাদের দেখে অত্যন্ত খুশী হন এবং বলেন, "এরকম যুবকই আমাদের কাজের জন্য সর্বাংশে উপযুক্ত। পীরযাদার মত ননীর পুতুল আমাদের কোন কাজের নয়।" এদের আরও অনেক প্রশংসা করেন তিনি। তারাও তাঁর আমল-আখলাক দেখে অত্যন্ত প্রীত হয় যে, আমরা গরীব মানুষ, সামান্য টাকার বেতনভোগী সৈনিক মাত্র, আর তিনি কিনা আমাদের এত প্রশংসা করছেন। পরে তিনি তাদের বলেছিলেন যে, "আল্লাহ্ তা'আলা জিহাদের মধ্যে তোমাদের থেকে অনেক কাজ নেবেন। এরপর মেহের-বান খানকে লক্ষ্য করে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে দিয়ে অন্য কাজো নেবেন, আর এ তিনজন থেকে অন্য কাজ গ্রহণ করবেন এবং এ দু'টৈ কাজই হবে আল্লাহ্র মর্জি মাফিক।"[১]

অপূর্ব সওগাত

লোকজনের মধ্যে যখন হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর জিহাদের সুদৃঢ় অভিপ্রায়ের কথা প্রচারিত হয় এবং একথাও চারদিকে মশহুর হয়ে যায় যে, তিনি যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করছেন তখন অলৌকিকভাবে প্রত্যেকেই এই অভিপ্রায় পোষণ করতে থাকে যে, সে এমন হাদিয়া পেশ

১. ওয়াকায়ে' আহমদী, ৪৪০-৪১ পৃষ্ঠা ; অতপর মেহেরবান খান সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর ভক্ত ও অনুরক্তদের খেদমতের উদ্দেশ্যে সিন্ধুতেই থেকে যান। এরপর সেখান থেকে টুংক গমন করেন এবং বাকী তিনজন আকুড়ার প্রথম আক্রমণেই শহীদ হন।

করবে যা তাঁকে খুশী করবে। এ সময় তাঁর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তমও সেই ছিলো যে এ বিষয়ে তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করতো এবং সবচেয়ে প্রিয়তম হাদিয়া তাই ছিলো যা যুদ্ধের কাজে লাগে। যেমন, কোন উত্তম তলোয়ার, নতুন ধরনের বন্দুক অথবা উৎকৃষ্টতর পিস্তল কিংবা উন্নত জাতের ঘোড়া।

এ ব্যাপারে শেখ গোলাম আলী এলাহাবাদীর ভূমিকা ছিলো সবচেয়ে অগ্রণী। তিনি বিভিন্ন প্রকারের হাতিয়ার, তাঁবু ও কাপড়, নগদ অর্থকড়ি, সেলাইযুক্ত ও সেলাইবিহীন কাপড়, কুরআন মজীদের কপি, কিতাবাদি, লোটাপাত্র ও পশু হযরত আহমদ বেরেলভী (র)-এর খেদমতে পেশ করতেন। মওলবী সৈয়দ জা'ফর আলীর পিতা সৈয়দ কুতুব আলী বলেন যে, শেখ সাহেব যতবার হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর খেদমতে এসেছেন—কোন না কোন তলোয়ার, ছোরা অথবা অন্য কোন অস্ত্র-শস্ত্র অবশ্যই আনতেন। তিনি আটটি অত্যন্ত উন্নত ধরনের রাইফেল ও অন্যবিধ হাতিয়ার পেশ করেন। সৈয়দ সাহেবের খেদমতে তাঁবু নির্মিত একটি মসজিদ বানিয়ে বিছানাসহ হাযির করেছিলেন। নিঃসন্দেহে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) নিজের ধন-দৌলত দিয়ে হযরত রসূলে করীম (স)-এর বিশ্বস্ততা ও বন্ধুত্বের হক যেমনিভাবে আদায় করেছিলেন—ঠিক তেমনি শেখ গোলাম আলী এলাহাবাদীও নিজের ধনদৌলত সৈয়দ সাহেবের পদতলে এনে ঢেলে দিয়েছেন এবং 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'র জন্য অন্তর খুলে অকৃপণভাবে লুটিয়ে দিয়েছেন।[১]

মওলবী মুহাম্মদ জা'ফর সাহেব থানেশ্বরী লিখেছেন ঃ

"তখনকার দিনে শেখ ফরযন্দ আলী সাহেব গাযীপুর যামনিয়া থেকে দু'টো অত্যন্ত উত্তম জাতের ঘোড়া, বহুবিধ ফৌজী ইউনিফর্ম এবং চল্লিশ জিল্দ কুরআন মজীদ তোহফাস্বরূপ নিয়ে উপস্থিত হন। সবচেয়ে অত্যাশ্চর্য তোহ্ফা যা শেখ সাহেব এনেছিলেন তা তাঁর আমজাদ নামক যুবক পুত্র। তাকে তিনি হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ (আ)-এর মতো আল্লাহ্র রাহে উৎসর্গ করত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর হাওয়ালা করে দেন। আরয করেন যে,—একে আপনি আপনার সাথে জিহাদে নিয়ে যাবেন এবং কাফিরদের তলোয়ার দ্বারা কুরবান হবার সুযোগ দেবেন। অতএব তাই

১. মনজুরু'স-সাদাহ্।

হয়েছিলো। উপযুক্ত পুত্র পিতার মানত পুরো করে এবং শাহাদাত লাভে তাকে ধন্য করেন।”

সৈয়দ আহমদ বেরলভী (র)-এর জিহাদ ঘোষণায় সাধারণ মানুষের মনে অভূতপূর্ব ঈমানী জোশ্-জযবার ও আবেগ-উৎসাহের সৃষ্টি হয়। রব্বানী আহবান,

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا ط وَّجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ٥

“অভিযানে বাহির হইয়া পড় লঘু রণ-সম্ভারে হউক অথবা গুরু রণসম্ভারে এবং সংগ্রাম কর আল্লাহর পথে তোমাদিগের সম্পদ ও জীবন দ্বারা”-এর প্রভাব তাদের উপর এমনি হয়েছিলো যে, বাপ তার বেটাকে, ভাই ভাইকে অগ্রগামী হবার প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হয় এবং পরিণতিতে লটারী দ্বারা ভাগ্য নির্ধারণের পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

মওলানা জা'ফর আলী তাঁর “মনজুরাতু'স-সা'দাহ” নামক গ্রন্থে বলেন, “যখন সৈয়দ সাহেবের হিজরতের সফর এবং জিহাদের অভিপ্রায় সম্পর্কে আমরা অবগত হই তখন আমাদের পিতা সৈয়দ কুতুব আলী এবং ভাই সৈয়দ হাসান আলী অভিলাষী হন যে, তারাও মুজাহিদদের কাফেলায় গিয়ে মিলিত হবেন। আমারও এ ধরনের কিছু ইচ্ছা ছিলো। আমাদের প্রত্যেকেরই ইচ্ছা ছিলো এ দুর্লভ সৌভাগ্য তার নিজের ভাগ্যেই ঘটুক। এ নিয়ে জেদাজেদীর পরিণতি শেষ অবধি মায়ের কাছে গিয়ে গড়ায় এবং লটারীতে আমার নাম ওঠে। অতএব আমি সীমান্তে গিয়ে সৈয়দ সাহেবের সঙ্গে মিলিত হই। তিনি অভ্যর্থনা জানাতে বাইরে অনেকদূর এগিয়ে এসে-ছিলেন। খুশী ও আনন্দের আতিশয্যে বন্দুকের ফায়ার করা হয়। তিনি আমাকে তাঁর সেক্রেটারী নিযুক্ত করেন এবং মওলানা মুহাম্মদ ইসমা'ঈল (র)-এর অধীনস্থ সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত করেন।”

---

১. সওয়ানেহ্ আহ্মদী, ৮৯ পৃষ্ঠা।

খুশিতে থাকো দেশবাসী ! আমরাতো সফর করছি

হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর এক বছর দশ মাস তিনি বাড়ীতে কাটান। এই পুরো সময়টা তিনি হিজরত ও জিহাদের প্রস্তুতিতেই কাটিয়ে দেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও তেজস্বিনী ভাষায় চিঠি-পত্রাদি বিভিন্ন লোকজনের নামে পাঠান। এ সবের মধ্যে ইসলামী তেজস্বিতা ও সম্ভ্রমবোধ জাগানো, আরাম-আয়েশ থেকে বিদায় ও মুক্তি এবং পরিবার-পরিজন ও দেশবাসীকে বিদায় জানাবার দাওয়াত থাকতো। এ জন্যে তিনি বহু মুবাল্লিগ (প্রচারক দল) এবং ওয়ায়েজীন বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করেন। তাঁরা মুসলমানদের মধ্যে জিহাদের প্রাণসঞ্চার করেন এবং শাহাদাত লাভের আগ্রহ সৃষ্টি করেন। আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ ও শাহাদত সম্পর্কিত যে সব হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, এর উপর আল্লাহ্র তরফ থেকে যে পুরস্কার ও সাদর অভ্যর্থনার ওয়াদা রয়েছে এবং এসব পরিত্যাগ করলে যিল্লত, দূরবস্থা ও দুর্ভাগ্যের যে সতর্কবাণী রয়েছে সে সবই তিনি তাদের সামনে তুলে ধরেন। এটা প্রমাণ করেন যে, ইসলামী হুকুমতের পরিসমাপ্তি, ধর্মীয় প্রথা-পদ্ধতি ও আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ভাটা ও চরম অবনতি এবং সমাজ ও জীবন-যিন্দেগীর বিপর্যয়ের মধ্যেও এই ফরযটিকে পরিত্যাগের অনেকখানি ভূমিকা রয়েছে। এর বরকতহীনতায় অমুসলিম পর্যন্ত বরং জীবকুল, জন্তু-জানোয়ার এবং ক্ষেত-খামার কিছুই নিরাপদ নয়। আর এ সব কিছুই মুসলমানদের আল্লাহ্ নির্দেশিত ফরয কার্যাদির প্রতি চরম ঔদাসিন্য, বিলাস জীবন যাপন এবং আত্মসর্বস্বতা, সুযোগ-সন্ধানী মনোবৃত্তি ও মানসিকতারই পরিণতি।[১]

এটা ছিলো সেই যুগ যখন পাঞ্জাবের মুসলমানদের অবস্থা খারাপ থেকেও খারাপতর ছিলো। তারা সেখানে অত্যন্ত অবমাননাকর জীবন যাপন করছিলো। শাসক মহলের জুলুম ও যবরদস্তি, ইসলামের প্রতি চরম দুশমনী, সামরিক বাহিনীর পাশবিকতা, হত্যা ও ধ্বংস, লুটতরাজ,

---

১. বিস্তারিত জানতে হলে 'সিরাতে মুস্তাকীম' চতুর্থ অধ্যায় এবং সৈয়দ সাহেবের চিঠিপত্রের জন্য 'সীরাত সৈয়দ আহমদ শহীদ' (চতুর্থ সংস্করণ) দ্রষ্টব্য।

মহিলাদের শ্লীলতাহানি ও অপহরণ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ছিলো।[১] অবাধে মসজিদের অসম্মান করা হতো—আর মুসলমানরা নীরবে ও অসহায়-ভাবে সে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতো। তাদের মুখে প্রতিধ্বনিত হতো ঃ

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ج وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ج وَّاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ٥

"তোমাদের কি হইল যে, তোমরা সংগ্রাম করিবে না আল্লাহের পথে এবং অসহায় নর-নারী এবং শিশুগণের জন্য? যাহারা বলেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! এই জনপদ যাহার অধিবাসী জালিম উহা হইতে আমাদিগকে অন্যত্র লইয়া যাও ; তোমার নিকট হইতে কাহাকেও আমাদের অভিভাবক কর এবং তোমার নিকট হইতে কাহাকেও আমাদের সহায় কর।" সূরা নিসা ৭৫ আয়াত ;

হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) এটাই সমীচীন মনে করেন যে, নিজের কর্মকাণ্ডের উদ্বোধন এই নির্যাতিত ও অত্যাচারিত ভূখণ্ড থেকেই শুরু করবেন। সেখানে একটি বল্গাহীন ফৌজী হুকুমতের কারণে মুসল-মানেরা কঠিন মুসীবতের শিকার হয়ে আছে। এরপর গোটা ভারতবর্ষের

---

১. এ অবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা কর্ণেল ম্যালকম লয়্যাল গ্রিফিন এবং কানাইলালের মতো ঐতিহাসিকদের গ্রন্থে পাওয়া যাবে।

ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল মরহুম ভারতীয় ইতিহাসের এই আশ্চর্য ও লোমহর্ষক যুগের চিত্র স্বরচিত কবিতায় এরূপভাবে এঁকেছেন ঃ

خالصه شمشیر و قرآن را ببرد - اندران کشور مسلمانی بمرد

"শিখরা তরবারী ও কুরআন উঠিয়ে দিয়েছে,
সারা দেশে মুসলমান মৃত্যুবরণ করেছে।"

দিকে মনোনিবেশ করবেন যাকে ইংরেজ গভর্নমেন্ট একটি দুগ্ধ প্রদানকারী গাভী মনে করে রেখেছে। এর জন্য প্রথমেই এটা প্রয়োজন ছিলো যে, তাদের প্রভাবাধীন এলাকা ও সাম্রাজ্যের কেন্দ্র থেকে বাইরে গিয়ে এমন একটি স্বাধীন এলাকা থেকে স্বীয় কর্ম-প্রয়াসের উদ্বোধন ঘটাবেন যা তেজস্বিতা, দৃঢ়তা, বাহাদুরী ও ঘোড়সওয়ারীতে প্রসিদ্ধ এবং যার অধিবাসীবৃন্দ যুদ্ধ-বিদ্যায় জন্মগতভাবেই নিপুণ ও অভিজ্ঞ এবং এ পথের চড়াই-উৎরাই সম্পর্কে বিশদভাবে ওয়াকিফহাল।

এমনি ধরনের একটি এলাকা ছিলো আফগানিস্তান ও পাঞ্জাবের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত। সেখানকার উপজাতীয় গোত্রগুলি শক্তি-সামর্থ্যে এবং স্বাধীনতাপ্রিয়তার ব্যাপারে মশহুর ও বিখ্যাত ছিলো। কোন বৈদেশিক শত্রু ও বিজেতার সামনে তারা কখনোই মাথা নত করেনি এবং যুদ্ধের আবহাওয়া ও পরিবেশেই তারা লালিত-পালিত ও বর্ধিত হয়েছিলো। সৈয়দ সাহেবের বন্ধু-বান্ধব ও সঙ্গী-সাথীদের একটা বিরাট সংখ্যা ছিলো আফগান (পাঠান) বংশধর এবং যাদের পিতা-পিতামহ বিভিন্ন যুদ্ধে, জীবিকানুসন্ধানে অথবা ভাগ্যের চাকা ঘোরাবার আবেগ-উৎসাহে ভারতবর্ষে এসে বসতি স্থাপন করেছিলো। এদের মধ্যে বহু রণকুশলী ও রণনিপুণ সেনাপতি-সেনানায়ক (যাদের মধ্যে কতজনের বর্ণনা পূর্বেই করা হয়েছে) ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় নিযুক্ত ছিলেন এবং লাখনৌ ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার সৈন্যবাহিনীতে মেরুদণ্ডের ভূমিকা পালন করতেন। এই সব আফ-গানের মধ্যে হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর কতিপয় সর্বোত্তম সাথী, আধ্যাত্মিক দীক্ষানবীশ এবং সাহায্যকারী ও সহযোগী বর্তমান ছিলো। তারা তাঁকে সে এলাকার (সীমান্তের) দিকে হিজরতের জন্য অনুপ্রাণিত করতে থাকে। কারণ সেখানে তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের আবাসভূমি ছিলো। হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) এ প্রস্তাব পসন্দ করেন এবং সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তিনি নিজের সকল কর্মপ্রয়াস ও কর্মকাণ্ডের হেড কোয়ার্টার হিসেবে ঐ এলাকাকেই নির্বাচিত করবেন এবং যুদ্ধ-জিহাদের এর মত পবিত্র ও শুভ কর্মের উদ্বোধন করবেন সেখান থেকেই।

১২৪১ হিজরীর ৭ই জমাদিউ'ছ-ছানীর (১৮২৬ খৃস্টাব্দের ১৭ই জানু-য়ারী) সোমবার ছিল তাঁর হিজরতের দিন। সী-নদীর দক্ষিণে অপর পাড়ে

তাঁর তাঁবু পাতা ছিলো। সোমবার পুরো দিনটাই ভাই-বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনকে বিদায় করতে অতিক্রান্ত হয়ে যায়; রাতের বেলায় তিনি নৌকায় আরোহণ করেন। অনেক লোকই গন্তব্যস্থানে সৈয়দ সাহেবকে পৌঁছাবার জন্য সাথে যান। কেউ ছিলো নৌকায় আর কেউ পানিতে। হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) নদীর কিনারায় গিয়ে দু'রাকাত শোকরানা সালাত আদায় করেন এবং অত্যন্ত বিনয়, নম্র ও অশ্রুসজল চোখে আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করেন। এই শোকরানা সালাত আদায় কোন সাম্রাজ্য জয়ের জন্য ছিলো না, ছিলো না এমন কোন স্থান পরিত্যাগের কারণে, যা আরাম-আয়েশ ও মান-মর্যাদার সঙ্গে মাথা উঁচু করে বাঁচার উপায়-উপকরণ বর্জিত। আর এর প্রতি কোনরূপ মমতা আকর্ষণ ছিলো না—এমনও নয়; বরং এটা ছিলো এমন একটি স্থান যেখানে তাঁর খান্দান দেড় শতাব্দী যাবত বসবাস করে আসছিলো, যার প্রতি ইঞ্চি ভূমির প্রতি তাঁর স্নেহ-মমতা ও আকর্ষণ ছিলো সীমাহীন। যেখানে ব্যক্তিগত সুখ-শান্তি ও মান-মর্যাদার সে সমস্ত উপায়-উপকরণই বিদ্যমান ছিলো—যা যে-কোন মহান ও বিরাট ব্যক্তিত্বের পক্ষে ছিলো সহজলভ্য। কিন্তু যে মিশনকে তিনি জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যরূপে নির্ধারণ করেছিলেন--তা অর্জন ও সম্পন্ন করার মতো কোন মাধ্যম এখানে ছিলো না। এজন্যই তিনি তাকে চিরদিনের তরে বিদায় আরয জানাতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং যখন এই প্রিয়তম ভূখণ্ড থেকে যার উপর কাটিয়েছেন তিনি জীবনের চল্লিশটি বসন্ত--গমনোদ্যত তখনই তিনি মাহবুবে হাকীকীর দরবারে এরূপ আবেগ ও তুষ্টির সাথে শুকরিয়া স্বরূপ সিজদাহ আদায় করেন—তেমন আবেগ ও সন্তুষ্টির সাথে খুব কম লোকই তখনও দেশে ফেরার ও সাম্রাজ্য জয়ের পর মুহূর্তে সিজদা-ই শুকরিয়া আদায় করেছে।

সমস্ত রাত আত্মীয় নারী-পুরুষের আনাগোনা তাঁবু পর্যন্ত চলতে থাকে। সবার অন্তরেই তাঁর হিজরত ও বিচ্ছেদের প্রতিক্রিয়া চলছিলো। এদের মধ্যে হাতে গোণা কতিপয় আত্মীয়-স্বজন ব্যতিরেকে—যাঁরা হিজরতের এ সফরে এবং জিহাদী কর্মকাণ্ডে তাঁর সঙ্গে শরীক ছিলেন—তাঁরা ব্যতীত এই বিচ্ছেদের পর আর কোন আত্মীয়ের সঙ্গে সৈয়দ সাহেবের মুলাকাত হয়নি। স্বয়ং তাঁর দু'জন স্ত্রী, এক কন্যা সারাহ্, প্রিয় দুই ভাতিজা সৈয়দ ইসমা'ঈল ও সৈয়দ ইয়াকূব—এদের সঙ্গেও সাক্ষাত জোটেনি। ঐ মুহূর্তে বিদায়ী ও বিদায় দিতে আগতদের মধ্যে অবশ্যই এই অনুভূতি থাকবে যে, এখন মুলাকাতের সুযোগ এছাড়া আর কিছুই নেই যে, আল্লাহ্ পাক তাঁদের

বিজয়ী ও কামিয়াব করে ফিরিয়ে আনুন এবং গোটা ভারতবর্ষ দারু'ল-ইসলামে পরিণত হোক অথবা দেশবাসী আল্লাহ্‌র পথে হিজরতকারী এই মুহাজিরের নিকটেই পৌঁছে যাবেন। আর এই দু'টো সুযোগই এমন ছিলো যা বাহ্যত খুব সহজ মনে হচ্ছিলো না।

শেষ অবধি রওয়ানা হবার মুহূর্ত ঘনিয়ে এলো। সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) নিজ গ্রাম (দায়রায়ে শাহ্‌ 'আলামুল্লাহ্‌)-এর প্রতি বিদায়ী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। এটা ছিলো সেই জায়গা, যেখানে কেটেছিলো তাঁর শৈশবকাল, যার কোলে তিনি প্রতিপালিত হয়েছিলেন, যার প্রতি ইঞ্চি ভূমি ছিলো তাঁর অত্যন্ত প্রিয়;—যার বুকের উপর দিয়ে প্রবাহিত নদীস্রোতে অবগাহন করেছেন ও সাঁতার কেটেছেন তিনি বহুবার, যার মসজিদের প্রতি কোণ তাঁর রু'কূ সিজদা দ্বারা ছিলো আবাদ ও ভরপুর, যেখানে তাঁর স্মৃতি-ময় ও বিরাট গৌরবোজ্জ্বল দিন এবং বহু আনন্দঘন মুহূর্ত কেটেছিলো। তিনি এখান থেকে রাগ করে চলে যাচ্ছেন না। আজকের দিনেও তাঁর অন্তর মন স্বাভাবিকভাবেই এর প্রতি প্রীতি ও মহব্বতে ভরপুর এবং এখান-কার অধিবাসী ও বসবাসকারীদের প্রতি আবেগোচ্ছল কৃতজ্ঞতায় নেশাগ্রস্ত। কিন্তু তিনি নিজের মর্জিকে আল্লাহ্‌র মর্জি ও স্বীয় প্রবৃত্তির দাবীকে ইসলামের দাবীর অনুগামী বানিয়েছিলেন এবং অন্তরের তৃপ্তি ও আত্মার শান্তিকে দৈহিক শান্তির উপর অগ্রাধিকার ও অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। প্রকৃত পক্ষে এটা ছিলো ঈমানের মিষ্টতা, দায়িত্বানুভূতি, প্রবল আকর্ষণ এবং আবেগ ও আগ্রহের রাসায়নিক প্রক্রিয়া বা জ্ঞান যা তাঁকে রায়বেরেলীর মতো একটি অখ্যাত ও অজ্ঞাত জায়গা থেকে বাল্যকোটের শাহাদাতগাহ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলো। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন ঃ

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ

وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا

وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ -
وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ ٥

"বল, তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ তাঁর রসূল এবং আল্লাহের পথে সংগ্রাম করা অপেক্ষা প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের পত্নী, তোমাদের স্বগোষ্ঠি, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালবাস ; তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্‌র বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।" সূরা তওবাহ্, ২৪ আয়াত ;

গোয়ালিয়র মহারাজার প্রাসাদে তওহীদের প্রথম আহ্বান ধ্বনি

হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) তাঁর কাফেলাসহ গোয়ালিয়র রাজ্য দিয়েও অতিক্রম করেন। হায়দরাবাদের পর এটাই ছিলো সবচেয়ে বড় রাজ্য। এর মহারাজা দৌলতরাও সিন্ধিয়া ছিলেন মারাঠাদের অত্যন্ত বড় নেতা এবং ইংরেজ প্রভাবাধীন সর্বাপেক্ষা বড় অমুসলিম রাজ্যপাল। দীর্ঘকাল থেকেই মুসলমানদের সাথে মারাঠাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ চলেছিলো। সৈয়দ সাহেব মহারাজা ও তার উযীর হিন্দু রাওয়ের সঙ্গে ইতিপূর্ব চিঠি-পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করেছিলেন। এদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করতে চেষ্টা করেছিলেন যেন তারা ইংরেজদের থেকে প্রকৃত বিপদাশংকা অনুভব করেন এবং আরও উপলব্ধি করতে পারেন যে, যতদিন যাবত এই দেশের বুকে ইংরেজদের অস্তিত্ব বর্তমান থাকবে ততদিন কোন রাজ্যের স্থায়িত্ব ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান হবে অর্থহীন। তারা সৈয়দ সাহেবের পত্রাবলীর যে সব উত্তর প্রদান করেন তা ছিলো সহানুভূতিসূচক এবং এতে বুঝা যাচ্ছিলো যে, তারা এ সমস্যার গুরুত্ব অনুভব করছেন।

যখন তিনি গোয়ালিয়র পেঁছান তখন উযীরে আজম হিন্দুরাও সৈয়দ সাহেবকে শাহী অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। পরদিন হিন্দুরাও সৈয়দ সাহেবের খিদমতে হাযির হয়ে আরয করেন যে, মহারাজা দৌলতরাও সালাম পেশ করেছেন এবং বলে পাঠিয়েছেন তিনি অসুস্থ বিধায় উপস্থিত হতে অক্ষম।

অতএব সৈয়দ সাহেব যদি মেহেরবানী করে তাঁর প্রাসাদে তশরীফ রাখেন, তবে মহারাজা বড়ই বাধিত হবেন। সৈয়দ সাহেব বলেন,—উত্তম, আমিই মুলাকাতের জন্য আসবো। মহারাজার তকলীফ স্বীকার করার কোনই প্রয়োজন নেই। এর পরের দিন অথবা এর একদিন কি দু'দিন পর বাদ জোহর তিনি দৌলত-রাওয়ের মহলে তশরীফ নেন। রাজ-সভাসদবর্গ অভ্যর্থনা জানাতে বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং সঙ্গে করে মহলের অভ্যন্তরে নিয়ে যান। বিরাট বিস্তৃত ফরাশ বিছানো হয়েছিলো। হিন্দুরাও হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর সকল সঙ্গী-সাথীদের তাঁতে বসতে বলেন এবং সৈয়দ সাহেবকে হাত ধরে দৌলতরাওয়ের কামরায় নিয়ে যান। দৌলতরাও অত্যন্ত তা'জীমের সাথে তাঁকে গ্রহণ করেন। রাণী ছিলেন পর্দার পেছনে উপবিষ্টা। উভয় দিক থেকেই সালাম ও কুশল বিনিময়ের পর যথারীতি কথাবার্তা শুরু হয়।

মাহরাজা: "আমি শুনেছি যে, আপনার তাওয়াজ্জুহের মধ্যে অত্যন্ত প্রভাব ও শক্তি নিহিত। আশা করছি যে, আমাকেও আপনার ফয়েয দ্বারা সরফরায করা হবে।"

সৈয়দ সাহেব: "আপনার এতে আবশ্যকতা কি? বাতেনী তাওয়াজ্জুহ তো আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করার জন্য হয়ে থাকে আর কুফর এর পরিপন্থী; শক্তিশালী খাদ্য সুস্থ-সবল মানুষের জন্য শক্তি যুগিয়ে থাকে, অসুস্থ ব্যক্তির জন্য নয়।"

মহারাজা: "অন্যান্য বুযুর্গানে দীন আমাকে তাওয়াজ্জুহ্ দিয়েছেন, অথচ আপনি ঈমান আনাকে পূর্ব শর্ত হিসেবে আরোপ করছেন। আশ্চর্য কি যে, মহান স্রষ্টা আপনার তাওয়াজ্জুহ দ্বারাই আমাকে ঈমানের মূল্যবান নেয়ামত লাভের তওফীক প্রদান করবেন।"

সৈয়দ সাহেব: "যেহেতু আপনি ঈমানকে সর্বাপেক্ষা দামী বস্তু বলে মনে করছেন—সেহেতু আমি তাওয়াজ্জুহ প্রদান করছি।"

অতঃপর তিনি মহারাজাকে সামনে বসিয়ে তাওয়াজ্জুহ প্রদান করেন। এই অবস্থায় কিছুক্ষণ অতিবাহিত হয়েছে—ঠিক এমনি সময় মুসলিম সৈন্যবাহিনীর মুয়াযযিন শেখ বাকের আলী দরজার উপর দাঁড়িয়ে উচ্চ স্বরে 'আসরের আযান দেন। মহলের ভেতর থেকে বাহির পর্যন্ত একটা হৈ চৈ পড়ে যায়। মহিলারা তামাশা দেখবার জন্য প্রাসাদের ছাদের উপরে গিয়ে

সমবেত হয়। সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ কাজ-কাম ছেড়ে দিয়ে তামাশায় মগ্ন হয়। দু'জন ফরাসী সেখানে অবস্থান করছিলো। তারাও এতে আশ্চর্য হয়ে যায় যে,—আজ পর্যন্ত কোন পীর-ফকীর যেখানে এমন উচ্চ আওয়াজ উঠাতে সাহসী হয়নি, এমন কি মহারাজার পীর সাহেবকে আজ পর্যন্ত এখানে কেউ সালাত আদায় করতে দেখেনি,—অথচ প্রতিনিয়তই যার এখানে আগমন ঘটে থাকে। হিন্দুরাও তক্ষুনি দ্বাররক্ষীকে নির্দেশ দেন, বেহেশতী হাযির হয় এবং মুহূর্তের ভেতরেই সমাগত মেহমানবৃন্দ ওযূ সমাপন করে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ায়। লোকজন সবাই যার যার হাতের জায়নামায বিছিয়ে নেয়। সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) অগ্রসর হয়ে মুসাল্লার উপর গিয়ে দাঁড়ান এবং মুকাব্বির আরবী উচ্চারণ ভঙ্গিতে তকবীর দেয়। তিনি তকবীর দিলে সালাত শুরু হয়। মজলিসের সমাগত সকলের দৃষ্টিই ছিলো সৈয়দ সাহেবের চেহারার প্রতি নিবদ্ধ। মুসাফির হিসেবে তিনি দু'রাকা'ত সালাত আদায় করেন এবং যথারীতি সালাম ফেরান।

পরদিন রাত্রিবেলা হিন্দুরাও দাওয়াত করেন। সৈয়দ সাহেব মহারাজার বাড়ী তশরীফ রাখেন। হিন্দুরাও আগু বাড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান এবং ফরাশের উপর এনে বসান। ইতিমধ্যে শাহী অশ্ব শকটের আগমন শুরু হয়ে যায়। হিন্দুরাও প্রত্যেকেরই যথাযোগ্য তা'জীমের জন্য উঠতেন। সৈয়দ সাহেবও তার সাথে তা'জীম জানাতে শরীক হচ্ছিলেন। এতে হিন্দুরাও আপত্তি জানিয়ে আরয পেশ করেন যে, আপনি তশরীফ রাখুন। আপনার তকলীফ করার কোন দরকার নেই। অবশ্য আমার জন্য প্রত্যেককেই আলাদা ও স্বতন্ত্রভাবে তা'জীম করা জরুরী। আর এটাই আমাদের রাজ্যের রীতি ও নিয়ম। এরপর সৈয়দ সাহেব উপবেশন করেন। বহু সভাসদ এসে হাযির হন। হিন্দুরাও হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) সহ তাঁর সঙ্গীদের পনের জন এবং পনের জন সভাসদসহ নিজের সঙ্গে নিয়ে ঘরের মধ্যে ফরাশের উপর বসান ও নিজেই সম্মানিত মেহমানদের হাত ধোয়াতে থাকেন। সৈয়দ সাহেব এ থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলে হিন্দুরাও জবাব দেন যে, আগত মেহমানদের হাত ধুয়ে দেবার ও খাবার নিজ হাতে পরিবেশন করার মধ্যেই আমার সৌভাগ্য নিহিত বলে আমি মনে করি। সৈয়দ সাহেব বলেন যে, আমাদের কাছে এটা মোটেই শোভন মনে হচ্ছে না; আপনি তশরীফ রাখুন। তিনি অতঃপর হিন্দুরাও-য়ের সঙ্গীদের লক্ষ্য করে বলেন যেন তাকেও একটি আসন পেতে দেয়া

হয়। হিন্দুরাও হুকুম তামিলার্থে বসে পড়েন এবং সরকারী কর্মচারীবৃন্দ সৈয়দ সাহেব ও অন্যান্য সমাগতদের হাত ধুয়ে দেয়। সকলের আগে যে খাবার এনে হাযির করা হয় তা ছিলো মারাঠী খাবার। তাতে পেষা লাল মরিচও বেশ ছিলো। কেউ এ খাবার সামান্য কিছুটা হয়ত মুখে দিয়েছে অমনি ব্যবস্থাপকবৃন্দ তা উঠিয়ে নিয়ে যায়। হিন্দুরাও জানান যে, এটাই তাদের আসল জাতীয় খাবার। এরপর ভারতবর্ষীয় আমীর-ওমরাদের খাবার শির্মল, তৈলে ভাজা ময়দার রুটি পরাটা, কয়েক প্রকারের পোলাও, মুতঞ্জন (টক-মিষ্টির এক প্রকার পোলাও), কয়েক প্রকার কালিয়া, ফিরনী, ইয়াকুতী ইত্যাদি আনা হয়। লোকজন সামান্য কিছু খেতে না খেতেই তাও উঠিয়ে নেওয়া হলো এবং অন্যবিধ খাবারের মধ্যে কয়েক প্রকার কাবাব, পসন্দে (এক প্রকার কাবাব), শিক কাবাব, ভূনা মোরগ ইত্যাদি পরিবেশন করা হয়। এভাবেই কয়েক বার খাবার পরিবর্তন করে আনা হলো। এমনকি শেষাবধি খানাও শেষ হ'লো এবং হাত ধোয়ানো হ'লো। এরপর পানের খিলি আনা হয়। তাতে স্বর্ণ-চূর্ণ মাখিয়ে আতর লাগিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর আসে কাপড় ভর্তি ট্রে। তাতে অধিকাংশই লাল রঙের গোল টুপি ও তোয়ালে ছিলো। তিনি এসব দেখে বললেন, "এসবের কি প্রয়োজন?" হিন্দুরাও বললেন,—"এর রঙ অত্যন্ত পাকা এবং শতবার ধোলাইয়ের পরও এর রংয়ের ভেতর কোন পার্থক্য সৃষ্টি হবে না। এগুলি সব বুরহানপুরে প্রস্তুত। শুনেছি যে, পাকা রং ইসলামী শরী'আতে জায়েয ও দুরস্ত আছে।" জোড়ার ভেতর এক জোড়া কম ছিলো। ফলে তাৎক্ষণিকভাবে সৈয়দ 'আবদুর রহমানের জন্য এক জোড়া আনিয়ে দেওয়া হয়।

হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর জোড়ার মধ্যে দামী মোতির এক জোড়া হার ছিলো, আর ছিলো জরী নির্মিত একটি চোগা। হিন্দুরাও নিজের হাতে সৈয়দ সাহেবকে তা পরিয়ে দিতে গেলে তিনি আপত্তি করেন। হিন্দুরাও আরয করেন যে, আমার একান্ত অভিলাষ যে, এটা আমি নিজের হাতে আপনাকে পরিয়ে দিই; নইলে আমি জানি, এটা আপনি কোনদিন ব্যবহার করবেন না। পরাতে গিয়ে মোতির ছড়া ছিড়ে যায় এবং হারের দানাগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। উপস্থিত সবাই খুঁজে খুঁজে দস্তরখানে রেখে দেয় এবং তা সৈয়দ সাহেবের অবস্থান স্থলে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

মুজাহিদ কাফেলার এই সফরে লাখনৌ এবং দিল্লীর বহু অভিজাত নন্দন, 'উলামায়ে কিরাম ও মাশায়েখ এবং বিলাস ও প্রাচুর্যের মধ্যে লালিত-পালিত অনেক যুবকও ছিলো। অত্যন্ত দুর্গম এ সফর নিজেই ছিলো একটি স্থায়ী ও অব্যাহত জিহাদ, নিরলস প্রয়াস ও চেষ্টা-সাধনার এক ধারাবাহিক কার্যক্রম। চলার পথে তাদের দীর্ঘ মরুভূমি ও বালিয়াড়ির মুখোমুখী হতে হয়—যেখানে দূরদরাজ পর্যন্ত পানি ও খাদ্যের কোন নাম-নিশানাও ছিলো না। তাদের এমন ভয়াবহ জঙ্গলও অতিক্রম করতে হয় যেখানে বড় বড় পথ প্রদর্শককেও রাস্তা ভুলতে হয়। কয়েক বার চোর ডাকাতের সম্মুখীনও কাফেলাকে হতে হয়। এমন গোত্র ও উপজাতিদের মাঝ দিয়েও পথ অতিক্রম করতে হয় যাদের ভাষা ও সামাজিক জীবন ছিলো সম্পূর্ণ অপরিচিতির বেড়াজালে আবদ্ধ। কোন কোন সময় তাদের এমন কুয়ার উপরও নির্ভর করতে হয় যার পানি অত্যন্ত গভীর তলদেশে,—একদম বিস্বাদ ও লবণাক্ত। পানি লাভের জন্য কখনো কখনো নিজেদের কুয়া খনন করার প্রয়োজন দেখা দিত। এভাবেই শত শত মাইল বালুকাময় প্রান্তর অতিক্রম করতে এমন এলাকাও পার হতে হয় যার মধ্যে ছিলো শক্ত রকমের উঁচু-নীচু এবং স্থানে স্থানে বালিয়াড়ি। এর ভেতর এক কদম অগ্রসর হওয়াও ছিলো দুঃসাধ্য আর এদের ভেতর কেউ যদি ক্লান্ত ও কাহিল হয়ে কাফেলা থেকে পিছু পড়ে যেত তবে হিংস্র জীবজন্তু অথবা ডাকাত দলের শিকারে পরিণত হওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক ছিলো না, বরং এর আশংকাই ছিলো পুরোপুরি। অধিকন্তু যে সমস্ত জনবসতির উপর দিয়ে কাফেলা পথ অতিক্রম করতো—সেখানকার লোকেরা এদের দেখে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তো। অধিকাংশ সময়েই তারা কূয়ার পানি খারাপ ও ব্যবহারের অযোগ্য বানিয়ে দিত। কতক স্থানে তাদের তো রীতিমত লড়াই করে মরতেও প্রস্তুত হতে হয়েছিলো এবং অতি কষ্টে তাদেরকে বুঝানো সম্ভব হয়েছিলো।

মোটের উপর এভাবেই কাফেলা মাড়াবার প্রদেশের বিখ্যাত মরুভূমি পাড়ি দেয়। এই প্রথম অভিযানেই এরা দু'শো আশি মাইল পথ অতিক্রম করে এবং শেষ অবধি সিন্ধু প্রদেশে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়। এখানকার অবস্থা ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্নতর। এখানকার মুসলমান আমীর-ওমরা ও সাধারণ গণ-মানুষ এদের অত্যন্ত উষ্ণ আবেগ ও উৎসাহের সাথে অভ্যর্থনা

জানায়। এ এলাকার জনগোষ্ঠী ধর্মীয় নেতৃত্বে আসীন স্থানীয় ‘উলামায়ে দীন ও মাশায়েখে কেরামের প্রতি অতীব সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং মেহমানদারীতে অত্যন্ত মশহুর ছিলো। সৈয়দ সাহেবের হাতে এ এলাকার অসংখ্য মানুষ বায়‘আত হয় এবং তওবা করে জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়। সৈয়দ সাহেবও ওয়াজ-নসীহত, তওহীদ ও সুন্নতের প্রতি দাওয়াত, ইসলামী সম্ভ্রমবোধ ও ঈমানী চেতনার আন্দোলন, ঝগড়া-বিবাদের অবসান ঘটানো, ভাঙা অন্তরকে জোড়া লাগানো, পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষাভাবাপন্ন লোকদের মাঝে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি স্থাপনে চেষ্টার কোন কসুর করেন নি। কিন্তু যখন মুজাহিদ বাহিনী বেলুচিস্তানে প্রবেশ করে তখনও তাদের ঠিক ঐ রকম কঠিন অবস্থারই সম্মুখীন হ’তে হয়। বর্ষার মৌসুম শুরু হয়ে গিয়েছিলো। এজন্য একদিকে মাঝে মাঝেই প্রবল পানির সয়লাবে বিপর্যয় ও অপরদিকে পানির অভাবে পুকুর খননের ঝামেলায় ব্যস্ত থাকতে হয়। রাস্তা ছিলো খুবই খারাপ আর এ সফরের অভিযানও ছিলো দুস্তর ও দুর্গম। মুজাহিদ বাহিনীকে এমন একটা পাহাড়ী এলাকা পার হ’তে হয় যেখানে সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোক রেখা কোনদিন পৌঁছেনি। লুটেরা ও ডাকাতেরা নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তভাবে ঘোরা-ফেরা করতো এবং যাকে ইচ্ছে তারই জানমাল লুট করে নিত। এসব কারণে এতদ এলাকায় মুজাহিদ কাফেলাকে সম্পূর্ণ অস্ত্র-সজ্জিত ও প্রহরারত অবস্থায় পথ অতিক্রম করতে হয়। পানীয় ও ব্যবহার্য পানি ছিলো অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। কাঁটা-যুক্ত ঝোপঝাড় আর জংলী গাছে ভরপুর এ সব এলাকা। এলাকার প্রান্তরে প্রান্তরে বসবাস করতো সুপ্রসিদ্ধ বালুচ উপজাতি। মুজাহিদ বাহিনীকে অহরহ গাছ কেটে নদী-নালার উপর সেতু নির্মাণ করতে হতো। কাফেলাকে চলার পথ অতিক্রম উটে চড়েই সমাধা করতে হতো। আধুনিক যমানার যান্ত্রিক যানবাহনের ব্যবস্থা ছিলো না। এসব কাজে সঙ্গী-সাথীদের সাথে সৈয়দ সাহেব নিজেও পুরোপুরি শরীক হতেন। কখনো কোথাও জনগণের তরফ হতে যিয়াফত কিংবা দাওয়াত এলে তা গ্রহণ করাকে মওকা মনে করতেন। অত্যন্ত ‘ইযযত ও সমাদরের সাথে নিয়ে যাওয়া হতো তাঁকে। কাফেলার লোকজন এতে আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করতো এবং পথের সকল তকলীফের কারণে তাদের মুখে কখনো আপত্তিকর কথা উচ্চারিত হয়নি বা কোন অভিযোগও শোনা যায়নি।

অবশেষে কাফেলা ঐতিহাসিক ‘বোলান গিরিপথে’ এসে উপনীত হয় আর এটা আফগানিস্তান থেকে ভারতবর্ষে আসবার একমাত্র পথ। এটা

'খায়বার গিরিপথের' পরে দ্বিতীয় গিরিপথ যার উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে ভারতবর্ষ বিজেতাদের আগমন ঘটতো। বোলান গিরিপথ ছিলো প্রকৃতি সৃষ্ট পথ, আল্লাহ্‌র অপার কুদরত দৃঢ়চেতা বিজেতা ও প্রয়োজন মুখাপেক্ষী মুসাফিরদের জন্য এ দীর্ঘ পর্বতশ্রেণীর মাঝে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এটা ভারতবর্ষকে আফগানিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। আলেকজান্দ্রীয় প্রাচীরের অভ্যন্তরে এ যেন এক প্রাকৃতিক ফাটল যে স্থান দিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কাফেলা ও সেনাবাহিনী পথ অতিক্রম করতে পারতো। এটা ছিলো এক দীর্ঘ গভীর ঘাটি যা কোহে ব্রাস্ক (Brahasck) কেটে কেটে পঞ্চান্ন মাইল পর্যন্ত চলে গেছে। এ স্থানের দুদিকেই পাহাড়ের ভীষণ ও সাংঘাতিক দুর্ভেদ্য দেয়াল যার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে পাঁচ হাজার সাত শ' ফুট পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। কোন কোন স্থানে বেশ চওড়া ও প্রশস্ত ফাটলও দেখা যায়। কিন্তু সাধারণত এর চওড়া চার থেকে পাঁচশো' গজের মধ্যে। পাহাড়ীয় অধিবাসী ও ডাকাতদল কাফেলার প্রতি চড়াও হবার জন্য এসব স্থানের দু'পাশে ওঁৎ পেতে থাকতো। যখনই সুযোগ পেত আর অমনি দুর্বৃত্তেরা কাফেলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো এবং লুটপাট করে নিত তাদের মালামাল ও সামানপত্র। কোন কোন জায়গায় এ সকল ঘাটি এত সংকীর্ণ যে মাত্র চল্লিশ ফুট বাকী থাকে।

হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথী শাল[১] পর্যন্ত পৌঁছুবার জন্য এ গিরিপথ পাড়ি দিতে বাধ্য হন, যা কতক স্থানে সুড়ংগের মতো মনে হচ্ছিলো। সেখান থেকে তাঁর কান্দাহার, গযনী এবং এর পরে কাবুল যাবার দরকার ছিলো। শালের মুসলমানগণ এবং মুজাহিদ আমীর তাঁকে অত্যন্ত উষ্ণ আবেগ ও উৎসাহের সাথে অভ্যর্থনা জানায় এবং দাওয়াত করে।

আফগানিস্তানে

সৈয়দ হামীদুদ্দীন সাহেব লিখছেন, "শেষ অবধি বেশ ভালোভাবে আমরা শাল শহরে প্রবেশ করলাম। এখানকার লোকজনের ভাষা আফগানী (বা পুশতো)। অন্যদের কথা এরা বুঝতে পারে না। এরা পরিপূর্ণ আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে হযরত বেরেলভী (র)-এর

১. এই শহরটিকে বর্তমানে কোয়েটা বলা হয়। এটি (পাকিস্তানের) বেলুচিস্তান প্রদেশে অবস্থিত। সামরিক ও ভৌগোলিক দিক থেকে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

খেদমতে হাযির হয়। এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন মেহরাব খান[১]-এর পক্ষ থেকে নিযুক্ত। ইনি ছিলেন একজন মর্যাদাসম্পন্ন ও প্রভাবশালী সর্দার। নেতৃস্থানীয় ও আমীর-ওমরা শ্রেণীর মধ্যে এরূপ দীনদার লোক খুব কমই দেখা যেত। তিনিও হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর কদমবুসির জন্য হাযির হন এবং সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনীয় বিষয়াদির পূরণ, সময় মতো দেখাশোনা ও খোজঁ-খবর নেওয়া এবং সুখ-সুবিধার সাধ্য মতো খেয়াল রাখেন। এর ফলে তিনি মহান মেহমানের সন্তুষ্টি ও নেকনজর লাভে ধন্য হন। সেখান থেকে দু'ক্রোশ দূরের এক পল্লীতে একটি সৈয়দ পরিবার ছিলো।

তৃতীয় দিনে উক্ত পরিবারের লোকজন খাবার ও ফলমূলের এক বিরাট যিয়াফত প্রদান করে ও সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-কে একশো' জন লোক সমভিব্যহারে বাড়িতে নিয়ে যায় এবং অত্যন্ত খুশী ও আনন্দের সাথে খানা খাওয়ায়। ঐ দিনই শাল-এর শাসনকর্তা হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর হাতে মুরীদ হন ও জিহাদের বায়'আত গ্রহণ করেন এবং তাঁকে বহু মুজাহিদসহ নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে মেহমানদারীর হক আদায় করেন। তিনি এ সফরে সৈয়দ সাহেবের সাথী হবার দরখাস্ত পেশ করেন। সৈয়দ সাহেব তাঁর অনুকূলে দো'আ করেন এবং বলেন যে, আমরা আহ্-বান করলে তুমি চলে আসবে।

সৈয়দ সাহেব পরের দিন পবিত্র মুহররম মাসের ২৮ তারিখে কসবায়ে খোশাব ও কার্বেজ মোল্লা 'আবদুল্লাহ থেকে পেরিয়ে কান্দাহারের দিকে রওয়ানা হন। শত শত আরোহী নিজ নিজ ঘর-বাড়ী থেকে রাস্তায় রওয়ানা হয়। শত শত আরোহী নিজ নিজ ঘর-বাড়ী থেকে রাস্তায় বের হয়ে সাক্ষাত করতে থাকে এবং শিবির পর্যন্ত সাথে সাথে আসতে থাকে। শহরের হাজার হাজার 'উলামায়ে কিরাম, অভিজাত ও সম্মানিত ব্যক্তি পায়ে হেটে অভ্যর্থনা জানাতে আসেন এবং সওয়ারীর সাথে সাথে চলতে থাকেন। শেষটায় অবস্থা এমন পর্যায়ে দাঁড়ায় যে, চলাচলের রাস্তাগুলো সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। জনতার ভীড় এতই জমজমাট হয়ে পড়ে যে, শেষ পর্যন্ত আপন-পর সনাক্ত

১. মেহরাব খান সে সময় বেলুচিস্তানের শাসনকর্তা ছিলেন। ইনি মাহমূদ খানের পুত্র এবং নাসির খান (১ম)-এর পৌত্র। নাসির খান বেলুচিস্তানকে একটি স্থায়ী সরকারের রূপ দেন। ১৭৯৪ খৃস্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন।

করাই মুশকিল হয়ে পড়ে। তিনি এরূপ জাঁকজমক ও শান-শওকতের সাথেই শহরের (কান্দাহার) সন্নিকটে এসে উপনীত হন। শহর থেকে এক মাইল পশ্চিম দিকে হিরাতের দরজার নিকটে তাঁর তাঁবু স্থাপন করা হয় এবং সৈন্যবাহিনীও সেখানে অবস্থান গ্রহণ করে।

সেদিন ছিলো কান্দাহারের শাসনকর্তা পরদিল খানের সহোদর শের দিল খানের মৃত্যুর চতুর্থ দিন। এজন্য তিনি হুযূরের দরবারে উপস্থিত হ'তে পারেন নি। কিন্তু সৈয়দ সাহেবকে খাওয়া-দাওয়ার সকল সাজ-সামান পাঠিয়ে দিয়ে তাঁকে আপ্যায়ন করেন। সৈয়দ সাহেব তাকে সালাম পাঠান এবং তার ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য দো'আ ও মাগফেরাত কামনায় আয়োজিত ফাতেহাখানিতে অংশ নেবার জন্য খবর পাঠান। পরদিন পরদিল খান নিজের সকল ভাইদের সাথে নিজ গৃহ হ'তে অভ্যর্থনার জন্য বের হয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন এবং অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে সাক্ষাৎ ও কোলাকুলি করেন। সৈয়দ সাহেবকে সঙ্গে করে নিয়ে পরদিল খান স্বীয় মসনদে বসতে দেন এবং আদব ও তা'জীমের সাথে তাঁকে গ্রহণ করেন। শাসনকর্তা সৈয়দ বেরেলভী (র)-এর এরূপ দূরদরাজ সফরের অবস্থাদি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। বিস্তারিত সকল কিছু অবগত হওয়ার পর একদিকে সৈয়দ বেরেলভীর আসবাবপত্র ও সাজ-সরঞ্জামহীন কাফেলা, অন্য দিকে লৌহ-কঠিন সুদৃঢ় মনোবলের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হন। প্রায় ঘণ্টা দু'য়েক ধরে খান সাহেবের সাথে সৈয়দ সাহেবের আলাপ চলতে থাকে। সৈয়দ সাহেব আলাপের পর ফাতেহাখানিতে যোগদান করেন এবং পরে খান সাহেবের সহযোগিতা কামনা করে বিদায় গ্রহণ করেন।

কান্দাহারে সৈয়দ সাহেব চারদিন অবস্থান করেন। কান্দাহারের এ কয়টি দিনে এমন কোন লোক ছিলো না যে তাঁর সাথে দেখা করেনি। তারা কি বিশিষ্ট কি সাধারণ সকলেই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বরং নিজে-দেরকে ভাগ্যবান বলেই মনে করে। তাদের (সাক্ষাৎকারীদের) অধিকাংশই সৈয়দ সাহেবের জিহাদের ডাকে সাড়া দিয়ে মুজাহিদ বাহিনীতে তালিকাভুক্ত হবার জন্য দরখাস্ত করতে থাকে। তাদের মধ্যে অনেকেই সঙ্গী হওয়ার জন্য অনুরোধ জানায়। পরিশেষে অবস্থা যা সৃষ্টি হয় তাতে দেখা যায় যে, সৈয়দ সাহেবের অনুমতি ব্যতিরেকেই হাজার হাজার লোক জিহাদে যোগদানের জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে এবং এতদুদ্দেশ্যে সফরের প্রস্তুতি

শুরু করে। শাসকবর্গ ব্যাপারটা জানতে পেরে আশংকাগ্রস্ত হয়ে শহরের সকল প্রধান ফটকের দ্বার-রক্ষীদের কেউ যাতে বাইরে না যেতে পারে তার নির্দেশ প্রদান করে। কিন্তু জনতা শাসকবর্গের উপর এতো ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, যার ফলে শাসকবর্গের এহেন অবরোধ প্রস্তুতি কোন কাজেই আসে না। লোকেরা কোন মতেই সংগ্রাম থেকে নিবৃত্তি হয়নি। তখন শাসকবর্গ বাধ্য হয়ে সৈয়দ আহমদ বেরেলভীকে পয়গাম পাঠায় এবং তাতে উল্লেখ করে যে, "আপনার আগমনে গোটা শহরই জিহাদী জোশে উদ্বেলিত ও প্রবল আগ্রহে আপনার সঙ্গী হতে অধীর হয়ে উঠেছে। ফলে শাসনব্যবস্থার সকল ব্যবস্থাপনায় ফাটল ধরতে চলেছে। আমাদের অনুরোধ এই যে, আপনি অতি সত্বর কাবুল গমন করুন এবং শহরবাসীদের মধ্যে যারা আপনার সাহচর্য কামনার আবেদন জানায় তাদের দরখাস্ত আপনি কখনই কবূল করবেন না।"

সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) অপ্রীতিকর কিছু ঘটার আশংকায় সফর মাসের ৩ তারিখে কান্দাহার থেকে রওয়ানা হন এবং হাজী 'আবদুল 'আযীযের কার্বজ-এ অবস্থান গ্রহণ করেন। ৪ঠা সফর সেখানে অবস্থান করেন এবং কাবুল পর্যন্ত যাওয়ার জন্য উট ভাড়া করেন। ৫ই সফর সেখান থেকে কাবুলের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান ও কেল্লায়ে আ'জমখানে এক রাত্রি যাপন করেন।

আফগানিস্তানের রাজধানীতে

বৃটিশের চোখে সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) এক অমঙ্গলরূপে চিহ্নিত হন। কান্দাহারের গণ-জমায়েত দেখে শাসকগোষ্ঠী তাঁর পিছু লাগে। কান্দাহার হতে তাঁকে নোটিশ দিয়ে বের করে দেওয়া হয়। সৈয়দ সাহেব কান্দাহারে মুসলিম মিল্লাতের যেমন জমকালো অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন ঠিক তেমনি অভ্যর্থনা পেলেন গযনীর জনতার কাছে। যিনি একটি জাতির নেতৃত্ব দান করতে থাকেন তাঁর অনেক দূরদর্শিতার প্রয়োজন হয়। তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর আন্দোলন নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য অবিশ্বাসী সরকার পেছনে লেগে আছে, কান্দাহারে তাঁকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তাই তিনি তাঁর সফরকালে কোন স্থানে বেশী দিন অবস্থান করতে চান নি। গযনীতে মাত্র দুদিন অবস্থান করার পর তিনি কাবুল অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন।

কাবুল রওয়ানা হওয়ার পর পথিমধ্যে হাজী মোল্লা 'আলী নামে শাহী ফৌজের এক সর্দার কাবুল সরকারের পক্ষ থেকে পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী

ও পদাতিক সৈন্যসহ এসে উপস্থিত হন। তিনি কাবুল সর্দারের সালাম পৌঁছান এবং সরকারীভাবে তাঁকে খোশ আমদেদ জানান। সৈয়দ বেরেলভী সাহেব কাবুল সর্দারের প্রেরিত সালাম গ্রহণ করেন এবং সামনের পথ খোলাসা মনে করে অধিক আগ্রহের সঙ্গে জোর কদমে এগিয়ে চলেন। কাবুলের মানুষ জন্মগত যোদ্ধার জাতি, তদুপরি আতিথেয়তায় পরিপূর্ণ চরিত্রের অধিকারী। তারা যখন সৈয়দ সাহেবের আগমনের কথা শুনতে পেয়েছেন আর কি ঘরে বসে থাকতে পারেন? অধিকাংশ আমীর-ওমরা, পদস্থ সরকারী কর্মচারী এবং হাজার হাজার বিশিষ্ট ও সাধারণ মানুষ তাঁকে ও তাঁর মুজাহিদ বাহিনীকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য শহরের বাইরে সমবেত হয়। তারা তাঁর বাহনের সাথে চলতে থাকে। সুলতান মুহাম্মদ খানের প্রতিনিধি আমানুল্লাহ খান জাঁকজমকের সাথে অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে মাঝ পথে এসে তাঁরই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকেন। সৈয়দ সাহেবের সাথে দেখা হ'তেই উভয়ের মধ্যে সালাম লেনদেন ও কুশলবার্তা বিনিময় হয়। শহরের দূরত্ব এক ক্রোশ থাকতেই অশ্বারোহী ও পদাতিক অভ্যর্থনাকারী সৈনিকসহ সাধারণ জনতার এরূপ সমাগম হয়েছিলো যে, শেষ পর্যন্ত পথ চলাই দুষ্কর হয়ে ওঠে। শহর প্রাচীরের দ্বারদেশ যেখানে উত্তর ও দক্ষিণের পর্বত এসে মিলিত হয়েছে তারই মাঝখান দিয়ে কাবুল নদী প্রবাহিত হয়েছে। এর উত্তর পাড় দিয়ে চলে গেছে বিরাট সড়ক। এরই পশ্চিমে প্রশস্ত সমতল ভূমি। মুজাহিদ বাহিনী সেখান পর্যন্ত পেঁাছুলে সুলতান মুহাম্মদ খান তার তিন ভাইসহ পঞ্চাশজন অশ্বারোহী নিয়ে অভ্যর্থনা জনাবার উদ্দেশ্যে অপেক্ষা করছিলেন। হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) দূর থেকেই তাদের উদ্দেশ্যে হাত উঠিয়ে সালাম জানান। তারাও অত্যন্ত আদবের সাথে সালামের জওয়াব দেন এবং সওয়ারী থেকে অবতরণ করেন। সৈয়দ সাহেবও সওয়ারী থেকে অবতরণ করে করমর্দন ও কোলাকুলি করেন। তারপর খান সাহেব সৈয়দ বেরেলভীকে নিজ বাহনে চড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলতে শুরু করেন। অগণিত সর্দার ও শহরের বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি দলে দলে এসে অভ্যর্থনা জানায়।

তাজী ঘোড়ার খুরের আঘাতে আর রাস্তার দু'সারি বিপুল জনতার ভীড়ে রাস্তাটি ধূলোয় ধূসরিত হয়ে ওঠে। সুলতান মুহাম্মদ খান অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং তাঁর প্রতিনিধি আমানুল্লাহ্ খানকে বলেন, সৈয়দ আহমদ সাহেবকে বাজার দিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কেননা সমগ্র শহরবাসীই

তাঁকে দেখে নয়ন সার্থক করার জন্য অপেক্ষায় রয়েছে। আমানুল্লাহ সৈয়দ সাহেবকে বাজারের উপর দিয়ে নিয়ে চললেন। সৈয়দ সাহেব পথ অতিক্রম করে পেঁছুলেন উযীর ফতেহ খানের শানদার ও মনোমুগ্ধকর বাগিচায় এবং সেখানে অবস্থান করলেন।

এ সময়ে আফগান শাসক ভ্রাতৃবর্গের ভেতর অন্তর্দ্বন্দ্ব চরম শিখরে উঠেছিলো। আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমান্তকে তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে রেখেছিলো। এ নিয়েই তাদের মধ্যে মনোমালিন্য ও শত্রুতার সৃষ্টি হয়।[১] এ কারণে সে এলাকায় ইসলাম ও মুসলমানদের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই স্বাধীন এলাকা ছিলো সৈনিক বৃত্তি ও অশ্বারোহণের কেন্দ্রভূমি; বিজয়ী ও রাজ্য বিজেতাদের ছিলো আবাস ভূমি এবং সিংহ-পুরুষদের বসবাসের কেন্দ্র। তা সত্ত্বেও নিজেদের মধ্যে কলহ-বিবাদের সুযোগে লাহোরের শিখ সরকার সে দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপে সক্ষম হয়। শিখদের পদানুসরণ করে ইংরেজও তাদের এমন কিছু এলাকা ছিনিয়ে নিতে সমর্থ হয় যেখানে তখন পর্যন্ত কোন বিদেশী রাষ্ট্রের পদচিহ্ন পড়ে নি এবং কুফর ও শিরকী শক্তির পতাকা উড্ডীন হয়নি।[২]

সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) এখানে প্রায় দেড় মাস কাল এদের সকলকেই ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ ও একটি সংহত শক্তিতে পরিণত করার প্রয়াস চালান, যেন তারা নবতরো বিপদের মুকাবিলা করতে সক্ষম হয়; ইসলামের হৃত মান-মর্যাদা এবং আফগানদের ক্ষুণ্ণ সম্ভ্রমবোধ ও আস্থা পূর্নর্বহাল করতে সমর্থ হয়---আর এমন একটি ইসলামী সাম্রাজ্যের ও

---

১. এ খান্দান বিশটিরও অধিক ভ্রাতৃবর্গের সমষ্টিতে গঠিত যারা একই পিতা পায়েন্দা খানের ঔরসজাত ছিলো। এদের ভেতর ষোলজন ছিলো নামী ও বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী এবং অধিকাংশ আফগানিস্তান, সীমান্ত ও কাশ্মীরের বিভিন্ন এলাকায় রাজত্ব করতো। এদের মধ্যে সর্দার দোস্ত মুহাম্মদ খান (আমীর আমানুল্লাহ্ খানের দাদা), সর্দার সুলতান মুহাম্মদ খান-(শাহ নাদির খান এবং জহীর শাহের দাদা), পেশোয়ারের শাসনকর্তা ইয়ার মুহাম্মদ খান, কাশ্মীরের শাসনকর্তা মুহাম্মদ 'আজীম খান, গযনীর শাসনকর্তা মীর মুহাম্মদ খান এবং কান্দাহারের শাসনকর্তা শের আলী খান উল্লেখযোগ্য।

২. বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন আর্থার কণোলী প্রণীত "Afghan's History" তথা 'আফগান জাতির ইতিহাস' যা তার বহুল বিস্তারিত গ্রন্থ "Journey to the North of India" তথা 'ভারতবর্ষের উত্তর দিকে ভ্রমণ' নামক পুস্তকের সংযোজন।

সামরিক শক্তির ভিত্তি স্থাপন করতে পারে, যা ভারতবর্ষের সীমান্ত থেকে কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার হ'লো এই যে, তাঁর এ স্বপ্ন সফল ও সার্থক হয়নি।

তারপর তিনি সেখান থেকে পেশোয়ারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন যাতে তিনি সেখানে তাঁর সেনাবাহিনীর জন্য একটি শক্তিশালী কেন্দ্র ও ছাউনি শিবির গড়ে তুলতে পারেন। এ লক্ষ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্যই তিনি তাঁর নিজের ও সহচরদের ঘরবাড়ী, পরিবার-পরিজন ও প্রাণাধিক প্রিয় মাতৃভূমিকেও বিদায়ী সালাম জানিয়েছেন। পেশোয়ারে তিনি তিন দিন অবস্থান করেন। এখান থেকে হশ্‌ত নগর তশরীফ নেন। তাঁর সেখানে আগমন সংবাদ অবগত হওয়া মাত্রই এতদ এলাকার জনতা পঙ্গপালের মতো ছুটে আসে এক নজর শুধু সৈয়দ সাহেবকে দেখবে বলে। তাঁর দর্শন লাভেও পূণ্য আছে, আনন্দ আছে—এ ধারণা সকলের মনেই তখন দানা বেঁধেছিলো। কেবল পুরুষেরাই নয়, হাজার হাজার মহিলাও তাঁকে (সৈয়দ সাহেবকে) দেখার জন্য ছুটে আসে। সৈয়দ সাহেব উটের উপর সওয়ার আছেন, এমন সময় দেখা গেল উটের জীন পোশের ঝালর অনুরাগিণী মহিলারা তাবাররুক মনে করে ছেঁড়া শুরু করেছে; এমন কি উটের লেজের লোমগুচ্ছ পর্যন্ত উপড়োতে থাকে। উটের পায়ের তলার মাটি পর্যন্ত তুলে নিয়ে চোখে মুখে লাগাতে থাকে। শুধু তাই নয় উটের খুরের তলার মাটি রুমালে ও ওড়নায় বেধে বাড়িতে নিয়ে যেতে থাকে। অবশেষে জনতা সৈয়দ সাহেবকে বস্তির এক প্রান্তে নিয়ে গিয়ে তাঁবু করে শিবির বানিয়ে দেয়। সমস্ত সেনাদল সেখানেই অবতরণ করেন। তিনি কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করে মুসলমানদের জিহাদের প্রতি আহ্বান জানান এবং ধর্মীয় বিধি-বিধান প্রচার করেন। এরপর খেশগী নামক স্থান হয়ে তিনি মুজাহিদ সমভিব্যাহারে নওশেহ্‌রা নামক জায়গায় উপনীত হন। এখান থেকে তিনি তাঁর প্রিয় কর্মসূচীর বাস্তবায়নের সূচনা করেন। বস্তুত এটাই ছিলো তাঁর বছরের পর বছর দাওয়াত ও তবলীগ, সংগ্রাম ও সাধনা, তার উপর অশেষ দুঃখ-কষ্ট পূর্ণ সফরের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। জীবনের আরামকে হারাম করে এ সাধক যে নজীর স্থাপন করেছেন, বিগত শতাব্দীগুলোর বিজেতা ও সাম্রাজ্য স্থাপনকারীদের ইতিহাসে তা খুব কমই পাওয়া যায়। ঈমানী কুওত, প্রবল আগ্রহ ও আদর্শ প্রীতি এবং আল্লাহ্‌র উপর অগাধ আস্থাশীল হওয়ার ফলেই এ বিশিষ্ট পদক্ষেপ সম্ভব হয়েছিলো।

সৈয়দ সাহেবের এ মহান আদর্শ ও লৌহ-কঠিন মনোবল এবং সুদৃঢ় আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা তদুপরি সর্বোত্তম প্রশিক্ষণের এমনি এক স্মৃতিপট যা থেকে ভারতবর্ষের হাজারো বছরের ইসলামের ইতিহাস শূন্য পড়ে আছে।

লাহোর সরকারকে চরমপত্র

১২৪২ হিজরীর ১৮ই জমাদিউ'ল-আওয়াল মুতাবিক ১৮১২ খৃস্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর নওশেহরা[১] নামক স্থানে গিয়ে উপনীত হন এবং সিদ্ধান্ত নেন যে, মুজাহিদ সেনাবাহিনীর বসবাসের জন্য এটাই হবে প্রথম ছাউনি। তিনি এ ব্যাপারেও দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেন, যে, এ জিহাদ রসূলে আকরাম (স')-এর প্রদর্শিত জীবনাদর্শ (সুন্নত) মাফিক পরিচালিত হবে। কারণ মুজাহিদ বাহিনী পদমর্যাদার লোভ ও প্রবৃত্তির খায়েশ পূরণ করার উদ্দেশ্যে নিজেদের ঘর-বাড়ী পরিত্যাগ করে আসে নি। আর তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এটাও নয় যে, তারা একটি রাজ্যের বুনিয়াদ স্থাপন করবেন, এর ছত্রছায়ায় সচ্ছলতার জীবন-যাপন করবেন এবং জনগণের উপর শাসনদণ্ড চালাবেন। তাঁরা জাহিলিয়াত ও গোষ্ঠী-প্রীতির পতাকাতলে জিহাদ করছেন না যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একমাত্র এটাই যে, আল্লাহর বান্দাদেরকে এক মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে অন্য মানুষের গোলামীর যাঁতাকলে এবং এক প্রবৃত্তির কামনা থেকে অন্য প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার শিকারে পরিণত করে। তাঁরা এ জন্যই জিহাদের পতাকাতলে সমবেত হয়েছেন এবং নিজেদের ঘাম ও রক্ত ঝরাতে কুণ্ঠিত হচ্ছেন না যাতে এ ভূখণ্ডে আল্লাহর নাম উচ্চস্বরে ঘোষিত হয়, আল্লাহর দীন (ইসলাম) ও বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এতদুদ্দেশ্যেই তিনি (সৈয়দ সাহেব) সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, এই গোটা জিহাদ ও লড়াই পরিচালনা করা হবে একমাত্র আল্লাহ্‌র কিতাব ও রসূল আকরাম (স')-এর বাস্তব জীবনাদর্শ তথা সাহাবা-কিরাম, তাবি'ঈগণের অনুসৃত ও গৃহীত কর্মপন্থার আলোকে। এ ব্যাপারে তাঁরা শুধু অনুকরণ-অনুসরণকারীর ভূমিকা পালন করবেন; কোন অবস্থায়ই শির্‌ক ও বিদ'আত সৃষ্টিকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন না।

হযরত রসূল আকরাম (স') সৈন্যবাহিনী নিয়ে রওয়ানা হয়ে ওসিয়ত করতেন যে, যখন তোমরা মুশরিক (অংশীবাদী) ও পৌত্তলিকদের সাথে

---

১. নওশেহরা ঐ সময় ইংরেজ সরকারের একটি বড় সৈন্য ছাউনি ছিলো, যা এখন পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশের একটি জেলা।

যুদ্ধে লিপ্ত হবে তখন তাদেরকে তিনটি বিষয়ের দিকে দাওয়াত জানাবে। যদি তারা তিনটি ব্যাপারের একটিও মেনে নেয় তাহ'লে তাদের ক্ষমা ক'রো। প্রথমে তাদের ইসলামের দাওয়াত (আহবান) দেবে, যদি তারা এ দাওয়াত কবুল করে নেয় তখন তাদের কথা মেনে নেবে এবং তাদের থেকে নিজেদের হাতকে নিরস্ত রাখবে। এরপর তাদেরকে মুহাজিরদের আবাসভূমির দিকে হিজরত করার দাওয়াত দেবে আর তাদের জানিয়ে দেবে, যদি হিজরত করে তবে তারা মুহাজিরদের সকল অধিকার লাভ করবে; তারাও অনুরূপ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে। আর যদি তারা এতে অস্বীকৃতি জানায় তবে তাদের জানিয়ে দেবে যে, তাদের মর্যাদা একজন সাধারণ গ্রামবাসীর অনুরূপ হবে। তাদের উপর ঐ সমস্ত আইন-কানুন ও বিধি-বিধানই প্রযোজ্য হবে, যা একজন সাধারণ মুসলমানের উপর হয়ে থাকে। তাদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদে (মালে গনীমত) কোন অংশ দেওয়া হবে না, যতদিন না তারা মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করবে। যদি তারা এতেও অস্বী-কার করে তবে তাদের নিকট জিযয়া দাবী করবে। যদি তারা জিযয়া প্রদানে স্বীকৃতি প্রদান করে তবে সকল প্রকার হস্তক্ষেপ থেকে নিজেদের হাত সংযত রাখবে আর অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাকের দরবারে সাহায্য চাইবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করবে।[১] মুসলমানেরা শেষ যুগে হুযূর (স')-এর উক্ত ওসিয়ত ভুলে গিয়েছিলো একেবারেই।[২] বিশেষ করে

---

১. সহীহ মুসলিম [হযরত সুলায়মান বিন বরীদাহ (রা)]।

২. একথা দ্বারা একমাত্র হযরত ওমর ইবন 'আবদুল 'আযীয (রা)-কেই শুধু পৃথক রাখা চলে, যিনি শরী'আতের পরিপূর্ণ বিধি-বিধান, আর্থিক, দেওয়ানী, ব্যবস্থাপনাগত ও যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়াদিতে নবী করীম (স')-এর সুন্নতের উপর অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে আমল করতেন। তিনি সমরকন্দ বিজয়ের সাত বছর পর তা ফিরিয়ে দেন। সমর-কন্দবাসী খলীফার দরবারে অভিযোগ পেশ করে যে, সেনাপতি কুতায়বা এ শহর-বাসীদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত প্রদান ব্যতিরেকেই শহর অধিকার করেন এবং তাদেরকে জিযয়া কিংবা যুদ্ধ উভয়টির মধ্যে কোনটির বাছাই করার সুযোগও দেননি। তিনি একথা শোনামাত্রই কাযীকে হুকুম দেন যাতে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হয়। যদি সমরকন্দের মুশরিক অধিবাসীদের কথা সত্য হয় তবে যেন ইসলামী সেনা-বাহিনীকে শহর ছেড়ে দিয়ে চলে আসতে বলা হয় এবং পুনরায় শরী'আতের উক্ত হুকুমের উপর আমল করা হয়। অতঃপর এটাই করা হয় এবং পরিণতিতে শহরের অধিকাংশ বাসিন্দা ইসলামে প্রবেশ করে।

(বালাযুরীর ফতুহুল বুলদান, ৪১১ পৃষ্ঠা)

বিভিন্ন মুসলিম সুলতান ও বিজেতারা একে দৃষ্টির অন্তরালে চেপে রেখে মনে করতে শুরু করেছিলো যে, হয়তো ইসলামী জীবনাদর্শের সাথে যুদ্ধের কোনরূপ সম্পর্কই নেই। এক্ষেত্রে শরী'আতের আহকাম তথা বিধি-বিধান প্রতিপালনের কোন আবশ্যকতাই নেই---যেন ইসলাম তাদের এ এ ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীন ও বল্গাহীনভাবে ছেড়ে দিয়েছে যা ইচ্ছে তাই করবে। শেষ যুগে তারা রাজত্ব করবার মানসিকতাসম্পন্ন সাধারণ বিজেতা ও সুলতানদের পদাংক অনুসরণ করে চলতে থাকে। ফলে তারা না ইসলামের দাওয়াত জানাবার প্রয়োজন অনুভব করতো, না জিযয়া প্রদানের সুযোগ দান করতো। প্রথমে থেকে শেষ পর্যন্ত একটা জিনিসই তাদের সামনে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে ছিলো আর তা ছিলো যুদ্ধ আর শুধু যুদ্ধ।

হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) ইচ্ছা করলেন যে, এই সর্বোত্তম 'ইবাদত, উৎকৃষ্টতর 'আমল এবং সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও সৌন্দর্যমণ্ডিত কাজটির উদ্বোধন এরূপ একটি সুন্নতের পুনরুজ্জীবনের দ্বারাই করা হোক যা শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে পরিত্যক্ত ও বিস্মৃত হয়ে গেছে। আল্লাহ্ পাক এরই কারণে এই সাধ্য-সাধনা ও জিহাদের মধ্যে বরকত দান করবেন; এর নূর তথা আলোকোজ্জ্বল জ্যোতিঃরেখা গোটা জীবন যিন্দেগীর শিরা-উপশিরায় সঞ্চারিত হবে। অতএব এতদুদ্দেশ্যে তিনি শর'য়ী বিধান মুতাবিক লাহোরের শাসনকর্তা রঞ্জিত সিংহের[১] উদ্দেশ্যে একটি ইশতেহার লিখে পাঠান ঃ

---

১. রনজিত সিংহ (১৭৩৯—১৮৮০ খৃী) ছিলেন উৎসাহী দৃঢ়-মনোবলসম্পন্ন বিশিষ্ট সমরনেতাদের অন্যতম। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত হন এবং নিজস্ব সামরিক যোগ্যতা ও প্রতিভাবলে একটি সুদৃঢ় ও বিরাট সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ স্থাপন করেন। আহমদ শাহ আবদালী ছিলেন আফগানিস্তানের শাসক। লাহোরের হুকুমত যখন তিনি রনজিত সিংহকে সোপর্দ করেন তখন তার বয়স ছিলো মাত্র বিশ বছর। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি শুধু আযাদীর ঘোষণা প্রদান করেই ক্ষান্ত হন নাই বরং নিজস্ব হুকুমতের সীমারেখাও প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর করতে শুরু করেন। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এই নবোদ্ভূত সাম্রাজের পরিধি উত্তর ও পশ্চিমে কাবুল পর্যন্ত এবং দক্ষিণ ও পূর্বে যমুনা নদীর কিনারা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যায়। তার সৈন্যবাহিনী দেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করে এবং নিজেদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সামরিক শক্তি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলো। তার নবোদ্ভূত সাম্রাজ্যের সাংগঠমিক দৃঢ়তা ও শক্তির মৌলিক উপাদান ছিলো চারটি ঃ প্রথম বিষয়টি তার প্রাকৃতিক নেতৃত্বসুলভ যোগ্যতা; দ্বিতীয়ত, তার সৈন্যদের

১. হয় ইসলাম কবুল করো (এই মুহূর্তেই আমাদের ভাই ও আমাদের সমকক্ষ হয়ে যাবে। কিন্তু এক্ষেত্রে কোন জোর-যবর-দস্তি নেই)।

২. অথবা আমাদের আনুগত্য মেনে নিয়ে জিযয়া প্রদানের শর্ত কবুল করে নাও। তাহ'লে এ মুহূর্তেই আমাদের জীবন ও সম্পদের মতোই তোমাদের জান-মালেরও হেফাজত করা হবে।

৩. শেষ কথা এটাই যে, যদি দু'টো কথার কোন একটিও মঞ্জুর না করা হয় তবে যুদ্ধ করবার জন্য তৈরী থাকো। কিন্তু মনে রেখো যে, সারা ইয়াগিস্তান এবং ভারতবর্ষ আমাদের সাথেই রয়েছে। সম্ভবত তোমাদের শরাবপ্রীতিও এতখানি নয় যতখানি আমাদের শাহাদতপ্রীতি।

লাহোরের শাসনকর্তা এটাকে একটা মামুলী চিঠি মনে করে এর প্রতি কোন গুরুত্বই প্রদান করেনি। আরও মনে করতে থাকে যে, মুসলমানদের কোন শেখ কিংবা ধর্মীয় নেতার এটা একটা ধমকপূর্ণ চিঠি। এর পেছনে না আছে কোন সরকার, না আছে কোন সামরিক শক্তি কিংবা আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত কোন নিয়মিত সৈন্যবাহিনী। সম্ভবত এটা কোন 'আলিম কিংবা পীরের সাময়িক জোশ ও উত্তেজনার ফলশ্রুতি, যারা জিহাদ শব্দটি দ্বারাই খুব সত্বর আবেগ উদ্দীপ্ত হয়ে পড়ে এবং তার চতুষ্পার্শে মুরীদ-বৃন্দের একটি সংঘবদ্ধ দল জমায়েত হতে থাকে। কিন্তু যখন প্রকৃত বাস্ত-

---

রণদক্ষতা ও বিশ্বস্ততা, (যার অধিকাংশই পাঞ্জাবের কৃষক ও যুদ্ধবাজ খান্দানের ও উপজাতীয়দের সমষ্টি ছিলো); তৃতীয়ত, ঘৃণা যা শিখদেরই এবং বিশেষ করে আকালী দলের লোকদের অন্তর-মানসে মুসলমানদের সম্পর্কে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিলো। চতুর্থত, মুসলমানদের অবনতি, সামরিক, নৈতিক, চারিত্রিক পারস্পরিক শৃংখলার অভাব, দূষিত ও কলুষিত আবহাওয়া যার কিছু বর্ণণা ইতিপূর্বেই দেয়া হয়েছে। স্বয়ং রঞ্জিত সিংহ খুব একটা বিদ্বেষ ও পক্ষপাতসুলভ মনোভাবাপন্ন ছিলেন না। একে তিনি একটি কার্য-করী বাস্তবতা হিসাবেই মেনে নিয়েছিলেন এবং নিজের সৈন্যবাহিনীর মুসলিম বিদ্বেষী মানসিকতার পুরোপুরি সহযোগিতাও প্রদান করেননি। অবশ্য স্বীয় রাজনৈতিক ও সামরিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশায় তাদের অনেকখানি রশি ঢিল দিয়ে রেখেছিলেন। তার রাজত্বকালে মুসলমানেরা ভীত ও সন্ত্রস্ত অবস্থায় কাল যাপন করেছিলো এবং একটি অবমানিত জাতির ন্যায় বিভিন্ন ধরনের জুলুম ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনার শিকার হয়েছিলো। (দেখুন—Sir Lepel Griffin প্রণীত "Ranjit Singh")

বতা সবার সামনে উদ্ভাসিত হয় তখন এসব সাথী তাঁকে ছেড়ে চলে যায়। অতীতে তার এ ধরনের অনেক পরিস্থিতি মুকাবিলার অভিজ্ঞতা হয়েছে। তিনি বললেন, এটা সাময়িক মেঘ গর্জন ও বিদ্যুতের ঝলকানি, যা এখনই অদৃশ্য হয়ে যাবে। তিনি কমাণ্ডার বুদ্ধসিংহকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন এই হঠাৎ গজিয়ে ওঠা জামাতের গতিবিধির উপর নজর রাখেন। এরপর তৃপ্তির সাথে রাষ্ট্রীয় কার্যাদি এবং আনন্দঘন জীবনের ব্যস্ততায় মশগুল হয়ে পড়েন ।

সময় বয়ে চলে। একদিন ১২৪২ হিজরীর ২০শে জমাদিউ'ল-আও-য়াল তারিখে মুজাহিদ বাহিনী বুদ্ধসিংহের সৈন্যদলের উপর যারা আক্রম-ণোদ্যত ছিলো—প্রথম রাত্রিকালীন হামলা পরিচালনা করে এবং প্রত্যেকেই তলোয়ারবাজির উত্তম নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখে। এ যুদ্ধে তারা তাদের বীরত্ব, সাহসিকতা তথা শৌর্যবীর্য ও রণদক্ষতার ধারণাতীত নজীর পেশ করতে সক্ষম হয়। তারা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়, এটা ভিজে কিছু নয় যা সহজেই গলধঃকরণ করা চলে। এই প্রথম জিহাদ-যুদ্ধে শিখ বাহিনীর সাত শ' সৈন্য নিহত এবং সত্তরের কিছু বেশী মুজাহিদ শাহাদতের অপূর্ব সৌভাগ্য লাভ করে ।

একজন মুসলমানের শাহাদত লাভের আকাংক্ষা

হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) আকুড়ার উপর রাত্রিকালীন হামলা পরিচালনার উদ্দেশ্যে মুজাহিদ বাহিনীর একটি নির্বাচিত দল প্রস্তুত করেন। এটা মুজাহিদ বাহিনীর সেই প্রথম প্লাটুন ছিলো, যাদের দ্বারা এ দেশের বুকে দীর্ঘকাল পর নির্ভেজাল ধর্মীয় বুনিয়াদের উপর "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ"র উদ্বোধন হয়।

হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) সৈন্যবাহিনীকে দায়িত্ব প্রদান করেন যে, তারা যেন বাছাই করে মযবুত, স্বাস্থ্যবান এবং কষ্টসহিষ্ণু যুবকদের একটি জামা'আত তৈরী করেন। কারণ তাদের রাতের বেলায় একটি শক্তি-শালী ও বিরাট সংখ্যক দুশমনের মুকাবিলা করতে হবে।

মুজাহিদ বাহিনীর একটি তালিকা সৈয়দ সাহেবের সামনে পেশ করা হয়। তিনি এর উপর একবার চোখ বুলিয়ে দেখতে পান যে, তার ভেতর 'আবদুল মজীদ খান জাহানাবাদীর নামও ছিলো। তিনি কয়েক দিন থেকে জ্বরে

ভুগছিলেন। তিনি তার নাম তালিকা থেকে কেটে দেন। 'আবদুল মজীদ খান এ সংবাদ শোনা মাত্রই জ্বর নিয়ে বিছানা থেকে উঠে গিয়ে সৈয়দ সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হন এবং জানতে চান কেন তাঁর নাম মুজাহিদ বাহিনীর তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হলো। হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) তাকে সান্ত্বনা প্রদান করেন এবং বলেন যে, তোমার জ্বর আছে, তাই তোমার নাম তালিকাভুক্ত করিনি। তখন তিনি ক্ষোভ ও দুঃখের সাথে জানান যে, হযরত! আজ আল্লাহ্র পথে দুশমনের সাথে পয়লা মুকাবিলা হবে, মানে আজই 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর' বুনিয়াদ স্থাপিত হ'তে যাচ্ছে। আমি এমন অসুস্থ নই যে, যেতে পারবো না। আমার নাম অবশ্যই মুজাহিদ বাহিনীর তালিকায় রাখবেন। এরপর তিনি তাঁর নাম পুনরায় তালিকাভুক্ত করেন এবং 'আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন, তোমাকে পুরস্কৃত করুন, আল্লাহ তোমাকে দীন-ধর্মের খেদমত করবার অধিকতর তৌফিক দান করুন' ইত্যাদি, ইত্যাদি----দো'আ করেন।

মোদ্দা কথা এই যে, 'আবদুল মজীদ খান আকুড়ার যুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনীর সাথে শরীক হন। শত্রু বাহিনীর সংখ্যা মুজাহিদদের তুলনায় প্রায় দশগুণ বেশী ছিলো। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা মুজাহিদ বাহিনীকে বিজয় দান করেন এবং 'আবদুল মজীদ খান শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেন (ইন্না লিল্লাহ)।

জামাতের উপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হয়

আকুড়ার যুদ্ধের পর থেকেই লোকজন বিপুল সংখ্যায় সৈয়দ সাহেবের চারপাশে জমায়েত হ'তে থাকে। কিন্তু এদের উদ্দেশ্য ছিলো অন্য। কতক লোক কেবলমাত্র এ উদ্দেশ্যে এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছিলো যে, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন এবং এ উঠতি সংগঠনের শক্তি দিন দিন ফুলে-ফেঁপে ওঠার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে। এ জন্যে সুযোগসন্ধানী ও দূরদর্শিতার দাবী এটাই ছিলো যে, এ নতুন দলটির ভেতরে শামিল হয়ে পড়া ভালো। কতক লোক কেবলমাত্র মালে গনীমত লাভের আশায় এবং হাতিয়ার ও যুদ্ধ-সামানের লোভে মুজাহিদ বাহিনীর সাথে যোগদান করেছিলো। অনেকে এমনও ছিলো, যাদের নিয়ত প্রকৃতই বিশুদ্ধ ছিলো। ধর্মীয় চেতনা ও অনুপ্রেরণা আর শাহাদত লাভের প্রবল আকাঙখাই তাদের এখানে টেনে এনেছিলো। খালেস অন্তরেই তারা আল্লাহ্র রাহে বের হয়েছিলো। তাদের ভেতরে না

ছিলো কোন লোভ, লোক দেখানো ভড়ং অথবা মিথ্যা অহমিকা—কিংবা ছিলো না অন্ধকার যুগের সম্ভ্রম ও মর্যাদাবোধের কোন মিকশ্চার।

আকুড়ার যুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনীর এক ক্ষুদ্র দলের বহুসংখ্যক শক্তি-শালী দুশমনের উপর কামিয়াবী ও সাফল্য এবং মুজাহিদ বাহিনীর আত্মোৎ-সর্গীত ও জানবাজির ঘটনাবলীর সোচ্চার আওয়াজ বহুদূর পর্যন্ত শোনা গিয়েছিলো। এরই ফলে বহু উদীয়মান ও অভিযানপ্রিয় যুবকদের ভেতর এ নবোত্থিত ও নবোদ্ভূত শক্তির মধ্যে অংশগ্রহণের দৃঢ় ইচ্ছা পয়দা হ'তে থাকে। তাদের সৌভাগ্য তারকা বহুত উঁচুতে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো। অতএব এ সমস্ত লোক দলে দলে এসে এতে শামিল হতে থাকে। তাদের সামনে না ছিলো কোন মহৎ লক্ষ্য, না ছিলো কোন ধর্মীয় আবেগ-উদ্দীপনা, না কোন অঙ্গীকার ও পারস্পরিক চুক্তির প্রতি এদের একবিন্দুও শ্রদ্ধাবোধ ছিলো। একটি বিরাট সংখ্যক দল, যাদের সুযোগ সন্ধানী মন-মানসিকতাই তাদেরকে একত্রিত করেছিলো। অবশ্য ঐসব মুজাহিদ বাহিনীর ব্যাপারটা ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের যারা ভারতবর্ষ থেকেই হযরত বেরেলভী (র)-এর অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন, নিজেদের হাত সৈয়দ সাহেবের হাতের উপর রেখে অঙ্গীকারে আবদ্ধ এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অনু-সরণ ও আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছিলো স্বয়ং সৈয়দ সাহেবেরই হাতে। ওদিকে সৈয়দ বেরেলভী (র)-ও এদের পরিপূর্ণরূপে ধর্মীয় প্রশিক্ষণ এবং তাদের প্রতি একাগ্র দৃষ্টিদানের পুরো সুযোগ লাভ করেছিলেন। ফলে এদের ভেতর ইসলামী কাজকর্মের পুরো মন-মানসিকতা সুদৃঢ় আসন স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলো। এরা ছিলো হুকুমের তাবেদার মাত্র আর এরা চোখের কেবল ইশারা-ইঙ্গিত পাওয়া মাত্রই দেহ হ'তে মাথা নামিয়ে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়তো। মওলানা আলতাফ হোসেন হালীর নিম্নে উদ্ধৃত কাব্যাংশটির সাথে এ অবস্থার কি সুন্দর সামঞ্জস্যই না রয়েছে ঃ

শরী'আতের মাটিতে ছিলো বাগডোর তাদের,
দাউ দাউ আগুন জ্বলে না এমনি তাদের।
যেখানে গরম করা হতো সেখানেই গরম তারা,
যেখানে নরম করা হতো সেখানেই নরম তারা।

এ ধরনের একটি সংঘবদ্ধ দল যেখানেই গড়ে ওঠে তা পুরো আস্থার যোগ্য। বিরাট থেকে বিরাটতম দায়িত্ব তাদের উপর অত্যন্ত বিশ্বাস ও নির্ভরতার সাথেই অর্পণ করা চলে এবং সংখ্যাল্পতা ও বস্তুগত দুর্বলতা তাদের উপর কোনই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না।

হাযারূ নামক স্থানে অতর্কিত হামলা পরিচালনাকালে [যা সৈয়দ বেরেলভী (র)-এর অনুমতিক্রমে স্থানীয় অধিবাসীদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিলো] বিশৃঙ্খলা, আইন-কানুনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের প্রতি দুর্বার লোভ ও জিহাদের ক্ষেত্রে কতক পালনীয় ইসলামী বিধি-বিধান ও আদব-কায়দার প্রতি নির্মম উপেক্ষা প্রদর্শনের যে চিত্র সামনে এসেছিলো যার কারণে সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) এবং তাঁর তীক্ষ্ণধী, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী সঙ্গী-সাথীদের ভেতর অত্যন্ত চিন্তা ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। তারা এটাও অনুভব করতে সমর্থ হয় যে, এটা তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি অন্তর্ঘাতমূলক, যার জন্য তারা দূরদরাজ থেকে হিজরত করে এখানে এসেছে। এসব আল্লাহ্ এবং তদীয় রসূল করীম (স·)-এর অসন্তোষ উদ্রেককারী এবং আল্লাহ্‌র সাহায্যের প্রতিশ্রুতির পক্ষে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী। সুতরাং এর আশু প্রতিকার এবং ভবিষ্যতে যাতে এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার দ্বার চিরতরে রুদ্ধ করা দরকার। এর জন্য সহজ পন্থা এই যে, তাঁরা সবাই সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর হাতে বায়‘আত হবেন এবং তাঁকেই নিজেদের শর‘য়ী আমীর এবং মুসলমানদের ইমাম হিসেবে মেনে নেবেন। অধিকন্তু প্রতিটি অবস্থাতে ইমামের অনুসরণ ও আনুগত্যকে নিজেদের উপর বাধ্যতামূলক করে নেওয়া যেন তাদের এ জিহাদকে শর‘য়ী জিহাদ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় এবং সেক্ষেত্রে জিহাদের হুকুম-আহকাম ও রীতি-নীতি যাতে পুরোপুরি রক্ষিত হয় তার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দান সম্ভব হয়।

তারা ধর্মীয় দূর-দৃষ্টিসম্পন্ন হবার কারণে আল্লাহ্‌র কিতাব ও সুন্নতে রসূল (স·) সম্পর্কে পাণ্ডিতা এবং শরীয়তের মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের ভিত্তিতে এটা ভালভাবেই জানতো যে, এমন একজন আমীরের নির্বাচন করা প্রয়োজন যিনি আল্লাহ্‌র কিতাব ও সুন্নতে নববী (স·)-এর আলোকে মুসলমানদের পথ-প্রদর্শন করবেন, আল্লাহ্‌র নির্দেশিত বিধানাদির প্রতিষ্ঠা এবং বিবাদ-বিসম্বাদের ক্ষেত্রে নিষ্পত্তি ও আপোস রফার

কাজকর্ম আঞ্জাম দেবেন, জিহাদকে আবার নতুনভাবে জারী করবেন যা ইসলামের এমন একটি রোকন যাকে মুসলমানেরা দীর্ঘকাল যাবত ভুলেই বসেছে। এরই কারণে তাদের কেন্দ্রীয় শক্তি ও সংহতি ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে। তাদের অবস্থানগত মর্যাদা এমন একটি ভেড়ার খোঁয়াড়ের ন্যায় হয়ে গেছে যার কোন রাখাল নেই। তাদের এও জানা ছিলো যে, পবিত্র কুরআন ও হাদীছে জিহাদের প্রতি কতখানি গুরুত্ব আরোপ ও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। তাদের সামনে কুরআন মজীদের এ আয়াত অবশ্যই ছিলোঃ

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم -

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগত হও এবং রসূলের অনুগত হও আর তোমাদের মধ্যে (অর্থাৎ মু'মিনদের মধ্য হইতে) যাহারা ব্যবস্থাপক হয় তাহাদেরও অনুগত হও।" (নিসা ঃ ৫৯)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

لو ردوه الى الرسول و الى اولى الامر منهم -

"যদি তাহারা উহা রসূল কিংবা তাহাদের মধ্যে যাহারা ব্যবস্থাপক তাহাদের গোচরে আনিত - -।" (নিসা ঃ ৮৩)

রসূলে আকরাম (স')-এর ইরশাদও তাদের সামনে ছিলোঃ

"তোমরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে, মাহে-রমযানের সিয়াম পালন করবে, সম্পদের যাকাত আদায় করবে, আমীরের (নেতা ও শাসক) আনুগত্য করবে যখন তোমাদের কোন নির্দেশ করা হয় এবং (ফলশ্রুতিতে) তোমাদের প্রভু প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১]

মুসলমানদের একতা ও সংগঠনের ব্যাপারে রসূল করীম (স') এতখানি সতর্ক ছিলেন যে, তিনি তাদের জন্য একজন আমীরকে অপরিহার্য ও অবধারিত বলে ঘোষণা করেছিলেন যে তাদের (মুসলমানদের) মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাব (গ্রন্থ) ও সুন্নতে নববীর আলোকে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে ও ফয়সালা পেশ করবে, আসমানী শরীয়তকে প্রতিষ্ঠিত

১. তিরমিযী।

করবে, তাদের ধর্মীয় ও জাগতিক আবশ্যকীয় বিষয়ে দেখাশোনা করবে, এমনকি তাদের জীবনের কোন একটি মুহূর্তও নেতৃত্ববিহীন কাটবে না। হাদীছ শরীফে বলা হয়েছে ঃ

> তোমাদের মধ্যে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যদি সম্ভব হয় যে, একটি সন্ধ্যা ও একটি প্রভাতকালও একজন ঈমাম ব্যতিরেকে অতিবাহিত হবে না, তবে তাই যেন করা হয়।[১]

অন্য আর একটি হাদীছে বলা হয়েছে ঃ

> "সফর বা বিদেশ প্রবাসে তিনজন হলেও তার মধ্যে অবশ্যই একজনকে আমীর নির্বাচিত করবে।"[২]

মহানবী (স·) এমন একটি জীবন সম্পর্কে ভয় দেখিয়েছেন ও সতর্ক করেছেন যেখানে মুসলমানেরা রাখালহীন মেষপালের মত জীবন যাপন করে, যার যা খুশী, যার সাথে ইচ্ছা যুদ্ধ করে, যাদের কোন আমীর কিংবা নেতা নেই, তারা আদেশ-নিষেধেরও অনুবর্তী হয় না। রসূল করীম (স·) এমন জীবনকে জাহিলিয়াতের সাথে তুলনা করেছেন, যেখানে মানুষ জীব-জন্তুর মত যেখানে ইচ্ছে ঘুম দেয় এবং গোত্র-প্রীতি, অহমিকা ও অবজ্ঞাবশত একে অপরের রক্ত প্রবাহিত করে। রসূল (স·) বলেন ঃ

> "যে ব্যক্তি আনুগত্যের সীমারেখা থেকে বেরিয়ে যায় এবং জামা'আত (সমাজবদ্ধ জীবন) পরিত্যাগ করে এবং এরপর মারা যায় সে জাহিলিয়াতের মৃত্যু বরণ করলো। যদি কেউ অন্ধ ঝাণ্ডার তলে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে, গোত্র ও গোষ্ঠিপ্রীতির কারণে রাগান্বিত হয়, এবং গোত্রীয় মর্যাদার চ্যালেঞ্জ করে কিংবা গোত্রপ্রীতিতে সহযোগিতা প্রদান করে এবং এমতাবস্থায় মারা যায়, তবে তার মৃত্যুও জাহি-লিয়াতের মৃত্যু হবে।"[৩]

অন্য আর এক হাদীছে বলা হয়েছে ঃ

> "যুদ্ধ দু'প্রকারের ঃ যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা করে, ইমামের আনুগত্য করে, মূল্যবান ও প্রিয় ধন-সম্পদ

---

১. ইবনে 'আসাকির।

২. আবূ দাউদ।

৩. মুসলিম।

(সৎপথে) ব্যয় করে, বন্ধু-বান্ধবকে সাহায্য করে, ফিতনা-ফাসাদ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে--তবে তার শয়ন ও জাগরণ সব কিছুর বিনিময়ে ছওয়াব লেখা হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি অহমিকা, লোক দেখানো ও লোক সমাজে খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি পাবার আশায় যুদ্ধ করে, ইমাম (শাসক, নেতা ও আমীর)-এর বিরোধিতা করে, দুনিয়ার বুকে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে তবে তার প্রাপ্য অংশ-টুকুও সে পাবে না।"[১]

এছাড়া আরও বহুবিধ কুরআনুল করীমের আয়াত ও অনেক হাদীছ এ অধ্যায়ে এসেছে যাতে ইমাম নিযুক্তি এবং তার আনুগত্যের ভেতর কোনই সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

এ জামা'আতের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা এটাই ছিলো যে, তা ইসলামের এমন একটা বড় রকমের রোকন যাকে মুসলমানেরা দীর্ঘকাল থেকে ভুলেই বসেছিলো—নতুন করে জন্ম দেয়।

১২৪২ হিজরীর ১২ই জমাদিউ'ছ-ছানীর বৃহস্পতিবার দিন ভারতবর্ষের নৈতিক পরিশুদ্ধি ও ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদের ইতিহাসের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন ছিলো যখন সাধারণ মুসলমান, 'উলামা ও মাশায়েখে কিরাম, উপজাতীয় খান ও সর্দার সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর হাতে ইমামতের বায়'আত গ্রহণ করে এবং ইসলামী শরী'আতের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে তাঁর সার্বিক আনুগত্য, সন্ধি ও যুদ্ধ প্রতিটি অবস্থায় তাঁর নির্দেশের সামনে মাথা পেতে দেওয়ার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয় এবং তাঁকে যথাযথ নিয়মে আমীর ও মুসলমানদের ইমাম হিসাবে মেনে নেওয়া হয়। দ্বিতীয় দিন (১৩ই জমাদিউচ্ছানী) সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর নামে জুম'আর খুতবা পাঠ করা হয়।

বায়'আতের পর তিনি ঘোষণা করেন যে, সমস্ত লোককে এখন থেকে শরীয়'আতের বিধি-বিধানের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য পোষণ করতে হবে। জাহিলী যুগের আচার-আচরণ ও প্রথা-পদ্ধতি এবং উপজাতীয়দের মধ্যে যে সমস্ত অনৈসলামিক রসম-রেওয়াজ ও আচার-অভ্যাস কোনরূপ সনদ ব্যতিরেকেই প্রচলিত হয়ে গেছে তা সমস্তই পরিত্যাগ করতে হবে যদিও এ ব্যাপারে তাকে

---

১. আহমদ ও নাসাঈ।

আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হয় এবং সেসব সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে হয় যা এতদিন গোত্রের সর্দারী, সমাজের নেতৃত্ব ইত্যাদির মাধ্যমে ভোগ করে আসছিলো, নিজের স্বার্থের পক্ষে এটা যতই কণ্টকর হোক না কেন, মুরীদ অনুরক্তদের জন্য তা যতই বিরক্তিকর ও গ্রহণ অনুপযোগীই হোক না কেন। ঠিক এমনিভাবে নিজের উপর, পরিবার-পরিজনের উপর অথবা খান্দানী ব্যাপার-স্যাপার, দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি সব ব্যাপারেই শরী'আতের বিধান কার্যকরী করতেই হবে। বায়'আতকারীরা সবাই এসব ব্যাপারে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে এবং শপথ গ্রহণ করে।

দেখতে না দেখতেই এ সংবাদ গোটা এলাকাতে ছড়িয়ে পড়ে এবং ওখানকার নেতৃস্থানীয় 'আলিম, সর্দার ও আমীর-ওমরা এবং ছোট -বড় সবাই সেখানে এসে সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর হাতে বায়'আত হয়। এতদ্সম্পর্কিত চিঠিপত্র পেশোয়ার, বাহাওয়ালপুর এবং চিত্রলের আমীর-ওমরা ও নওয়াবদের বরাবর পাঠানো হয়। তারা যেমনটি সমীচীন মনে করেছিলো ঠিক তেমনিভাবে পত্রের উত্তর প্রদান করে এবং এরূপ একটি পবিত্র পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রশংসা করে।

সৈয়দ সাহেব বিশেষ করে কিছু চিঠিপত্র ভারতবর্ষের 'উলামায়ে কিরাম, বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং আমীর-ওমরাদের উদ্দেশ্যে পাঠান। মুসলমানেরা আন্তরিকতা, ধর্মীয় আবেগ-উপলব্ধি ও দূরদর্শিতা মুতাবিক নিজেদের জীবনে এবং দেশের ভবিষ্যতের উপর এর গুরুত্বপূর্ণ ও সুদুরপ্রসারী প্রভাবকে সাধারণভাবে অনুভব করে। তারা অত্যন্ত আনন্দচিত্তে এর অভ্যর্থনা জানায় এবং খোশ আমদেদ বলে।

উৎকৃষ্টতম মওকা নষ্ট করা হয়েছিলো

হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর বায়'আতের খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি দূরদূরান্ত অবধি ছড়িয়ে পড়েছিলো। মানুষ পতঙ্গের মতো তাঁর চারপাশে জমায়েত হতে থাকে এবং বায়'আতকারীদের দলে প্রবেশ করতে থাকে। পেশোয়ারের আমীর-ওমরাগণ (যারা প্রাচীনকাল থেকেই 'লাভ ও ক্ষতি' এ দু'টো ভাষা ছাড়া আর কোন ভাষা বুঝতো না এবং প্রত্যেকটি ব্যাপারেই লাভ-লোকসানের তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ ও কার্যকরী উপকারিতা

যাচাই করার অভ্যাস ছিলো, যাদের সৌভাগ্য, শশী উঁচু থেকে উচ্চতর হতো--তাদের সহযোগিতা প্রদান করতো) এ দৃশ্য থেকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো যে, এই নবোত্থিত ও উদীয়মান শক্তি থেকে দূরে থেকে আপন পর্দার অন্তরালে জীবন যাপন করা তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে না। অন্য দিকে তাদের জন্য নিজেদের রাজ্য, জাঁকজমক ও গদী, খান্দানী জীবন-ধারা, উপজাতীয়---আচার-ব্যবহার ও প্রথা-প্রচলন থেকে সম্পর্কচ্যুত হওয়াটাও অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার ছিলো। এসব উপজাতীয় রীতিনীতিতে ইসলামী শরী'আত ও শরী'আতের 'উলামায়ে কিরামের কোনই কার্যকর ভূমিকা ছিলো না। এমনকি এর মধ্যে ধর্ম ও রাজনীতির জাহেলী এবং খৃস্টীয় ইউরোপের মূলনীতিই চলছিলো, আর তা হলো "আল্লাহর যা প্রাপ্য তা আল্লাহকে দাও এবং সীজারের যা প্রাপ্য তা সীজারকে দাও।" ধর্ম তাদের নিকট শুধুমাত্র 'ইবাদত-বন্দেগী ও কতকগুলি ফেকাহ ভিত্তিক মসলা-মাসায়েল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিলো। এ সবের ব্যাখ্যা ও শিক্ষাদান করাও সমস্ত মৌলভীদের দায়িত্বে ছিলো, যারা মসজিদের ইমাম ও মাদরাসাসমূহের শিক্ষক-মু'আল্লিম ছিলেন। এ সমস্ত মসলা-মাসায়েল ছাড়া আর যত অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিষয়াদি ছিলো, অধিকন্তু শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত অধিকার ও ক্ষমতা সবই আমীর-ওমরা ও সর্দারদের ইখতিয়ারাধীন ছিলো যা তাদের বাপ-দাদাদের আমল থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে চলে আসছিলো। তারা এসব ইখতিয়ার তলোয়ার ও বাহুবলের সাহায্যেই লাভ করেছিলো।

এ সমস্ত লোক অত্যন্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে সৈয়দ সাহেবের খেদমতে গিয়ে হাযির হয়। একদিকে ব্যক্তিগত লাভালাভ, মুনাফা, ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা, জাহিলী যুগের অভ্যাস ও উপজাতীয় রীতিনীতি যেমন ছিলো, তেমনি অন্যদিকে ছিলো এই নতুনতর শক্তি যার ভেতরে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দু'টো রং-ই বিরাজমান ছিলো এবং এর শক্তি প্রতিপত্তি ও খ্যাতি দিন দিন বেড়ে চলেছিলো। সাধারণভাবে সবাই ছিলো এর দিকে আকৃষ্ট ও ধাবমান। তারা দেখল যে, যদি তারা এমত সুযোগে যথাসম্ভব সত্বর অগ্রভিযানের দ্বারা কাজ আদায় করতে না পারে তবে জীবনের চলার পথের কাফেলায় পিছে পড়ে যাবেএবং বহু পেছনের কাতারে তাদের জায়গা মিলবে। তৃতীয়ত, এই চিন্তা তাদের মনে অনুক্ষণ জাগরূক ছিলো যে, এর ফলে

তাদের এবং রঞ্জিৎ সিংহের মধ্যকার বিরাজিত সৌহার্দ্যপূর্ণ ও সম্প্রীতি-মূলক সম্পর্কে তিক্ততা সৃষ্টি হবার আশংকা দেখা দিতে পারে।

শেষ পর্যন্ত তারা হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর সাহ-চর্যকেই অগ্রাধিকার দেয়। সৈয়দ সাহেবের নিকট সিম্মার[১] আমীরদের তরফ থেকে প্রেরিত সমর্থন ও সহযোগিতার আশ্বাসমূলক চিঠি-পত্র এসে গিয়েছিলো। এটা ছিল একটা আযাদ এলাকা। তারা রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াই থেকে অনেক দূরে ছিলো। তারা অনুভব করে যে, সম্ভবত এ পথেই তাদের উর্বর ও শস্য-শ্যামল এলাকাতেও হাত বাড়াবার ও ক্ষমতা সম্প্র-সারণের মওকা মিলতে পারে। হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর সঙ্গে ভাবী মুলাকাত, বিনম্র ব্যবহার ও আনুগত্যের ভেতর তাদের মধ্যে এরকম আবেগ ও প্রেরণাও ক্রিয়াশীল ছিলো। যাই হোক, এসব কিছুই সামনে রেখে সর্দার ইয়ার মুহাম্মদ খান, সর্দার সুলতান মুহাম্মদ খান এবং পীর মুহাম্মদ খান তিন ভাই নিজেদের সৈন্যবাহিনী ও গোলন্দাজ ইউনিটসহ নওশেহ্‌রা থেকে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত সরমাঈ নামক স্থানে এসে অবস্থান গ্রহণ করে। হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) এ সংবাদ অবগত হয়ে সেখানে তশরীফ নেন এবং সকলের নিকট থেকেই ইমামতের বায়‘আত গ্রহণ করেন।

এরপর মুজাহিদ বাহিনী উক্ত এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এসে জমা হতে শুরু করে। এমনকি এদের সংখ্যা আশি হাজার পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং ইসলামী সৈন্যবাহিনী শায়দূ[২] অভিমুখে রওয়ানা হয়। সেখানে পৌঁছুলে পেশোয়ারের আমীর-ওমরাদের বিশ হাজার সৈন্যবাহিনীও এর অন্তর্গত হয়ে যায়। ফলে মোট সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় একলাখ পর্যন্ত। অনেকদিন পর একটি পতাকাতলে ইসলামের এত বড় বিরাট সংখ্যক সৈন্যবাহিনী একত্রিত হয়েছিলো। যদি আল্লাহ্ পাকের মঞ্জুর হতো, আফ-গানদের ভাগ্যে তৌফিক জুটতো,—যদি তারা প্রকৃত ইসলাম ও মুসলমান-দের একনিষ্ঠ সেবক হতো—আমীর-ওমরাহদের মধ্যে পারস্পরিক কলহ ও মন কষাকষি না থাকতো এবং তারা যদি সময়ের গুরুত্ব ও নাযুকতা

---

১. সিম্মা—পেশোয়ার ও মর্দান জেলার মাঝখানে অবস্থিত। এ এলাকাতেই ইউসুফ-জাঈ গোত্রের বসতি ছিল। এখানে সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) অবস্থান করেছিলেন এবং এখানে তাঁর শুভানুধ্যায়ী সৃষ্টি হয়েছিলো।

২. শায়দূ আকুড়া থেকে চার মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত।

অনুভব করতে পারতো তবে একটি চূড়ান্ত ও ফয়সালামূলক যুদ্ধ খুব বেশী দূরে ছিলো না, যা ভারতবর্ষের ইসলামের ইতিহাসের ধারাকে একেবারে সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দিত। এজন্য একনিষ্ঠ ও উৎসর্গিতপ্রাণ মুজাহিদদের এ জামা'আতটি (যারা দীর্ঘ দিন পর মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে ময়দানে এসে দাঁড়িয়েছিল) ইসলাম ও মুসলমানদের অনুকূলে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বস্ত এবং আত্ম-কলহ ও আত্মপূজা তথা প্রবৃত্তি পূজার হাত থেকে মুক্ত ছিলো। এদের এমন একজন নেতা ও পথ প্রদর্শকের নেতৃত্ব ভাগ্যে জুটে ছিলো যাঁর ধর্মীয় উপলব্ধি ছিলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম, ইসলামী প্রভাব ছিলো সুদৃঢ় ও সাহসিকতাপূর্ণ। তাঁর মধ্যে ইমাম ও নেতা হবার মতো প্রয়োজনীয় সমস্ত গুণ ও যোগ্যতা পূর্ণতর ভাবেই বিদ্যমান ছিলো। তাঁর সকল কার্যকলাপ আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর বান্দা-দের সঙ্গে বিলকুল সাফ ও সকল প্রকারের ভেজাল থেকে পবিত্র ছিলো। অধিকন্তু সংবেদনশীল হৃদয়, সূক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন মস্তিষ্ক, সংযমী স্বভাব, শারীরিক শক্তি, বাহুবল সব কিছুই এ জামা'আতের লোকদের ছিলো এবং সকল শ্রেণীর মানুষই এর অন্তর্ভুক্ত ছিলো। অপর দিকে মুসলমানদের যিল্লতি চরম পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছেছিলো—এ কারণেই সবার দৃষ্টি এ জামা'আতের উপর নিবদ্ধ ছিলো। আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ ও প্রিয় বান্দা এবং গোটা ভারতবর্ষের নির্বাচিত শ্রদ্ধেয় উলামা ও মাশায়েখে কিরাম আল্লাহ তা'আলার দরবারে এদের কামিয়াবী ও বিজয় লাভের জন্য দোয়া ও প্রার্থনা-রত ছিলো। ঐতিহাসিক কলম থামিয়ে অপেক্ষা করছিলো যে, তাকে আমাদের সুপ্রাচীন ইতিহাসের একটি নয়া অধ্যায় হিসাবে লিখতে হবে এমন একটি সুপ্রাচীন ইতিহাস যার ব্যর্থতার তিক্ত আস্বাদ, বিশৃঙ্খলা, মতা-নৈক্য, মূল্যবান সুযোগের অপচয়, অকৃতজ্ঞতা ও অভদ্রতা, আমীর-ওমরা ও শাসকগোষ্ঠীর গাদ্দারী, মন্ত্রীদের অসাধুতা এবং বন্ধুদের অসৌজন্যতা ও বিশ্বাসঘাতকতার ভয়াবহ দৃশ্য বহুবার দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

আজকের এ ইতিহাস একটি নতুন ও আলোকোজ্জ্বল পাতা এবং বিজয় ও সৌভাগ্যের একটি নতুন অধ্যায় লিখবার মওকা দিতে পারবে কি!

কিন্তু নিতান্তই আফসোস ও পরিতাপের বিষয় যে, এ ইতিহাস নতুন পাতা উল্টোবার পরিবর্তে সত্য ও মিথ্যার এই নবতর যুদ্ধেও সে তার পুরনো পৃষ্ঠাগুলোই আর একবার উল্টালো মাত্র। যেমন মুজাহিদ বাহিনীর আমীরের খাবারের ভেতর বিষ মেশানো হলো যা তাঁর শরীর ও শিরা-

উপশিরার উপর গুরুতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তিনি বেহুঁশ ও অচৈ-তন্য হতে থাকেন বারবার। সে সময় যুদ্ধের ময়দানের কলকোলাহল ছিলো অত্যন্ত উত্তপ্ত ও উত্তুংগে আর উভয় পক্ষই কঠিন মহাসমরে তখন শক্তি পরীক্ষায় লিপ্ত। হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর কখনো বেহুশ ও অচৈতন্য অবস্থায় কাটছিলো, আবার কখনো বা সংজ্ঞা ফিরে পাচ্ছিলেন—ঠিক এমনি মুহূর্তে ইয়ার মুহাম্মদ খানের একটি পয়গাম (যার পেছনে আন্তরিকতা ছিলো না একবিন্দুও) এসে পৌঁছে যে, আপনি যুদ্ধের ময়দানে এসে শরীক হোন। আরোহণের জন্য একটি হাতীও সে পাঠিয়ে দেয় যার পা ছিলো খোঁড়া। উদ্দেশ্য ছিলো যেন সৈয়দ সাহেব শিখদের হাতে বন্দী হন এবং ময়দান তার জন্য পরিষ্কার হয়ে যায়। সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) এরূপ অবস্থাতেই হাতীর পিঠে সওয়ার হয়ে যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে হাযির হন। ইতিমধ্যে যুদ্ধের অবস্থা আরও ভয়া-বহ ও কঠিনতর রূপ পরিগ্রহ করে এবং যুদ্ধে বিজয়ের আলামতও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেউ কেউ তো হুশ ও বেহুশ অবস্থায় সৈয়দ সাহেবকে বিজয়ের সুসংবাদ পর্যন্ত দিয়ে দেয়।

এ যুদ্ধে পেশোয়ারের আমীর-ওমরা এবং তাদের সৈন্যবাহিনী অত্যন্ত ঠাণ্ডা মনোভাব ও নিস্পৃহ মানসিকতার পরিচয় দেয়। ইতিমধ্যে শিখ বাহিনী কর্তৃক নিক্ষিপ্ত কামানের একটি গোলা ইয়ার মুহাম্মদ খানের নিকটে এসে পড়ে। সে তক্ষুণি নিজের ঘোড়ার বাগডোর ঘুরিয়ে ধরে এবং যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যায়। এর সাথে সাথে তার সৈন্য-বাহিনীও পিছু হটে আসে এবং নিজেদের গন্তব্যস্থলে ফিরে যায়। পরিণতিতে যুদ্ধের সার্বিক চাপ ও ঝুঁকির সবটাই মুজাহিদ বাহিনীর কাঁধে এসে পড়ে। মুজাহিদ বাহিনী সব কিছু সত্ত্বেও অত্যন্ত বীরত্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে দুশমনের মুকাবিলায় অটল ও অনড় থাকে।

হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর অসুস্থতা দীর্ঘস্থায়ী হতে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ পাক মুসলমানদের কল্যাণই মঞ্জুর করেছিলেন। কেননা তখন পর্যন্তও সৈয়দ সাহেবের দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের খেদমত ও পথ প্রদর্শনের কাজ বাকী ছিলো। তাঁর বারবার বমি আসছিলো এবং প্রতি বারেই বমির সাথে কিছু না কিছু পরিমাণ বিষ নির্গত হচ্ছিলো। সৈন্যবাহিনীর দূরদর্শী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গ সমীচীন মনে করেন যে, মুজাহিদ

বাহিনী কোন সুরক্ষিত ও মযবুত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করুক। পরে যখন বিক্ষিপ্ততা ও সাধারণ বিশৃঙ্খল অবস্থা দূরীভূত হয়ে যাবে এবং হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর শারীরিক সুস্থতাও ফিরে আসবে তখন পুনরায় হামলা পরিচালনা করা হবে। অপর দিকে শিখেরা পেশোয়ারের আমীর-ওমরাদের সঙ্গে চক্রান্তে লিপ্ত হয় যাতে কোন রকমে সৈয়দ সাহেবকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়। কিন্তু একনিষ্ঠ ভক্ত ও অনুরক্ত এবং বিচক্ষণ মাহুত ব্যাপারটা আঁচ করতে পারে এবং সৈয়দ সাহেবকে পরামর্শ দেয় তিনি যেন আপাতত এ স্থান ত্যাগ করেন। সেজন্য কিছু সংখ্যক মুজাহিদ হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-কে নিয়ে নিকটবর্তী এক পাহাড়ের আড়ালে অবস্থান গ্রহণ করে। সাধারণভাবে মুজাহিদ বাহিনী যাদের অধিকাংশই ছিলো আহত, নিকটবর্তী পল্লী অঞ্চলে গিয়ে উপস্থিত হয় যেখানে তাদের আহত স্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ও শ্বাস ফেলার অবকাশ মেলে। সেখানকার মুসলমানেরা পরিপূর্ণ আন্তরিকতা ও উষ্ণ সমাদরের সাথে খোশ আমদেদ জানায় এবং এদের মেহমানদারী ও খাতির-যত্নের কোনরূপ ত্রুটিই করেনি। এরপর সৈয়দ সাহেব সেখানে তশরীফ রাখেন। তাঁর সাক্ষাত লাভে ঐ সমস্ত লোকের চোখ জুড়িয়ে যায়। সবাই বেরেলভী (র)-এর শারীরিক সুস্থতা ও কুশলতা দৃষ্টে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে।

সমস্ত লোকজন একত্রে জমায়েত হ'লে তাদের লক্ষ্য করে সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) বললেন, "এই যে যা কিছু আমাদের উপর এবং আমাদের ভাইদের উপর দিয়ে ঘটে গেলো এটা তারই বদলা ও বিনিময় যে সমস্ত অন্যায়-অপরাধ ও বেয়াদবী আমাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। আল্লাহ্র তরফ থেকে এটাও ছিলো একটি পরীক্ষা। আল্লাহ্ পাক এমনি ধরনের পরীক্ষার মুহূর্তগুলোতে আমাদের ও আমাদের মুজাহিদবৃন্দকে যেন অটল ও অনড় রাখেন এবং আমাদের তকলীফকে তিনি যেন আরাম ও শান্তির উপকরণ বানিয়ে দেন। ঐ সমস্ত লোকের বিষ-প্রয়োগও আল্লাহ্ পাক আহ্কামু'ল-হাকিমীনের হেকমত বহির্ভূত নয়। এর দ্বারা রসূল করীম (স)-এর একটি সুন্নতও তো আমাদের দ্বারা পালিত হলো।" এরপর তিনি খালি মাথায় আল্লাহ্ রব্বু'ল-'আলামীনের দরবারে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে করজোড়ে দো'আ করতে থাকেন, "ইলাহী! আমরা তোমার বান্দাহ সবাই বিনীত, লাচার, দুর্বল ও অসহায় এবং তুমি ব্যতিরেকে আমাদের কোন

সাহায্যদাতা ও সহযোগিতাকারীও নেই। আমরা কেবল তোমারই দয়া ও করুণা-ভিখারী। আমরা তোমার পরীক্ষার উপযুক্ত কেউ নই। আমাদের অন্যায় ও অপরাধগুলো তুমি ধরো না —মা'বূদ! তুমি নিজ রহমতে আশীষ-ধারা বর্ষণে সেগুলি মাফ করে দাও এবং আমাদেরকে তোমারই মনোনীত সিরাতু'ল-মুস্তাকীমের উপর সুদৃঢ় রাখো; আর যারা তোমার সহজ সরল রাস্তার বিরোধী, তুমি তাদের হিদায়াত করো।" এই ধরনের শব্দগুলি তিনি বারবার উচ্চারণ করতে থাকেন আর লোকেরা আমীন, আমীন বলতে থাকে। দো'আর পর তিনি সবাইকে এই বলে সান্ত্বনা ও আশ্বাস-বাক্য শোনান যে, ভাইয়েরা! ঘাবড়াবেন না, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর সদয় হবেন ও তোমাদের অনুগৃহীত করবেন।

পরে জানা গেলো যে, এসবই ইয়ার মুহাম্মদ খানের চক্রান্ত ছিলো যা সে রঞ্জিৎ সিংহকে খুশী করবার জন্য সৃষ্টি করেছিলো।[১]

এই আনন্দজনক বার্তাটি লাহোর রাজ-দরবারে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে শোনা হয়। লাহোর হুকূমত এই গোটা সময়টাই অত্যন্ত চিন্তা ও উদ্বেগের ভেতর কাটায় যে, এই ফয়সালামূলক যুদ্ধের (যা দেশের গোটা ইতিহাসের গতিধারা পাল্টে দেবার জন্য যথেষ্ট ছিলো) ফলাফল কি হতে পারে। লাহোরের শাসকমণ্ডলী যখন এই সুসংবাদ শোনে যে, পেশোয়ারের অকৃত্রিম ভক্ত ও বন্ধুরা তাদেরকে যুদ্ধে পরাজয়ের লজ্জা ও গ্লানির হাত থেকে বাঁচিয়েছে এবং একটি বিরাট শক্তিশালী ও দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করবার প্রয়োজনীয়তা আর অবশিষ্ট নেই যা বেশ দীর্ঘকাল থেকে চূড়ান্ত শক্তি পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছিলো---তখন তাদের আনন্দ ও খুশীর আর সীমা-পরিসীমা রইলো না। ফলে এতদুপলক্ষে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান করা হয়। তোপধ্বনি করা হয়, দোকান-পাট আলোকমালাসহ বিভিন্নভাবে সজ্জিত করা হয়, মহারাজা সাধারণ উৎসবের ঘোষণা দেন এবং আনন্দের অভিব্যক্তিস্বরূপ বিপুল অর্থ-কড়ি দীন-দুঃখীদের ভেতর বিতরণ করা হয়।[২]

---

১. এ যুগের একজন হিন্দু ঐতিহাসিক লালা মোহনলাল স্বীয় গ্রন্থ "উমদাতু'ত্তাওয়ারীখ" এ লিখেছেন যে, এই গোটা এলাকাতেই এটা সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ যে, ইয়ার মুহাম্মদ খান সৈয়দ সাহেবের খাবারে বিষ মিশিয়েছিলো এবং এরপর সৈন্যবাহিনীসহ সেখান থেকে পালিয়েছিলো আর তা এ জন্য যে, তার ও রনজিত সিংহের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিলো।

২. দেওয়ান অমরনাথ প্রণীত 'জফরনামা,' পৃষ্ঠা—১৮১;

কিন্তু এতসব কিছু সত্ত্বেও হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর প্রস্তরসম সুদৃঢ় ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোন দুর্বলতা কিংবা ফাটল দেখা দেয়নি। তিনি নবতর আবেগ ও অনুপ্রেরণা এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে জিহাদের দাওয়াত দেওয়া শুরু করেন। বুনীর এবং সোয়াত এলাকাতে (যা ভৌগোলিক দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সেখানে যুদ্ধ-বাজ বহু আফগান উপজাতির আবাস ছিলো) দীর্ঘ তবলীগী এবং নৈতিক ও আত্মিক পরিশুদ্ধিমূলক সফর শুরু করেন। গ্রাম ও পল্লীতে কয়েক দিন এমনকি কয়েক সপ্তাহ ধরে তিনি অবস্থান করেন। সেখানকার 'উলামায়ে কিরাম ও বুযুর্গ ব্যক্তিদের সাথে মিলে একত্র হয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ঈমানের চাপা পড়া ফুলকিতে অগ্নি প্রজ্বলিত করতে এবং ধর্মীয় সম্ভ্রমবোধ, আবেগ অনুপ্রেরণা, সঠিক চেতনা ও উপলব্ধি সৃষ্টির প্রয়াস চালান।

এ সময়েই ভারতবর্ষ থেকে মুজাহিদদের বিরাট বিরাট জামা'আত এসে হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর সঙ্গে মিলিত হয়। এদের মধ্যে বড় বড় 'উলামায়ে কিরাম, রণনিপুণ, অভিজ্ঞ ও উৎসাহী সৈনিক, আবেগ-উদ্দীপ্ত, অত্যুৎসাহী দৃঢ়চেতা যুবক অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এ সময়ে তিনি চিত্র-লের শাসনকর্তার নিকট বহু হাদিয়া-তোহফাসহ একটি প্রতিনিধি দল পাঠান এবং তাকে জিহাদে শরীক হওয়া ও মুজাহিদ বাহিনীকে সাহায্য করার আহবান জানান।

এ সফরে যে সমস্ত লোক হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর সাথে এসে শামিল হয় তাদের মধ্যে মওলানা 'আবদুল হাই এবং শেখ কলন্দরও ছিলেন। তাঁদের সাথে ছিলো আশিজন মুজাহিদের একটি কাফেলা। শেখ রমযান সাহারানপুরীর সঙ্গে ১০০ জন, শেখ আহমদ উল্লাহ্র সঙ্গে প্রায় ৭০ জনের কাছাকাছি এবং শেখ মুকীম রামপুরীর সঙ্গে চল্লিশ জনের মতো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অস্ত্রসজ্জিত যুবক ছিলো। তারা যুদ্ধ বিষয়ে এবং সৈনিক বৃত্তিতে অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও নিপুণ ছিলো। পবিত্র এ সফরে হাজার হাজার লোকজন তাঁর পবিত্র হাতে তওবাহ করে এবং জিহাদের বায়'আত নেয়, বিরাট সংখ্যক মানুষের জীবনে নৈতিক ও চারিত্রিক শুদ্ধি ও সংস্কার সাধিত হয়, পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ভাই ও পরিবারের ভেতর সংযোগ স্থাপিত হয় এবং গালাগালি গলাগলিতে রূপ নেয়।

তিন মাসের এই সফরের পর বহু নতুন মানুষ তাঁর মিশনের কর্মী হিসেবে শরীক হয়। বড় বড় জামা'আত বায়'আত হয়। তিনি পাঞ্জেতারে

ফিরে আসেন যা সোয়াত সীমান্তের উপর অবস্থিত এবং এর তিন দিকেই পাহাড় বেষ্টিত; ফলে এটি একটি মযবুত ও সুরক্ষিত দুর্গের রূপ পরিগ্রহ করে। সর্দার ফতেহ খান সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর হাতে বায়'আত হয়েছিলেন যিনি ছিলেন খদওখিল উপজাতির সর্দার। তিনি তাঁকে এখানেই অবস্থান করতে এবং একে মুজাহিদ বাহিনীর স্বীয় ছাউনী ও কেন্দ্র বানাবার দাওয়াত দেন। সৈয়দ সাহেব উক্ত দরখাস্ত কবূল করেন এবং সোয়াত ও বুনীর থেকে ফেরার পর একেই স্থায়ী আবাসে পরিণত করেন।

ইসলামী সৈন্যবাহিনীর রাতদিন

পাঞ্জেতারে মুজাহিদ বাহিনী বহুকাল পর একটি স্থায়ী আবাস লাভ করে। তাদের অনবরত চলাচল এবং দীর্ঘ রাস্তা অতিক্রমের ফলে কিছু নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ মেলে, শান্তি ও নিরাপত্তার স্বাদের সাথে পরিচয় ঘটে এবং এ সুযোগে ইসলামী 'আমল ও আখলাক যার প্রশিক্ষণ কঠিন থেকে কঠিনতর মুহূর্তেও দেওয়া হয়েছিলো—পুরো জোরেশোরে শুরু হয়। পাহাড়-পর্বত ঘেরা প্রত্যন্ত কোণ পুরোপুরি কমনীয় রূপ ধারণ করে সামনে আসে। এটা ছিলো সেই জীবন যার ভেতর 'জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ'র সাথে সাথে 'ইবাদত ও মুজাহাদা, 'যুহ্‌দ' ও সাধনার সাথে ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য, খিদমত ও সহমর্মিতা এবং আত্মত্যাগ ও সমবেদনা একত্রিত হয়েছিলো। তারা ছিলো দুশমনদের প্রতি রুক্ষ ও দুর্দমনীয় কঠোর অথচ বন্ধু-বান্ধব ও আপন ভাইয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উদারচিত্ত ও সংবেদনশীল; রাতের বেলায় 'ইবাদত গোযার---অথচ দিনের আলোয় ঘোড়সওয়ার; নরম ও দ্রবীভূত অন্তঃকরণ এবং বিনয়ের সাথে সাথেই আত্মজয়ী তথা সংযম ও আত্মশাসনে বিজয়ী বীরের এমনি এক অপূর্ব সম্মিলন ও সংমিশ্রণ এবং ইসলামী সমাজ জীবনের এমনি এক জীবন্ত ও গতিশীল ছবি—ইতিহাস দীর্ঘকাল পর যা দেখেছিলো।

এ জীবন ও যিন্দেগী দু'টি সুপ্রাচীন ইসলামী বুনিয়াদের উপর স্থাপিত হয়েছিলো, যার উপর কায়েম করা হয়েছিলো রসূলে মদীনা (স')-এর ইসলামী সমাজ। ইসলামের ইতিহাসে মানবতার চিকিৎসা ও পথ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এ দু'টি বিষয়ের বিরাট হিস্যা রয়েছে। এর মধ্যে প্রথমটি ছিলো হিজরত এবং অপরটি নুসরত (সাহায্য)। মুসলমানরা দু'ভাগে বিভক্ত ছিলো। প্রথমত, যেসব মুহাজির ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আল্লাহর রাস্তায়

হিজরত করেছিলো ; দ্বিতীয়ত, আনসার যারা প্রাচীন অধিবাসী---মুহাজির-দের সাথে যাদের অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছিলো। ইসলামী ভ্রাতৃত্বের প্রাচীন ও সুগভীর সম্পর্ক ছিলো এর বাইরে। মুহাজিরদের মোট সংখ্যা সাকুল্যে এক হাজার ছিলো। তার ভেতর তিনশো সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর সঙ্গে পাঞ্জেতারে থেকে যায় এবং বাদবাকী সাতশো নিকটবর্তী স্থানগুলোতে ও পল্লীতে ছড়িয়ে পড়ে। এরা অত্যন্ত নিকটেই ছিলো। একই শহরের বিভিন্ন মহল্লায় যেভাবে অবস্থান করা হয় তেমনি তারা একে অপরের সাথে মিলেমিশে ছিলো। খাদ্য-দ্রব্যাদি ও জরুরী অন্যান্য সামান-আসবাব যেমন কাপড় ইত্যাদি---তাদের সবাইকে বায়তু'ল-মাল থেকে দেওয়া হ'তো। আর এটা হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) শরী-'আতের মূলনীতির উপর কায়েম করেছিলেন।

ইসলামের এই নতুন বসতিতে জীবন যাপন ব্যবস্থা, খাওয়া-পরা ইত্যাদি একটা ভারসাম্যমূলক ব্যবস্থার উপর কায়েম ছিলো। এখানে খানাপিনা ও আরাম-আয়েশের খুব বেশী ইন্তেজাম ছিলো না। মুহাজিরদের মধ্যে যারা এখানে এসেছিলেন--নিজেদের বাড়ী-ঘরে তাদের আরাম-আয়েশের পুরো সাজ-সরঞ্জাম ও উপায়-উপকরণ মওজুদ ছিলো। কিন্তু তারা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে সে সব ছেড়ে এখানে এসেছিলো।[১] তাদের সামনে আল্লাহ্ তা'আলার সুস্পষ্ট ফরমান ছিলো ঃ

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ
وَلَا يَطَـُٔونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ
لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ط إِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ -

"কারণ আল্লাহ্‌র পথে উহাদিগের তৃষ্ণা ক্লান্তি এবং ক্ষুধায় ক্লিষ্ট হওয়া এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগের ক্রোধ উদ্রেক করে এমন স্থানে পদক্ষেপ করা এবং শত্রুদিগের নিকট হইতে কিছু লাভ করা উহাদিগের

১. এ তথ্য মওলানা 'আবদুল হাই (র)-এর একটি চিঠি থেকে নেওয়া হয়েছে। তিনি সীমান্ত থেকে নিজের কোন এক বন্ধুকে লিখেছিলেন।

সৎকর্মরূপে গণ্য হয়। আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদিগের শ্রমফল নষ্ট করেন না।" (সূরা তওবাহ্, ১২০ আয়াত)

হযরত রসূল আকরাম (স·)-এর নির্দেশও তাদের সামনে ছিলো যে, আদম বংশধর নিজেদের পেট অপেক্ষা বড় কোন পাত্র কখনও ভরেনি। আদম বংশধরের কোমর খাড়া রাখার জন্য কয়েক লোকমাই যথেষ্ট। যদি এতে না হয় তবে অন্তত এক-তৃতীয়াংশ খাবার জন্য,--এক-তৃতীয়াংশ পান করার জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের জন্য খালি রেখে দেবে।[১]

এ জীবন-ধারায় তাদের নেতা ও ইমাম তাদেরই সঙ্গে শরীক ছিলেন। যখন তারা ক্ষুধার্ত--সৈয়দ সাহেবও ক্ষুধার্ত,---তারা যখন খায়---সৈয়দ সাহেবও তখনই খান। স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ যারা তাদেরকে নিজেদের এখানে জায়গা দিয়েছিলো এবং থাকতে দিয়েছিলো তারা কেউই নওয়াব কিংবা আমীর-ওমরা ছিলেন না; বরং তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলো মামুলী কৃষিজীবী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। এদের সাধ্য মাফিক মুহাজিরদের তত্ত্ব-তালাশ নেওয়া এবং সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশে কোন ঘাটতি ছিলো না।

মুহাজিরদের জীবন-যাপন পদ্ধতি ছিলো নিতান্তই সাদা-সিধে ধরনের এবং স্বাভাবিক যা না হলেই নয়। এর ভেতর কোন চাকচিক্য কিংবা কৃত্রিমতা ছিলো না। গর্ব ও অহমিকা এবং জাহেলী যুগের আচার-অভ্যাস ও প্রথা-পদ্ধতি যা মুসলমানদের ভেতর মুসলিম শাসনামলে কৃত্রিম সংস্কৃতির কারণে অনুপ্রবেশ করেছিলো—যেমন, জাহেলী তথা অন্ধ অহমিকা, পেশা ও বৃত্তির ক্ষেত্রে অবজ্ঞা ও পার্থক্য এবং এরই কারণে কাউকে হেয় ও অবজ্ঞেয় মনে করা, দরিদ্রদের কাজে-কর্মে ঘৃণা প্রকাশ করা (এসব কিছুই ছিলো না)। এগুলোর পরিবর্তে এখন প্রত্যেকেই একে অপরের খিদমতে আগ্রহান্বিত ও লালায়িত এবং সদা প্রস্তুত; পরস্পরের প্রয়োজন পূরণে সদা আগ্রহী। প্রয়োজন দেখা দিতেই একে অপরের ক্ষৌরকর্মে দৌড়ে যায়,--কাপড় ধোয়, যাতায় ময়দা পেষে,--রান্না করে,---খড়ি ফাড়ে,--পশুর আহার্য তৈরী করে,--- অশ্ব মর্দন করে,---রোগীর সেবা করে, ঝাড়ু দেয় ও আবর্জনা পরিষ্কার করে। কোন ভাইয়ের সেলাই করা কিংবা জুতোয় তালি

---

১. তিরমিযী;

দেবার প্রয়োজন হলে তারা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে বিনা পারিশ্রমিকেই করে দেয়। সবাই মিলে মাটিতেই শোয়,—সকল প্রকার পরিশ্রম ও আয়াস-সাধ্য কাজ-কর্ম বরদাশ্‌ত করে,—অনুচিত, অশোভন ও অসৌজন্যমূলক কথাবার্তা যথা-সাধ্য এড়িয়ে চলে। পর-নিন্দা, চোগলখুরী, হিংসা-বিদ্বেষ, কলহ-বিবাদ থেকে তারা দূরে থাকতো, এদের একের অন্তর অপরের সাথে সংযুক্ত,—আল্লাহ্‌র রাস্তায় প্রেম ও বন্ধুত্ব এদের পরিচয়-চিহ্ন। এদের মধ্যে এমন লোকও বর্তমান ছিলেন যিনি সম্পদ ও প্রাচুর্যে প্রতিপালিত এবং আরাম-আয়েশপ্রিয় ছিলেন,—খাদিম ও ভৃত্য যার আগে পিছে সদা ধাবমান থাকত; এদের পিতা-মাতার জৌলুস ও অপত্য স্নেহ এবং ভক্ত-অনুরক্ত ও বন্ধু-বান্ধবের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা-ভক্তি সব কিছুই ছিলো। কিন্তু এখানে তারাই নিজের অন্যান্য ভাইদের সঙ্গে সুখে-দুঃখে, অভাব ও প্রাচুর্যে এবং খেদমত ও মেহনত তথা প্রতিটি কর্মেই সমান অংশীদার।

এরপর ভারতবর্ষ থেকে যে সমস্ত কাফেলা ও প্রতিনিধি দল এসে-ছিলো—তারা এ ধরনের জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলো না। তাদের তেতর এ জাতীয় মহৎ কার্যকলাপ ও ইসলামী আখলাক পুরোপুরি সৃষ্টিও হয়নি; কোন আমীর কিংবা মুরুব্বীর সাহচর্য ও সান্নিধ্য এবং এ জাতীয় বাস্তব প্রশিক্ষণও তারা লাভ করতে পারেনি—সেজন্য তাদের মধ্যে কতক লোকের এ জাতীয় কাজে কিছু লজ্জা ও গ্লানি অনুভূত হয়। তারা বললো, এগুলি তো নীচু শ্রেণীর ও শিক্ষানবীশী পেশায় লিপ্ত শ্রেণীর কাজ, আশরাফ এবং উঁচু খান্দান ও বংশের লোকদের জন্য এটা কোনভাবেই সমীচীন নয়। হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এরও তাদের কথায় এটা আন্দাজ হয়ে গিয়েছিলো। এটাই তাঁর নিয়ম ছিলো যে, কখনও কিছু বলতে চাইলে কিংবা কাউকে নসীহত কিংবা সতর্ক করাত্ত হলে তাকে তিনি তখনি সরাসরিভাবে সম্বোধন করতেন না যাতে তাকে লজ্জিত হতে হয়; বরং সাধারণভাবে কথা বলতেন। দৃষ্টান্ত ও অনুরূপ কাহিনীর অবতারণা করে তাকে বোঝাতে চাইতেন। অতঃপর একবার কোন এক মওকাতে একটি দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বলেন,—"জনৈক মহিলার স্বামী মারা গেছে। মহিলার অনেকগুলো ছোট বাচ্চা। স্বামীটি ধন-দৌলত কিছুই রেখে যায়নি। মহিলা বেচারী চরখা কাটে, গম পেষে, সেলাই করে ও সকল ধরনের মেহনত-মজদূরী যা জোটে করে থাকে এবং এভাবেই বাচ্চাদের লালন-পালন করে শুধুমাত্র এই আশায় যে, এরা

প্রতিপালিত হয়ে একদিন যৌবনের সিড়িতে পা রাখবে,—চাকরী-বাকরী করে বার্ধক্যে আমাকে আহার যোগাবে ; খেদমত করবে।

"আমার বার্ধক্য আরাম-আয়েশে কাটবে—তার এই আশা কল্পনা মাত্র, নিশ্চিত নয়। যদি তার বাচ্চা বেঁচে থাকে, উপযুক্ত ও সৎকর্মশীল হয়, নিজের মা'য়ের হক সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে সক্ষম হয় তবেই শুধু তার আশা পূরণ হয়। আর সে যদি হয় অকর্মা ও অপদার্থ তবে মহিলা ধুকে ধুকে মরবে। এখানেও আমাদের যে সমস্ত ভাই শুধুমাত্র আল্লাহরই উদ্দেশ্যে খাস নিয়তে যাতা ঘুরিয়ে গম পেষে. রান্না-বাড়া করে, খড়ি ফাড়ে, ঘাস কাটে, অশ্ব মর্দন করে, কাপড় সেলাই করে, নিজের হাতে কাপড় ধোয় এবং এ-ধরনেরই সব কাজকর্ম করে—তা সবই আল্লাহ্‌র 'ইবাদ-তের অন্তর্ভুক্ত। সব কিছুই হযরত নবী করীম (স') এবং সাহাবায়ে কিরাম থেকে প্রমাণিত। আল্লাহ্ তা'আলার সকল আওলিয়ায়ে কেরাম (র') আজ পর্যন্ত এ-ধরনের কাজই করে এসেছেন শরীয়ত মাফিক ; সুতরাং অন্য কারো করতেও লজ্জা বা গ্লানির কিছু নেই। এ সকল কাজের বিনি-ময় আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রসূল (স')-এর ইরশাদ মুতাবিক আল্লাহ্‌র ওখানেই মিলবে সুনিশ্চিতভাবেই। সকল ভাইয়ের উচিত এসকল কাজ যেন তারা গর্ব সম্মান এবং উভয় জগতের পরম সৌভাগ্য মনে করে বিনা তর্কে ও বিনা গ্লানি ও লজ্জায় করে। আ মাদের ঈমানদার সকল মুসলমান ভাই আপন আপন ঘর-বাড়ী, আত্মীয়-পরিজন, সুনাম-সুখ্যাতি, আরাম-আয়েশ সব কিছু ছেড়ে-ছুড়ে শুধুমাত্র আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রসূলের সন্তুষ্টি হাসি-লের জন্যই এখানে এসেছে। আমাদের জন্য দুষ্প্রাপ্য মনি-মুক্তা ও দুর্লভ মোতির টুকরো—শত শত নয়—হাজার হাজার ছিটকে এসে পড়েছে। তাদের সম্মান ও মর্যাদা আমরা জানি, সবাই তা জানে না।"

এ-ধরনের ব্যাপক অর্থবহ ও জোরালো বক্তৃতা এবং অলংকার-ধর্মী ও যুক্তিপূর্ণ বর্ণনার প্রভাব এমন হ'তো যে, শ্রোতাদের অন্তর মানস আপনা-আপনিই নরম ও বিগলিত হয়ে যেতো, সকল প্যাঁচ-গিরা যেতো ঢিলা হয়ে ; ঈমানী রঙে রঞ্জিত হ'তো সবার দেহ মন এবং তারা অনুভব করতো যে, এরূপ আখলাক ও কার্যকলাপের উপর আমল এবং এতে নিজ বন্ধু-বান্ধবের সাহচর্যে তাদের জন্য অত্যন্ত সহজ হবে।

হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) উল্লিখিত সকল কাজে কর্মেই সঙ্গী-

সাথীদের সহযোগী হতেন। একবার তিনি দেখতে পান যে, শেখ ইলাহী বখ্‌শ রামপুরী গম পিষছেন। তিনিও পাশে বসে তাকে তার কাজে সহযোগিতা করতে থাকেন এবং বলেন যে, আমি মক্কা মুকাররামাতে গম পিষতাম। আমি চাই যে, এখানেও তার অনুশীলন অব্যাহত থাকুক। এ খবর দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক লোক দেখতে সমবেত হয়। গম পেষাকে যারা লজ্জা ও গ্লানিকর বলে মনে করতো তারাও এ দৃশ্যে অভিভূত হয়ে পড়ে এবং এটাকে 'ইযযত ও গর্বের বিষয় মনে করতে থাকে। কোন সময় জ্বালানী কাঠ ফুরিয়ে গেলে তিনি কুড়ুল চেয়ে নিতেন এবং জঙ্গলের দিকে রওয়ানা দিতেন। এই দৃশ্য দেখে অন্যেরাও কুড়ুল হাতে পিছু অনুসরণ করতো। দ্রুত এ সংবাদ সৈন্যবাহিনীর ভেতর ছড়িয়ে পড়তো। ফলে যে যেখানেই পেতো কুড়ুল হাতে আমীরের অনুসরণে লিপ্ত হ'তো এবং দেখতে না দেখতেই জ্বালানী কাঠের পাহাড় জমে যেতো।

একবার লোকেরা অভিযোগ করে যে, সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে কংকর ও নুড়িপাথর কষ্টের কারণ হয়। তিনি নির্দেশ দেন যেন মাদুর ও চাটাই জমা করা হয়। আরো বলেন যে, আগামীকাল জঙ্গলে যাবো এবং ঘাস কেটে এনে এখানে বিছিয়ে দেবো। পর দিন তাই করা হলো এবং ঘাসের ফরাশ তৈরী করা হলো।

একবার কতকগুলো লোক অভিযোগ করলো যে, তাঁবুতে রৌদ্রের হাত থেকে বাঁচবার তেমন কোন ব্যবস্থা নেই; ফলে খুবই তকলীফ সহ্য করতে হয়। তিনি চাটাই জমা করান এবং পরদিন ময়দান থেকে শুকনো ঘাস ও খড় কাটিয়ে চালা তৈরী করে অত্যন্ত সুদৃশ্য থাকার কামরা নির্মাণ করেন। সৈন্যবাহিনী এটা দেখে নিজেরা খড়ের বেড়া ও কাঠের সাহায্যে নিজেদের ছোট ছোট বাড়ী-ঘর বানিয়ে ফেলে, এর ফলে রৌদ্রের তীব্রতা এবং বৃষ্টি ও ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচার বেশ খানিকটা সুরাহা হয়ে যায়।

সৈন্যবাহিনীতে পানির ঘাটতি দেখা দিলে তিনি মশক নিয়ে পানির খোঁজে বের হতেন। তাঁকে এভাবে দেখামাত্রই সবাই পানির মশক ও ঘড়া কাঁধে উঠিয়ে নিতো। ফলে গোটা বাহিনীর প্রয়োজনীয় পানির ব্যবস্থা হয়ে যেতো। অধিকাংশ সময়েই তিনি নদীর ধারে ভারী ভারী পাথর মসজিদের ফরাশ নির্মাণের জন্য বয়ে আনতেন, যা সৈন্যবাহিনীর বড় বড় শক্তিশালী ও বাহাদুর পুরুষও খুব বেশী সহজে উঠিয়ে আনতে পারতো না।

মওলানা মুহাম্মদ ইসমা'ঈল (র)-এর অনুরূপ ভূমিকা ছিলো। তিনি এ জাতীয় কঠিন পরিশ্রম ও কল্যাণজনক কাজে সকলের আগে থাকতে চেষ্টা করতেন। মুজাহিদ বাহিনীর সকল কাজেই শরীক থাকতেন এবং কোন সুযোগেই তাদের থেকে স্বতন্ত্র ও বিখ্যাত হবার চেষ্টা করতেন না।

এর ফলাফল হয়েছিলো, মুসলিম সৈন্যবাহিনীতে খেদমত, সাম্য ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের এক ঢেউ বয়ে যায়। লোকেরা একে অপরের আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করতে পরস্পর পরস্পরকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতো এবং কারো কাজে সামান্যতম সাহায্য ও সহযোগিতা করতে পারলে নিজেকে সম্মানিত, গর্বিত ও আনন্দিত মনে করতো। মুজাহিদ বাহিনীর এ জামা'আতটির মহৎ কার্যকলাপ ও চারিত্রিক ব্যবহার, সংবেদনশীল মান-সিকতা, সাম্য, সত্যিকার ভ্রাতৃত্ব, কুরবানী ও আত্মোৎসর্গী মনোভাব, প্রবৃত্তির তথা কামনা-বাসনার বিরোধিতা, আমানতদারী ও পবিত্র জীবন যাপন, শরীয়ত নির্দেশিত বিধি-বিধানের সামনে পরিপূর্ণ অবনত মস্তক হওয়া এবং আত্মসমর্পিত চিত্ততার বহুল ও বিস্ময়কর ঘটনাবলী ঐতিহাসিকগণ সুরক্ষিত করে দিয়েছেন এবং তারই দু'চারটি আলোকবিম্ব সামনের পৃষ্ঠা-গুলোতে পেশ করা হচ্ছে।

মার্জনাকারী

লাহোরী নামের জনৈক খাদেম ছিলো অত্যন্ত সাদা-সিধে ও গরীব। একবার তাকে শেখ 'ইনায়েতুল্লাহর সঙ্গে ঘোড়ার খাবার তৈরী করতে দেওয়া হয়। তাঁর কোন কথায় লাহোরী অসন্তুষ্ট হয়। 'ইনায়েতুল্লাহ্ খান হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর বহু পুরনো বন্ধুদের অন্যতম ছিলেন এবং সৈয়দ সাহেবের নিকট তাঁর বিশেষ মর্যাদাও ছিলো। শেখ 'ইনায়ে-তুল্লাহ্ খানও বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তর্ক-বিতর্কের এক পর্যায়ে তিনি লাহোরীকে একটা ঘুষি মারেন। সে মাটিতে হুমড়ী খেয়ে পড়ে যায় এবং যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে। সৈয়দ সাহেব এটা জানতে পেরে 'ইনা-য়েতুল্লাহ্ খানকে অত্যন্ত তীব্রভাবে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করেন এবং বলেন যে, হয়তো তুমি অন্তর থেকেই জানতে যে, আমি সৈয়দ সাহেবের বহু পুরনো বন্ধু। তাঁর পালংয়ের পাশেই থাকি। তুমি কল্পনা করনি যে, আমরা আল্লাহর জন্যই এখানে এসেছি আর এত নিকৃষ্ট কাজ তুমি করেছো! তুমি মনে করেছো যে, লাহোরী কাযী মাদানীর ঘোড়ার সহিস, কম

মর্যাদাসম্পন্ন ও ছোট জাতের লোক। এটা জেনেই তুমি তাকে মেরেছো। এটা তুমি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেছো আর এটা অযথা আচরণ করেছো। আমাদের নিকট তুমি এবং লাহোরী বরং সবাই সমান। কারোর উপরই কারো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। সবাই আল্লাহর ওয়াস্তেই এখানে এসেছে।

এরপর তিনি হাফিজ সাবির থানভী এবং শরফুদ্দীন বাঙ্গালীকে লক্ষ্য করে বললেন,—এদের দু'জনকেই কাযী হাব্বানের কাছে নিয়ে যাও। ইনায়েতুল্লাহ্ বাড়াবাড়ি করেছে এবং তাকে বলবে যেন কারও ব্যাপারেই কোনরূপ পক্ষপাতি করা না হয়। ইসলামী শরীয়ত মাফিক যেন ফয়সালা করা হয়।

পরের দিন বেলা কিছু হলে হাফিজ সাবির এবং শরফুদ্দীন লাহোরী ইনায়েতুল্লাহ্ খানকে নিয়ে কাযীর কাছে যান। কাযী সাহেব 'ইনায়েতু-ল্লাহ্ খান ও লাহোরীকে সামনে বসিয়ে দেন। এরপর 'ইনায়েতুল্লাহ্ খানকে সম্বোধন করে খুবই ভর্ৎসনা করেন যে, খুবই অন্যায় করেছো আর তাই তুমি শাস্তির যোগ্য। এরপর তিনি লাহোরীকে লক্ষ্য করে বলতে থাকেন, ভাই সাহেব! তুমি অত্যন্ত নেকবখ্ত ও সৎলোক। তোমরা সবাই ভারতবর্ষের নিজেদের ঘরবাড়ী ছেড়েছুড়ে শুধুমাত্র জিহাদ ফি সাবী-লিল্লাহর উদ্দেশ্যে এখানে এসেছো যেন আল্লাহ তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট ও রাযী থাকেন এবং আখিরাতে এর বিনিময়ে ছওয়াব পাও। দুনিয়ার এই বিশাল কর্মশালা তো কয়েকদিনের স্বপ্নের ন্যায়। অতএব কথা এই যে, ইনায়েতুল্লাহ্ তোমারই ভাই। রিপুর তাড়নায় তার দ্বারা এ অন্যায় কাজ হয়ে গেছে। সে তোমাকে মেরেছে। তুমি যদি তাকে মাফ করে দাও এবং দু'জনেই আগের ন্যায় মিলেমিশে যাও তবে খুবই ভালো কথা, আল্লাহর দরবারে অবশ্যই এর জন্য পুরস্কার পাবে। আর যদি তুমি এর বদলা নিতে চাও তবে উভয়েই সমান হয়ে গেলে। মাফ করার বিনিময়ে যে ছওয়াব তা থেকে তুমি বঞ্চিত হবে। মাফ করাটাও তো আল্লাহ্ রসূ-লেরই হুকুম আর বদলাটাও। কিন্তু মাফ করাতে ছওয়াব এবং বদলা নেওয়াতে আত্মতৃপ্তি লাভ সম্ভব হয়।

এ কথা শুনে লাহোরী বললো যে, কাযী সাহেব! যদি আমি 'ইনা-য়েতুল্লাহ্কে মাফ করে দেই তবে ছওয়াব পাবো আর যদি আমার বদলা নেই তবে উভয়ে সমান হবো। ভালো কথা, এতে কোন প্রকার গোনাহ্

নেই তো! উত্তরে তিনি বললেন, কোনই গোনাহ নেই। দু'টো হুকুমই আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (স')-এর। অতএব যেটাই ইচ্ছে মঞ্জুর করতে পারো। লাহোরী বললো,—আমি তো আমার হক ফিরিয়ে পেতে চাই। এরপর কাযী সাহেব অনেকক্ষণ চুপ থেকে বললেন, ভাই লাহোরী! হক তো তোমার এটাই যে, তুমিও 'ইনায়েতুল্লাহর সে জায়গায় মারবে, এই বলে তিনি 'ইনায়েতুল্লাহকে লাহোরীর সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং বললেন, —নিজের বদলা নিয়ে নাও। লাহোরী বললো যে, আমার হক তো বটেই আমিও দু'ঘুষি সেখানেই মারবো—সে আমার যেখানে মেরেছে। কাযী সাহেব বললেন, অবশ্যই, কথা তো তাই-ই।

ঐ মূহূর্তে সেখানে যারা বর্তমান ছিলো সবারই আশা-ভরসা যেটুকু ছিলো উবে গেলো এবং স্থির নিশ্চিত হলো যে, লাহোরী বদলা না নিয়ে ছাড়বে না। লাহোরী বললো, আচ্ছা ভাইসব! যারা এখানে উপস্থিত তারা সকলেই সাক্ষী থাকুন যে, কাযী সাহেব আমাকে আমার বদলা দিয়েছেন যা ইচ্ছে করলেই এখন আমি নিতে পারি। কিন্তু আমি শুধুমাত্র আল্লাহ্র রেযামন্দী হাসিলের জন্যই তা ছেড়ে দিলাম—এই বলেই সে 'ইনায়েতুল্লাহকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলো এবং হাত মুসাফাহা করলো। এ দৃশ্যে যে সমস্ত লোক সেখানে উপস্থিত ছিলো তারা সবাই লাহোরীকে এই বলে মুবারকবাদ জানাতে থাকে যে, প্রত্যেকেই দীনদার লোকের ন্যায় কাজ করেছে।

ব্যস! এতটুকু কথাই ছিলো...

"আমরা আজ থেকে তোমাকে সৈন্যবাহিনীতে খাদ্য ও আটা বন্টনের দায়িত্বে নিযুক্ত করলাম", একথাটা সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) সৈন্য-বাহিনীর এমন একজন কমযোর এবং শারীরিক দিক দিয়ে কৃশকায় ও দুর্বল ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললেন যাকে অসুখ-বিসুখ আরও দুর্বল ও শীর্ণকায় বানিয়ে দিয়েছিলো। এ ব্যক্তির নাম ছিলো 'আবদুল ওয়াহ্হাব। তার বাড়ী লাখনৌ। সে আরজ করলো,—আমি খিদমতে হাযির! কিন্তু আমার কতকগুলো অসুবিধা রয়েছে। আমি অল্প অল্প করে কুরআন মজীদ হেফ্জ করছি। এটা পরিশ্রম সাপেক্ষ ব্যাপার। এ কাজের জন্যে তো শারীরিক শক্তি এবং সুস্থতা দু'টোই দরকার।

একথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ থেকে তিনি পুনরায় বললেন,—"মওলবী সাহেব! বিসমিল্লাহ্ বলে মুসলমান ভাইদের খিদমতের জন্য কোমর

বেঁধে তুমি লেগে পড়ো; আমরা তোমার জন্য দো'আ করবো। আল্লাহ্ চাহে তো তোমার অসুবিধা দূর হয়ে যাবে, শক্তি সামর্থ্যও ফিরে আসবে, ফিরে আসবে স্বাস্থ্যও। আর এ জাতীয় বিরাট ও মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়া-কালীন তোমারও কুরআন শরীফও হেফ্‌জ হয়ে যাবে।"

এ সুসংবাদ শুনে সে অত্যন্ত খুশী হলো এবং ঐ দিন থেকেই খাদ্য বন্টন করতে লেগে গেলো। প্রত্যেকটি লোকই তার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলো আর সৈয়দ সাহেবও তার বিভিন্ন গুণাবলী বর্ণনা করতে থাকেন। এ দায়িত্ব পালন করবার কয়েক দিনের ভেতরই আল্লাহ্ পাক তার সকল অসুখ-বিসুখ দূরীভূত করে দেন এবং সে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এ খিদমত আঞ্জাম দেয়াকালীন কুরআন মজীদও তার হেফ্‌জ হয়ে যায়। একদিন সৈয়দ সাহেব খুশী হয়ে বললেন যে, মওলবী! এখন তো আল্লাহ্ পাক নিজ দয়া ও অপার করুণা গুণে তোমাকে খুবই সুস্থ ও মোটা-সোটা বানিয়ে দিয়েছেন। এদিকে কুরআন মজীদও তোমার হেফ্‌জ হয়ে গেছে। সে বললো,—হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার দো'আর বরকতে আমার দু'টো অভিলাষই পূরণ করেছেন। এখন আপনি আমার জন্য দো'আ করুন যেন কুরআন মজীদ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আপনাকে শোনাই। সৈয়দ সাহেব বললেন, খুবই ভালো কথা, আমরা দো'আ করবো। এখন ইনশাআল্লাহ্ কুরআন শরীফ আর ভুলবে না। তুমি খালেস আল্লাহ্‌র জন্যই মুসলমান ভাইদের খেদমত করছো আর তাই আল্লাহ্ তা'আলা তার পারিশ্রমিক স্বরূপ এসব তোমাকে দান করেছেন।

মওলবী 'আবদুল ওয়াহ্‌হাব সাহেবের প্রতিদিনের নিয়মিত অভ্যাস ছিলো যে, একদিকে তিনি কুরআন শরীফ আবৃত্তি করতেন আর অন্যদিকে খাদ্য-শস্য অথবা আটা লোকজনের ভেতর বন্টন করতেন। কিন্তু মুখে গুণতেন না। অথচ কি আশ্চর্য! কখনো কারো আটা কিংবা খাদ্যশস্য কম হয়েছে কিংবা বেশী বলে কোন অভিযোগ শোনা যায় নি।

একদিন আটা বন্টন করছিলেন—এমনি মুহূর্তে ইমাম আলী 'আজীমাবাদী নামের একজন মুজাহিদ আটা নেবার জন্যে আসে। লোকটি ছিলো অত্যন্ত শক্তিশালী ও তাগড়া জোয়ান; পালাক্রমে আটা বন্টন করা হচ্ছিলো। সে তাকে প্রথমে দেবার জন্য আবেদন জানাতে থাকে। মওলবী সাহেব বললেন যে, তোমার পালা এখনই এসে যাবে। একটু অপেক্ষা

করো। কিন্তু ইমাম আলী তাকাদা দিতেই থাকে এবং তার কোন কথাই মানতে রাযী হয় না। শেষ পর্যন্ত ইমাম আলী মওলবী সাহেবকে ধাক্কা দেয় এবং এতে তিনি মাটিতে পড়ে যান। সেখানে কান্দাহারীরাও আটা নেবার উদ্দেশ্যে অপেক্ষা করছিলো। এটা তাদের নিকট অত্যন্ত খারাপ লাগে এবং তারা উপস্থিত সবাই মীর ইমাম আলীকে মারবার জন্য প্রস্তুত হয়। মওলবী সাহেব কান্দাহারীদের এই বলে থামিয়ে দেন যে, সে আমাদের ভাই। ধাক্কা দিয়েছে তো আমাকেই দিয়েছে—তোমাদের এসবের অর্থ কি? এতে তারা লজ্জিত হয়ে চুপ করে যায়। মওলবী সাহেব তাকে আটা দেন এবং সে নিজের ডেরায় ফিরে যায়। লোকজন হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-কে গিয়ে ঘটনাটা বলে। ঐদিন রাতের বেলায় তিনি যখন সৈয়দ সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হন তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "মওলবী সাহেব! আজ মীর ইমাম আলী তোমার সাথে কি ঘটনাটা ঘটিয়েছে বলো তো?" মওলবী সাহেব উত্তরে জানালেন,—আমার কাছে কই তেমন কিছু করেনি। আসলে লোকটি তো খুবই ভালো মানুষ। আটা নিতে এসেছিলো এবং তাকে আগে দেবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে। অথচ তখনো তার পালা আসেনি। সে জলদী করতে থাকে; ইতিমধ্যে তার একটি ধাক্কা আমার সাথে লেগে যায়। "ব্যস! কথা তো এতটুকুই।" হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) একথা শুনে চুপ করে থাকেন। কেউ একথাটা মীর ইমাম আলীর নিকট পৌঁছে দেয় যে, মওলবী 'আবদুল ওয়াহ্হাব তোমার সম্পর্কে সৈয়দ সাহেবের নিকট এ ধরনের কথাবার্তা বলেছে। এতে সে নিজের কৃতকর্মে লজ্জিত হয় এবং ঠিক তন্মুহূর্তেই সৈয়দ সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হয়ে মওলবী 'আবদুল ওয়াহ্হাবের সঙ্গে কৃত অপরাধ মাফ করিয়ে নেয় এবং মুসাফাহা করে।

কয়েক বছর পর রাজদোয়ারী নামক স্থানে মওলবী 'আবদুল ওয়াহ্হাব তারাবীহতে কুরআন শরীফ হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-কে শোনান এবং এর পরেপরই জিলকদ মাসে বালাকোট যুদ্ধে শহীদ হন।

দুশমনের সঙ্গে বিশ্বস্ততা ও আমানতদারী

মুজাহিদ বাহিনীর ভেতর ইসলামী তা'লীম ও আদব-কায়দা (যার তরবিয়ত তাদের নেতা ও মুরুব্বীর হাতে হয়েছিলো) এমনিভাবে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিলো এবং তাদেরকে এমন রঙে রঞ্জিত করেছিলো যে,

এসব আমল-আখলাক ও আদব-কায়দা তাদের দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়—যা দোস্ত দুশমন, আপন-পর কারো ক্ষেত্রেই কোন পার্থক্য সৃষ্টি করতো না। প্রবাসে কিংবা সফরে, আনন্দ কিংবা বিষাদে কোন অবস্থা-তেই তার সাহচর্য ও সান্নিধ্য পরিত্যাগ করতো না। এখানে সাধুতা ও সত-তার একটি নমুনা পেশ করা হচ্ছে। এটা সেসব মহান ব্যক্তির রীতি-নীতি, অভ্যাস ও আচার-আচরণে পরিণত হয়েছিলো এবং তাদের শিরা-উপশিরা তথা অস্থি-মজ্জায় মিশে গিয়েছিলো।

পাঞ্জেতারের ফতেহ আলী নামক এক মুজাহিদকে চিকিৎসার্থে পেশো-য়ার যাবার দরকার হয়ে পড়ে। সেখানে তার একজন শিখ অফিসারের সঙ্গে দৈবাৎ সাক্ষাত ঘটে। এ সময় মুসলমান ও শিখদের মধ্যে যুদ্ধ চলছিলো।

অফিসার বললো—মিঞা সাহেব! আপনি কোত্থেকে আসছেন এবং কোথায় যাবেন? আপনি নিশ্চিন্তে আপনার সকল অবস্থা আমাকে বলুন।

ফতেহ আলী সহেব সাহস সঞ্চয় করে এবং মন শক্ত করে জওয়াব দিলো: আমি ভারতবর্ষ থেকে আমীরু'ল-মু'মীনীন হযরত সৈয়দ আহমদ সাহেবের সঙ্গে এখানে এসেছি এবং তাঁর সৈন্যবাহিনীর একজন সদস্য। (আর আমি সত্যি কথা বলছি এজন্য যে,) আমীরু'ল-মু'মিনীনকে যারা মানেন তার মিথ্যাও যেমন বলেন না—তেমনি কাউকে ধোঁকাও দেন না, সে তার দোস্ত হোক অথবা দুশমন হোক—তাতে কিছু আসে যায় না। কেননা আমীর তাদেরকে এরূপভাবেই প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। আমীরু'ল-মু'-মিনীন নিজেও অত্যন্ত মহান চরিত্রের অধিকারী, অত্যন্ত দানশীল, উদারচেতা, ওয়াদা পালনকারী, অঙ্গীকার পূরণকারী, এক কথায় তাঁর প্রশংসা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যদি আপনি কখনো তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন তবে তিনি খুবই খুশী হবেন। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার এমনি ওলী এবং এমনই আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি যে, যদি কেউ তাঁকে তকলীফ দিতে চায় তবে সে তার বিনিময়ে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টিই খরিদ করে।

শিখ অফিসার একথা শুনে জওয়াব দিলো যে, মিঞাজী! যা কিছু আপনি বলেছেন সত্যই বলেছেন। আমি এর আগেও আপনাদের আমীর সাহেবের সম্পর্কে একথাই শুনেছি। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করার ইচ্ছা আমার খুবই প্রবল। তাঁর খেদমতে হাযির হবার আগ্রহ আমার আছে। আমার

ভাই লাহোর থেকে আসবার পর হয়তো বা আমি নিজেই গিয়ে হাযির হবো অথবা তাকে তাঁর নিকট পাঠাবো।

উক্ত অফিসারটি আরও বললো যে, আপনি আমাকে গোপনভাবে আমীর সাহেব সম্পর্কে সকল কথাই খুলে বলুন। আমি চাই প্রত্যহই তাঁর সম্পর্কে কিছু তথ্য আমি অবগত হই। ফতেহ আলী বললো যে, আমীরু'ল-মু'মিনীনের আখলাক ও শরাফতী, দৃঢ় মনোবল ও সাহসিকতা, প্রশস্ত হৃদয় এবং বিনয় ও নম্রতা এমনি পর্যায়ের যে, যে ব্যক্তি তাঁর সান্নিধ্যে অল্প কিছুক্ষণের জন্যেও বসে—সে পরে আর তাঁকে ছেড়ে আসতে চায় না। আমি চার পাঁচ দিনের ভিতরেই ফিরতে চাই। আমার ইচ্ছা যে, একবারের জন্য খয়েরাবাদ কেল্লাটা দেখে যাই। এটা এজন্যে যে, লোকেরা আমাকে এ সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবে—অথচ আমি বলতে পারবো না—(তা হয় না)।

অফিসারটি বললো,—মিঞাজী! তোমাদের ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা এবং বড় অদ্ভুত ধরনের। তোমরা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছো—আর আমাদের দুশমনের সাথে মিলিতও হয়েছো। এর পরেও এ ধরনের কথা বলার সাহস হয় কোত্থেকে যে, আমি তোমাকে আমাদের সুদৃঢ় ও মযবুত কেল্লা এবং সেখানকার সামরিক অবস্থানগুলো দেখাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবো! তোমার ভয় করে না?

ফতেহ আলী জবাব দেয়,—ভয় কিসের? আমীরু'ল-মু'মিনীনের সাথী আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না। আপনাকে আমার কাছে উদার হৃদয় বলে মনে হয়েছে। আর এ কারণেই আমি আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছি যেন আপনার মাধ্যমে কেল্লাটা দেখে নিই।

এ জওয়াব শুনে অফিসার হেসে ফেলে এবং বলতে থাকে যে, আপনি মনে কিছু করবেন না। আমি ঠাট্টাচ্ছলে এসব বলছিলাম। আমি আপনার জন্য একটা চিঠি লিখে দেবো। এটা পাহারাদারকে দিয়ে দিলেই আপনার ভেতরে যাবার অনুমতি মিলে যাবে।

এরপর উক্ত অফিসার দোয়াত-কলম চেয়ে পাঠায় এবং পাহারাদারদের নামে একটি সুপারিশপত্র লিখে ফতেহ আলী সাহেবের নিকট সোপর্দ করে। ফতেহ আলী এটা নিয়ে যায়। এটা পেশ করতেই ভেতরে প্রবেশ করবার অনুমতি মিলে যায়। কেল্লার ভেতর দিকটা খুব ঘুরে ফিরে দেখার পর

বিকেল বেলায় ফতেহ আলী সাহেব যখন ফিরে আসে তখন সে দেখতে পায় যে, তার মেযবান অফিসার নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ভুল বকছে। তার গলায় সোনার একটি চেইন, কানে সোনার বালি আর নিকটেই তলোয়ার পড়ে আছে যার দস্তা স্বর্ণ-নির্মিত। (কিছুটা নেশা কাটার পর) ফতেহ আলী সাহেবের উপর নজর পড়তেই অফিসার বললো, মিঞাজী! আটকের কেল্লা তুমি দেখেছো? ফতেহ আলী দেখেছে বলে জওয়াব দেয়। এরপর অফিসারটি ঘুমে ঢুলুঢুলু করতে থাকে এবং শুয়ে পড়ে। ফতেহ আলীর বর্ণনায়, অতঃপর সে শুয়েই থাকে। এক সময় আমার আশংকা দেখা দেয় দেয়, না জানি কখন চোর-চোট্টা এসে দেখা দেয় এবং সোনার লোভে এসব না নিয়ে যায়। এত সব কিছু ভেবে-চিন্তে আমি একটা লাঠি হাতে নিয়ে তার ঘরের দরজায় পাহারায় রত হই। অর্ধেক রাত্রির সময় অফিসারের চোখ খোলে এবং দেখতে পায় যে, আমি দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছি। সে বললো, মিঞাজী! তুমি এখন অবধি জেগে? আমি বললাম, আপনি নেশাগ্রস্ত ছিলেন এবং ছিলেন ঘুমিয়ে, আর এদিকে আপনার মূল্যবান সামান আমারই সামনে পড়ে। ভয় পেলাম, না জানি কোন চোর অথবা ডাকু তা হাতিয়ে নিয়ে যায় এবং আপনার ক্ষতি হয়। অফিসার বললো,—মিঞাজী! তুমি ঠিকই বলেছো। আমার মতো লোকের পক্ষে নেশাগ্রস্ত হওয়া দোষেরই বটে। এরপর সে পুনরায় চোখ বোঁজে।

রাত ভোর হলো এবং বেশ বেলা হলে অফিসার আমাকে খয়েরাবাদ দুর্গ দেখাতে নিয়ে যায় এবং তার সঙ্গে আমি সেখান থেকে ফিরে আসি।

আমি তার সঙ্গে আট দিন কাটাই। এ সময়ে সে রোজই আমাকে সৈয়দ সাহেব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতো—আর আমি তাঁর সম্পর্কে কিছু কিছু বলতে থাকি। একদিন আমাকে বলে যে, কোন একদিন আপনি আমাকে শরাব থেকে দূরে সরে থাকার উপদেশ দিয়েছিলেন। আজ থেকে আমি তওবাহ করলাম যে, এতবেশী এখন থেকে আর পান করবো না। কারণ তাতে হু'শ-জ্ঞান থাকে না।

ফতেহ আলী সাহেব বলেন, এরপর আমি বেশ ভালভাবেই আমার সৈন্যবাহিনীতে পৌঁছে যাই।

এক ডাকাতের তওবাহ ও সংশোধন

ইসলামের এই নতুন বসতিতে যেই আসতো এবং দু'চার দিন অবস্থা-নের সুযোগ মিলতো, সে অবশ্যই মুজাহিদ বাহিনীর আমল ও আখলাক

দ্বারা প্রভাবিত হ'তো যদিও সে ভালো কোন নিয়তেই না আসুক। এরা ছিলো সেই সমস্ত লোক যাদের সান্নিধ্যে ও সাহচর্যে আগত ব্যক্তিবর্গ তাদের ফয়েয ও বরকত থেকে মাহ্‌রূম হতো না।

এ ধরনেরই একটি ঘটনা এখানে উদাহরণস্বরূপ পেশা করা হচ্ছে ঃ

নিকটবর্তী টোপাই নামক একটি গ্রামে ফলীলা নামে এক ব্যক্তি ছিলো অত্যন্ত জালিম আর মানুষকে সে নানাভাবে খুবই কষ্ট দিত। বস্তির সকল অধিবাসী তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলো। অবশেষে সবাই নিরুপায় হয়ে একজোটে তাকে গ্রাম থেকে বের করে দেয়। সে সেখানে থেকে আটক নদী পার হয়ে শিখদের নিকট গমন করে এবং তাদের সঙ্গে সমঝোতা ও বন্ধুত্ব স্থাপন করে। তারা আটক নদীর কিনারে তার জন্য একটি বুর্জ (গম্বুজ) বানিয়ে দেয় আর চাষাবাদের জন্য দেয় কিছু জমিও। সে এই বুর্জে থাকতে শুরু করে। পঞ্চাশ-ষাট জন লোক তার পাশে সব সময়ই থাকতো, সে এসে টোপাই এলাকাতে ডাকাতি করতো এবং বাড়ীতে বসে বসে খেতো। একবার শিখদের সঙ্গে নিয়ে মাশওয়ানী গোত্রের একটি মৌজাতে এসে খুবই লুটপাট চালায়। বস্তির আশিজন লোক মারা যায় এবং উক্ত বস্তি দখল করে সে স্বয়ং ওখানেই থাকতে শুরু করে। বস্তির লোকেরা হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর কাছে এ ব্যাপারে নালিশ জানায় এবং তাকে দমন করার জন্য দরখাস্ত পেশ করে। তিনি তাদের সান্ত্বনা ও প্রবোধের কথা-বার্তা বলে ফেরত পাঠিয়ে দেন—এবং ফলীলার নিকট এ মর্মে একটি প্রস্তাব পাঠান যে, তুমি মুসলমান,—তোমার পক্ষে সমীচীন নয় যে, তুমি তোমার মুসলমান ভাইদের ধন-সম্পদ লুট করবে,--তাদের মার-ধোর করবে এবং তাদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলবে। তুমি আমাদের এখানে চলে এসো। আমরা তোমাকে আরও একটি গ্রাম দিয়ে দেবো।

এ চিঠি পাওয়া মাত্র সে নিজ বন্ধু-বান্ধবদের পরামর্শ চায়। সবাই বলে যে, তার যাওয়াটাই সমীচীন। কেননা তিনি সৈয়দ বংশধর—তদুপরি আমাদের সবার ইমাম এবং বাদশাহ্‌ও বটেন। আমরা তো পাকড়াও থেকে মুক্ত থাকলাম। যদি আমাদের দু'চার জনকে পাকড়াও করতে চায় তবে আমরা যারা বাইরে থাকবো তারা দেখে নেবো কত ধানে কত চা'ল। অতঃপর ফলীলা আম্ব নামক স্থানে সৈয়দ সাহেবের সঙ্গে মিলিত হয়। সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) এতে অত্যন্ত খুশী হন। সে তিনটে ঘোড়া,

চারটে বন্দুক, ন'টা তলোয়ার যা সে একদিন আগে শিখদের নিকট থেকে লুট করেছিলো—সৈয়দ সাহেবের খেদমতে নযরানাস্বরূপ পেশ করে। তিনিও তাদের প্রতিটি লোককে একটি করে পাগড়ী ও একটি করে লুঙ্গি প্রদান করেন এবং নগদ অর্থ-কড়িও কিছু প্রদান করেন। এরপর ফলীলা তার সঙ্গে আগত লোকজনসহ বায়'আত হয় এবং দুষ্কার্য, পাপ ও মন্দ কাজ থেকে তওবাহ্ করে। সৈয়দ সাহেব তিন দিন যাবত তাকে নিজের কাছে রাখেন এবং বহু উপদেশ দেন। পরিশেষে তাকে সান্তনা দান করে বিদায় দেন। কিছুদিন পর তিনি টোপাই মৌজার সর্দার ও ফলীলাকে ডেকে পাঠান এবং তাদের ভেতর সন্ধি-সমঝোতা করিয়ে দেন। এ ছাড়া ফলীলার যে সব ন্যায্য বিষয়-সম্পত্তি টোপাইতে ছিলো তা তিনি সর্দারদের কাছ থেকে নিয়ে নেন। এ ছাড়া আটক নদীর কিনারে একটি ছোট টিলার উপর বিরান পড়ে থাকা একটি গ্রাম—যেখানে অধিকাংশ সময়েই মুসাফিরদের লুট করা হতো, ফলীলাকে দিয়ে দেন এবং বলেন যে, এখন থেকে তুমি ওখানেই থাকবে।

এরপর ফলীলার জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। সে সৎ পথে চলতে থাকে। কয়েকটি যুদ্ধে সে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। তার দ্বারা ইসলাম এবং মুসলমানদের যথেষ্ট শক্তি বৃদ্ধি ঘটে এবং তাদের হাত সুদৃঢ় ও মযবুত হয়।

দু'জন গুপ্তচরের ইসলাম গ্রহণ

পাঞ্জেতারে অবস্থানকালে দু'জন শিখ সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসে। তিনি তাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তারা তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে এসেছে বলে জানায়। তিনি বললেন, খুবই ভালো, তোমরা আমাদের মেহমান। যতো দিন ইচ্ছে এখানে থাকো। তিনি তাদের জন্য নিজের তরফ থেকে খাদ্যদ্রব্য-সামগ্রী বরাদ্দ দেন। তারা দু'জন প্রত্যহ ফজর ও আসর বাদ হযরত বেরেলভী (র)-এর কাছে এসে বসতো এবং কিছুক্ষণ তাঁর কথা শুনে নিজেদের শোয়ার স্থানে চলে যেতো। তিনি তাদেরকে বলেন যে, তোমাদের যখন যা কিছু আবশ্যক হবে আমাকে বলবে এবং এ ব্যাপারে কোন কিছুর চিন্তা-ভাবনা করবে না। কিন্তু তারা তবুও কিছু বলতো না। দশ বারো দিন পর একদিন তারা আরজ করলো,—হযরত! এতদিন ধরে আপনার খেদমতে থাকলাম, আপনার কথাও খুব শুনলাম। লোকজনের কাছে আপনার প্রশংসনীয় গুণাবলী ও

পসন্দনীয় চরিত্র-ব্যবহার সম্পর্কে যা কিছু শুনেছিলাম এখানে এসে তার চেয়েও অনেক বেশী পেলাম। আপনার তরীকা এবং আপনার ধর্ম আমাদের খুবই পসন্দ হয়েছে। এখন আমরা চাই যে, আমাদেরকেও আপনি এ তরীকা ও ধর্ম সম্পর্কে তা'লীম দেবেন।

সৈয়দ সাহেব একথা শুনে খুশী হন এবং তক্ষুণি তাদেরকে কলেমায়ে শাহাদাত পড়িয়ে ইসলামে দীক্ষিত করেন। তাদের বড়জনের নাম রাখেন 'আবদুর রহমান এবং ছোট জনের নাম রাখেন 'আবদুর রহীম। এরপর মিঞাজী চিশতীকে বলেন, এদেরকে নিজের ডেরায় নিয়ে গিয়ে সালাত আদায়ের নিয়ম-কানুন শেখাও। ওলী মুহাম্মদ সাহেবকে বললেন যে, এদেরকে দু'জোড়া কাপড়ও বানিয়ে দাও। ঐ দিনই সৈয়দ সাহেব তাদেরকে খাত্‌নাও করিয়ে দেন। পরে তারা সৈয়দ সাহেবের নিকট স্বীকার করেছিলো যে, আমাদেরকে খায়েরাবাদ থেকে শিখ অধিনায়ক আপনার নিকট পাঠিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমরা লোকমুখে খলীফা সাহেবের অনেক মাহাত্ম্য ও গুণাবলী শুনতে পাচ্ছি। তোমরা গিয়ে স্বচক্ষে দেখে এ সম্পর্কে আমাকে বিস্তারিত জানাবে।"—এজন্যেই আমরা আপনাকে দেখতে এসেছিলাম। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা আপনার তোফায়েলে আমাদেরকে ইসলামের অপূর্ব নেয়ামত দান করলেন। সৈয়দ সাহেব একথা শুনে আরও খুশী হলেন এবং তাদেরকে দু'টো ঘোড়া দিয়ে বললেন যে, তোমাদের খুশী হলে আমাদের সৈন্যবাহিনীতে থাকো;—আর যদি ইচ্ছা করো খায়েরা-বাদে নিজেদের অফিসারের কাছেও যেতে পারো। এ ব্যাপারে তোমরা পুরো স্বাধীন। তারা দু'মাসের মতো সৈন্যবাহিনীতে থাকে—সালাত আদায়ের নিয়ম-কানুন ভালোভাবে শিখে নেয় এবং বিদায় নিয়ে খায়েরাবাদ অথবা অন্য কোথাও চলে যায়।[১]

বিচার ব্যবস্থা ও পুলিশ বিভাগ প্রতিষ্ঠা

অল্প কিছুদিন পরই সৈয়দ সাহেব উক্ত এলাকায় শরীয়তী ব্যবস্থা চালু করেন। বিশিষ্ট আফগান 'আলিম কাযী মুহাম্মদ হাব্বানকে কাযী-উ'ল-কুযাত বা প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করেন। প্রতিটি গ্রামেই কাযী, মুফতী, পুলিশ এবং সাদকা, ওশর ও যাকাত আদায়ের জন্য কর্মচারী ও তহশীলদার নিযুক্ত করেন। আমদানী খাতের সকল রাজস্ব নিয়মিত

১. সীরতে সৈয়দ আহমদ শহীদ, পৃষ্ঠা—২৯।

জমা করা হতো এবং এরপর ইসলামী শরী'আতের নীতি অনুযায়ী বন্টন করা হ'তো। কাযী মুহাম্মদ হাব্বান স্থানীয় এবং বিদেশী 'উলামায়ে কিরামের পরামর্শানুযায়ী ফরয তরককারী এবং অন্যান্য অন্যায় ও দুষ্কার্যে লিপ্ত ব্যক্তিদের যথোচিত শাস্তি ও জরিমানা নির্ধারণ করেন। এর ফলে বহুবিধ অনাচারের মূলোৎপাটন ঘটে। বহু পানাসক্ত ও পাপাচারী, লম্পট ও বদমাইশ এবং ধর্মহীন লোক নিজেদের অন্যায় আচরণ ও গর্হিত কাজকর্ম থেকে বিরত হয় এবং সমাজ জীবনও এদের দুষ্ট প্রভাব ও ক্ষতিকর ক্রিয়াকাণ্ড থেকে অনেকাংশ রক্ষা পায়। মুসল্লীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং নিম্নোদ্ধৃত আয়াতের বাস্তব অনুশীলন চোখের সামনে ভেসে ওঠে ঃ

الذين ان مكناهم اقاموا الصلوة و اتوا الزكوة و امروا بالمعروف

و نهوا عن المنكر و الى الله ترجع الامور -

"আমি উহাদিগকে পৃথিবীতে হুকূমত দান করিলে তবে উহারা (নিজেরাও) সালাত কায়েম করিবে, যাকাত দিবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎকার্য নিষেধ করিবে; সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে।"
(সূরা হজ্জ, ৪১ আয়াত)

ভ্রাম্যমান ছাউনি ও বাস্তব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ইসলামের এই নতুন উপনিবেশ তাসাওউফের কোন খানকাহ্ অথবা দুনিয়াত্যাগীদের কোন মুসাফিরখানা কিংবা ওলী-দরবেশদের কোন আশ্রয় ও অবস্থানস্থল ছিলো না,—এটা ছিলো ধর্মীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হবার সাথে সাথে একটি সামরিক ছাউনি, ঘোড়সওয়ার এবং সিপাহীদের কেন্দ্রভূমিও বটে। মুজাহিদ বাহিনী ও মুহাজিরবৃন্দ নিজেদেরকে সব সময় যুদ্ধাবস্থায় আছেন বলে মনে করতেন। যে কোন বিপদের মুকাবিলায় তারা নিজেদের সদা প্রস্তুত রাখতেন। সাথে সাথে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামও তৈরী রাখতেন।

একবার হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) মুজাহিদ বাহিনীর একটি জামা'আতেসহ নিকটস্থ একটি ঘাটিতে গমন করেন। এটি পাঞ্জেতার থেকে

এক মাইল দূরত্বে অবস্থিত। সেখানে ছিলো একটি টিলা, যার উচ্চতা ছিলো বিস্তৃত। তোপখানার জন্য জায়গাটা তিনি পসন্দ করেন এবং হুকুম দেন যে, পাঞ্জেতার থেকে কামান নিয়ে এসে এখানে স্থাপন করা হোক। অতঃপর সেখানে তোপখানা স্থাপন করা হয় এবং বোমা ও গোলা-বারুদের একটি ভাণ্ডারও সেখানে গড়ে তোলা হয়। কামান ও গোলন্দাজ বাহিনীর জন্য কোয়া-র্টার নির্মাণ করা হয়। কাসেমখীল নামক মৌজাতে গোলা-বারুদ প্রস্তুতের একটি কারখানা কায়েম করা হয়। সৈয়দ সাহেব স্বয়ং সেখানে গমন করেন এবং নিজের চোখে গোলাবারুদ তৈরীর বিভিন্ন পর্যায় ঘুরে ফিরে দেখেন। অশ্বারোহণ ও ঘোড় দৌড়ের প্রতিযোগিতা এবং যুদ্ধের মহড়ার ব্যবস্থাও করেন। এ সবে সৈয়দ সাহেবও অংশ নেন এবং যুদ্ধের বিভিন্নমুখী কলা-কৌশলের ক্ষেত্রে তাঁর নিপুণতাও এতে প্রকাশ পায়। যুদ্ধ-বিদ্যায় তাঁর পারদর্শিতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বড় বড় ঘোড়সওয়ার এবং বীর-পুরুষেরাও স্বীকৃতি দেয়। এতে এও জানা গেলো যে, বাস্তব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও পারদর্শীদের মত তিনি শুধু পুরনো কলাকৌশল তথা গতানুগতিকতার অনুসারী নন, এ বিষয়ে আবিস্কার ও উদ্ভাবনী শক্তিরও অধিকারী।

নয়া এ উপনিবেশে শারীরিক ব্যায়াম ও যুদ্ধ-মহড়া ছিলো নিত্যদিনের কাজ এবং সেখানকার সাধারণ জীবনযাত্রার অঙ্গীভূত। মুজাহিদ বাহিনীর সদস্যরা যুদ্ধ-বিদ্যায় পরস্পর পরস্পরের থেকে উপকৃত হ'তো। কিন্তু এদের মধ্যে হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর পর মওলানা আহমদ উল্লাহ সাহেব নাগপুরী এবং রিসালদার 'আবদুল হামিদ খান সবার অগ্রগামী ছিলেন। প্রতিটি বিষয়ে তাঁরাই প্রথম হতেন। অতঃপর সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) নির্দেশ দেন যে, তাঁরা মুজাহিদ বাহিনীকে ঘোড়সওয়ারী, বল্লম নিক্ষেপ, তীরন্দাজী, বন্দুক চালানো, তলোয়ারবাজিতে পারদর্শী করে তোলার জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ দান করবেন। স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ (যারা প্রকৃতিগত-ভাবেই যুদ্ধবাজ) এসব ভিনদেশী মুহাজিরদের অভিজ্ঞতা ও কলাকৌশল দেখে খুবই বিস্মিত হয় এবং তাদের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ উস্তাদ মেনে নেয়। এরাও বিভিন্ন মহড়া ও প্রস্তুতিতে অংশগ্রহণ করতে থাকে এবং মুজাহিদ বাহিনী থেকে অনেক উপকৃত হয়। শারীরিক কসরত, ব্যায়াম ও যুদ্ধ মহড়ার অনেকগুলি কেন্দ্র খুলে দেওয়া হয়। সৈয়দ সাহেব রিসালদার 'আবদুল হামিদ খানকে ঘোড়সওয়ার বাহিনীর অধিনায়ক এবং সৈন্যবাহিনীর সিপাহসালার নিযুক্ত করেন এবং তার জন্য খুব

দো'আ করেন। উঁচু জাতের একটি ঘোড়া যা তাঁকে টুংকের শাসনকর্তা নওয়াব উযীরুদ্দৌলা নযরানাস্বরূপ দিয়েছিলেন—তাকে প্রদান করেন এবং তার মাথায় নিজ হাতে পাগড়ী বেঁধে দেন। 'আবদুল হামিদ খান এরূপ সম্মান লাভে ও সৌভাগ্যে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং আল্লাহ্‌র দরবারে শুকরিয়া আদায় করেন। মসজিদে গিয়ে দু'রাকাত শোকরানা সালাতও আদায় করেন তিনি। ঐদিন থেকেই তার চরিত্রে ও ব্যবহারে দর্শনীয় পার্থক্য অনুভূত হতে থাকে। স্বভাব ও আচার-ব্যবহারে নম্রতা সৃষ্টি হয় এবং তাকে অত্যন্ত ধৈর্যশীল, প্রশস্ত হৃদয়, মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি-প্রবণ ও সংবেদনশীল এবং দুশমনদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর মনোভাবাপন্ন দেখা যেতে থাকে। মায়ার নামক স্থানে একটি যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন। মুসলমানদের উপর তাঁর শাহাদতের প্রতিক্রিয়া ছিলো অত্যন্ত গভীর। সবাই অন্তর থেকে তার জন্য দু'আ করতো আর তার প্রশংসায় সবাই ছিলো পঞ্চমুখ।

মুজাহিদ বাহিনীর তৎপরতা

এই গোটা সময়টাই হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) আশে-পাশের সমস্ত সর্দারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন,--চিঠিপত্র আদান-প্রদান করতেন--, কখনো নিজেই তাঁদের সাথে গিয়ে দেখা করতেন এবং জিহাদ ও ধর্মের সাহায্যে এগিয়ে আসবার জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করতেন। এ ক্ষেত্রে আম্বের শাসনকর্তা পায়েন্দা খানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি শক্তি ও সাহসে, শৌর্যে ও বীর্যে অত্যন্ত মশহুর ছিলেন।

সৈয়দ সাহেব বিভিন্ন স্থানে মুজাহিদ বাহিনীকে ছোট ছোট গ্রুপে ও প্লাটুনে ভাগ করে অভিযানে পাঠাতেন। এসব অভিযানে মুজাহিদ বাহিনীর বীরত্ব, সাহসিকতা, শরী'আতের বিধি-নিষেধের প্রতি আনুগত্য, কঠোর ভাবে নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলা এবং যুদ্ধে বিপক্ষীয়দের ফেলে যাওয়া সম্প-দের ক্ষেত্রে তাদের আমানতদারী ও সততা খুব ভালো ভাবেই প্রকাশ পেতো। এরই সাথে স্থানীয় সর্দার ও আমীর-ওমরাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ-পরতা, উপজাতীয় ঝগড়া-বিবাদ এবং ধর্মীয় সম্ভ্রম ও মর্যাদাবোধের ক্ষেত্রে অনুভূতির স্বল্পতা এবং বিপদের দিক থেকে উপলব্ধিহীনতা পরিষ্কারভাবে দেখা যেতো। মোটকথা, বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের যুদ্ধের সামনাসামনি হতে হয়েছে যাতে মুজাহিদ বাহিনীর সাহসিকতা ও বীরত্ব, আত্মত্যাগ ও

আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত অত্যুজ্জ্বলভাবে ধরা দেয়। এসব যুদ্ধ বা অভিযানে মওলানা মুহাম্মদ রামপুরীর আসন সবচেয়ে উঁচু থাকে।

এ সময়েই মুজাহিদ বাহিনীর যে সব নতুন কাফেলা ভারতবর্ষ থেকে আসে তাদের সংখ্যা পনেরো থেকে কম ছিলো না। এদের মধ্যে বড় বড় 'উলামায়ে কিরাম, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ এবং বহু সংখ্যক তেজস্বী ও উৎসাহী যুবক ছিলো। অধিকন্তু সৈয়দ সাহেবের ভাতিজা সৈয়দ আহমদ আলী এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনও ছিলো। এদেরই হাত দিয়ে মুজাহিদ বাহিনীর সাহায্যকারী এবং জামাতের অন্যান্য লোকজনের[১] তরফ থেকে টাকাকড়িও আসে যা বিভিন্ন ধর্মীয় কল্যাণ ও আবশ্যকীয় কাজে ব্যয়িত হয়।

চিঠিপত্র একটি গোপন ভাষায় লেখা হতো যা শুধু জামা'আতের 'উলামায়ে কিরাম বুঝতেন। এর ভেতর বহু চিঠিপত্র 'আরবীতেও লেখা হতো।

সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) জিহাদের দাওয়াত জানাবার জন্যে বিভিন্ন এলাকায় ওয়ায়েজীন পাঠান এবং জামা'আতের বিশিষ্ট 'উলামাকে হিজরত ও জিহাদের দাওয়াত, বিশুদ্ধ ধর্মীয় 'আকীদার প্রচার, ধর্মের আবরণে প্রচারিত ও প্রচলিত কুসংস্কার ও জাহিলিয়াতের বিনাশ সাধনের জন্য ভারত-বর্ষে পাঠিয়ে দেন। তাদের মধ্যে মওলানা মুহাম্মদ আলী রামপুরী এবং মওলানা বেলায়েত আলী 'আজীমাবাদীও ছিলেন। তাঁরা সৈয়দ সাহেবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খলীফা ও সাথীদের অন্তর্গত ছিলেন।

এরপর সোয়াতে তিনি দ্বিতীয় সফর করেন এবং এর রাজধানী খাহ্‌র-এ পুরো এক বছর তিনি অতিবাহিত করেন। গোটা সময়টা তিনি দাওয়াত, আত্মিক ও নৈতিক পরিশুদ্ধি, ওয়াজ-নসীহত ও জনগণের হিদায়াত প্রদানে কাটিয়ে দেন এবং এক্ষেত্রে চেষ্টা-সাধনার কোন ত্রুটিই তিনি রাখেন নি। উপজাতীয় সর্দার, নেতৃস্থানীয় লোকজন ও বিশিষ্ট 'উলামায়ে কিরাম তাঁকে সব সময়ই ঘিরে রাখতো।

এরপর খাহ্‌রের মুজাহিদবৃন্দ দ্বিতীয়বার নিজেদের যুদ্ধ-মহড়া, নেযাবাজী, ঘোড়দৌড় এবং চান্দমারী (লক্ষ্যভেদ)-তে আত্মনিয়োগ করে।

---

১. এদের মধ্যে ছিলেন মশহুর মুহাদ্দিছ মওলানা মুহাম্মদ ইসহাক দেহলভী ও হযরত শাহ 'আবদুল 'আযীয। পরবর্তীকালে তিনি দরসে হাদীছের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বড় উস্তাদ এবং এ শাস্ত্রের ইমামরূপে গণ্য হন।

কখনো কখনো সৈয়দ সাহেব নিজেও এতে শরীক হতেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতেন। নিজের অভিজ্ঞতা ও রণকৌশলের উপর গর্ব করার ব্যাপারে সতর্ক করতেন এবং শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীলতা ও আস্থা এবং শুধু মাত্র তাঁরই নিকট সাহায্যপ্রার্থী হবার জন্য উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করতেন। খাহর-এ অবস্থানকালেই আরবাব বাহরাম খানের নেতৃত্বে একটি রাত্রিকালীন ঝটিকা বাহিনী পেশোয়ারের নিকটবর্তী আশমানজাইয়ে পাঠানো হয়। এতে সৈয়দ সাহেব স্বয়ং অংশগ্রহণ করেন। এই ঝটিকা আক্রমণে মুজাহিদ বাহিনীকে নিদারুণ ক্ষয়-ক্ষতি ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। আশংকা করা গিয়েছিলো যে, প্রচণ্ড গরম, পিপাসা এবং ময়দানে পথ হারিয়ে সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের উপর দয়া প্রদর্শন করেন এবং তারা নিরাপদে নিজেদের আবাসে ফিরে আসে।

'আলিমে রব্বানীর ওফাত

খাহ্‌র (সোয়াত)-এ শেখুল ইসলাম মওলানা 'আবদুল হাইয়ের ওফাতের নিদারুণ ঘটনা ঘটে। এটা ছিলো এমন একটি বিরাট মুসীবত ও দুর্যোগ যাতে লোকেরা একে অপরকে কেঁদে-কেটে শোক জ্ঞাপন করে। তাঁর মৃত্যুতে ভারতবর্ষের মুসলমান একজন 'আলিমে রব্বানী, একনিষ্ঠ মুবাল্লিগ, বিপ্লবী আহ্‌বায়ক এবং একজন দয়ার্দ্র পিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলো। শেষ দিকে তাঁর ঈমানী কুওত, ধর্মীয় সম্ভ্রম ও মর্যাদাবোধ সম্পূর্ণরূপে আবেগোদ্দীপ্ত ছিলো। একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বলেন ঃ

"সৈয়দ সাহেব মওলানা 'আবদুল হাই সাহেবকে অন্যান্য কাজের তত্ত্বাবধানের জন্য দেশে ছেড়ে এসেছিলেন এবং বলে এসেছিলেন যে, পরে তাঁকে ডেকে পাঠানো হবে। ইতিমধ্যে মওলানা আহবানের অপেক্ষায় এত অস্থির ও অধীর আগ্রহে কাল কাটাতে থাকেন---পানি বিহনে মাছ ডাঙ্গায় যেমন-লাফাতে থাকে অথবা তিনি যেন দ্বীপান্তরে অথবা কারাগারে কাল কাটাচ্ছেন। যখন আহ্বান এসে গেলো তখন তিনি খুশীতে পাগলের মতো এদিক থেকে ওদিকে দৌড়াচ্ছিলেন আর বলছিলেন,---"সৈয়দ সাহেব আমাকে স্মরণ করেছেন,---সৈয়দ সাহেব আমাকে স্মরণ করছেন।" এরপর তিনি দীর্ঘ মরুভূমি, বালুকাময় প্রান্তর, নদী-নালা, দুর্গম পাহাড়-পর্বত বহু কষ্টে অতিক্রম করে---যেমনটি অন্যান্য মুজাহিদবৃন্দ করেছিলো---সেখানে পৌঁছেন। সৈয়দ সাহেব যখন তাঁর আগমনের সংবাদ পেলেন তখন তিনি অত্যন্ত খুশী হন

এবং তাঁর জন্য বহু কিছু এন্তেজাম করেন। সেখান থেকে মওলানা 'আবদুল হাই সাহেব তাঁর জনৈক দোস্তকে লিখেছিলেন যে, আমি পড়ে আসছি এবং শুনে আসছিলাম যে, ঈমানদার বান্দা যখন জান্নাতে পেঁ ছুবে তখন দুনিয়ার সকল দুঃখ-কষ্ট মুসীবত এক লমহায় ভুলে যাবে আর তার সকল ক্লান্তি ও অবসাদও সে মুহূর্তেই দূর হয়ে যাবে। এ কাহিনীই এখানে আমার জীবনে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। যখন আমার বন্ধু-বান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের নিকটে পেঁছুলাম তখন সফরের সকল ক্লান্তি ও অবসাদই দূর হয়ে গেলো।

"এরপর মওলানা বিপ্লবের দাওয়াত, নৈতিক ও চারিত্রিক পরিশুদ্ধি, ওয়াজ-নসীহত ও হিদায়াত কর্মে একাগ্রচিত্তে মশগুল হয়ে যান। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের মুহূর্ত ঘনিয়ে এলে তিনি সৈয়দ সাহেবেকে বলে পাঠান যে, আমার খাহেশ ছিলো--যুদ্ধের ময়দানে যদি আমার মৃত্যু হতো। কিন্তু তকদীরে ইলাহীর কারণে আজ বিছানায় পড়ে জীবন দিচ্ছি। সৈয়দ সাহেব সংবাদ পেতেই চলে আসেন এবং অবস্থা সম্পর্কে জানতে চান। মওলানা উত্তরে জানান যে, তিনি খুবই কষ্ট অনুভব করছেন। আপনি আমার জন্য দু'আ করুন এবং আমার বুকের উপর আপনার কদম রাখুন যার বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এই মুসীবত থেকে নাজাত দেবেন। সৈয়দ সাহেব বললেন,---'মওলানা সাহেব! আপনার বুক তো আল্লাহ্‌র কিতাব ও সুন্নতে নববী (স)-এর জ্ঞান-ভাণ্ডার। আমার এতখানি অধিকার কোথায় যে তাঁর উপর পা রাখি।' এরপর তিনি বিসমিল্লাহ্ বলে তাঁর বুকের উপর হাত রাখলেন। এতে মওলানা কিছুটা শান্তি ও আরাম পেলেন এবং কয়েক-বার--- الله! الرفيق الاعلى! الله! الرفيق الاعلى! নিজের মুখে উচ্চারণ করেন এবং ইন্তেকাল করেন।"

শরী'আতী ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা

হযরত সৈয়দ আহমদ বেরলভী (র)-এর নিকট যারা বায়'আত হয়েছিলো, এসব অবস্থা দেখে ইসলামের এই মহান স্তম্ভের বরকত ও কল্যাণের প্রতি তাদের 'আকীদা আরও পাকাপোক্ত হয়ে যায়। তারা তাঁকে নিজেদের আমীর ও ইমাম হিসাবে মেনে নেয়। তাঁরা অনুভব করে যে, এই ব্যবস্থাপনাকে আরও বিস্তৃত করা, তার ইখতিয়ারাধীন এলাকা বর্ধিত করা এবং একে অধিকতর সুদৃঢ় বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। তাদের বিশ্বাস ছিলো যে, আল্লাহ্‌র সাহায্য লাভ করতে হলে আশে-পাশের মুসলিম

বাসিন্দাদেরকে শরী'আতের নির্দেশিত বিধি-বিধানের প্রতি দাওয়াত দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাদেরকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করতে হবে যে, ইসলামী শিক্ষা ও বিধানের পরিপন্থী আফগানী (পাঠানী) রসম-রেওয়াজ এবং দেশীয় নিয়ম-কানূন থেকে হাত গুটাতে হবে। ইমামকে এমনিভাবে আনুগত্য ও অনুসরণ করতে হবে যেন তার ভেতর যাবতীয় বিদ'আত, গর্হিত কার্যকলাপ ও প্রবৃত্তি পূজার কোন চিহ্নই আর অবশিষ্ট না থাকে। শরী'আত নির্দেশিত জিহাদ তখনই শুধু পরিপূর্ণতা লাভ করবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ও সমর্থন (নুসরত ও রহমত) তখনই নাযিল হবে।

হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) সোয়াতের রাজধানী খাহ্রে এক বছরেরও অধিককাল অতিবাহিত করেন (১২৪৩ হিজরীর জমাদিউ'ছ-ছানী থেকে ১২৪০ হিজরীর জমাদিউ'ছ-ছানী পর্যন্ত)। শরী'আতের অধিকতর প্রসার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি পাঞ্জেতার গমন করেন। সেখানে একজন আমীর নিযুক্ত করে তার আনুগত্যের উপর জোর দেন এবং এ বিষয়ে 'উলামায়ে দীনের সঙ্গে মত বিনিময় করেন। তারা এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরযের ব্যাপারে নিজেদের অলসতা ও গাফলতি স্বীকার করেন। এ সুযোগে 'উলামায়ে কিরাম ও উপজাতীয় সর্দারদের একটি বিরাট সংখ্যা তাঁর হাতে বায়'আত হয়। পাঞ্জেতারে তিনি ফতেহ খানের উপর (যার কারণেই এ স্থান নির্বাচন কার্যকরী করা সম্ভব হয়েছিলো) একথা সুস্পষ্ট করে দেন যে, তিনি এখানে এই শর্তের উপর অবস্থান করতে পারেন যে, তিনি নিজের নেতৃত্বসুলভ ও আমীরানা অভ্যাস-আচরণ এবং শরী'আতের নিষিদ্ধ সকল প্রথা-পদ্ধতি, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সকল আদব-কায়দা, জাঁকজমক ও পদ থেকে নিজেকে মুক্ত ও পবিত্র ঘোষণা করবেন এবং নিজেকে একজন সাধারণ মানুষের কাতারে গণ্য করবেন,—শর'য়ী ব্যবস্থাপনার সামনে নিজের মস্তক আনুগত্যের প্রতীক হিসাবে ঝুঁকিয়ে দেবেন এবং এ ব্যাপারে নিজের ভাই ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব করবেন না, কোন প্রকার বাহানাবাজী, দর কষাকষি ও মুনাফিকীর আশ্রয় নেবেন না। তিনি সেখানকার 'উলামায়ে কিরাম ও মাদরাসার শিক্ষকমণ্ডলীকে দাওয়াতনামা পাঠান এবং প্রায় দু'হাজার 'আলিম ও তাদের সঙ্গে শাগরিদবৃন্দের একটি বিরাট জামাত—যাদের সংখ্যাও দু'হাজারের কম হবে না—সৈয়দ সাহেবের দাওয়াতে সেখানে শরীক হয়। তিনি উপজাতীয়দের প্রসিদ্ধ সর্দার আশরাফ খান ও খাবী খানকেও ডেকে পাঠান। শা'বান মাসে ঐ সমস্ত 'উলামায়ে

কিরাম, নেতৃবৃন্দ ও উপজাতীয় সর্দারদের একটি বিরাট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সৈয়দ সাহেব 'উলামায়ে কিরাম ও ফকীহ্‌গণের নিকট ফতওয়া চেয়ে পাঠান, যে ইমামের বিরোধিতা করবে কিংবা ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে তার ক্ষেত্রে শর'য়ী হুকুম কি? উপস্থিত 'উলামায়ে কিরাম ও মুদাররিসীন প্রদত্ত ফতওয়ার উপর দস্তখত, সিলমোহর প্রদান করে। জুম'আর সালাত সম্পাদনের পর সমস্ত 'উলামায়ে কিরাম ও সর্দারমণ্ডলী সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর হাতে বায়'আত হন। যারা ইতিপূর্বেই বায়'আত হয়েছিলেন তারাও এতে শরীক হন।

'৪৪ হিজরীর ১৫ই শা'বান তৃতীয় জুম'আর দিনে ফতেহ খান ধর্মীয় জ্ঞানে সুপণ্ডিত, বিজ্ঞ জনমণ্ডলী এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিদের একত্রিত করেন। তিনি (সৈয়দ আহমদ বেরেলভী) এদের সবার থেকে বায়'আত গ্রহণ করেন এবং একজন নেককার 'আলিম মওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ মীরকে পাঞ্জেতার এলাকার 'কাযীউ'ল-কুযাত' নিযুক্ত করেন, শরী'আতের বিধি-বিধান চালু করা হয়, ঝগড়া-বিবাদ তথা মামলা-মোকদ্দমা ইসলামী শরী'আতের আলোকে নিষ্পন্ন করা হতে থাকে। সালাত তরককারী, অনাচারী ও দুষ্কৃতিকারীদের খুঁজে বের করার জন্য এবং তাদের শিক্ষা দেবার জন্য পুলিশ নিযুক্ত করা হয় এবং সত্বরই এই ব্যবস্থাপনার বরকত ও সুফল প্রকাশ পেতে শুরু করে। ধর্মীয় কর্তৃত্ব, মর্যাদা ও সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয়। তাতে করে শত শত বছর থেকে লোকজন যে সমস্ত ন্যায্য হক ছিনিয়ে রেখেছিলো এবং যে সমস্ত জমি-জায়গা ও ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে হস্তগত করেছিলো সে সবই তার প্রকৃত মালিক ও হকদার ফিরে পায়। যে সমস্ত লোকদের হক ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিলো অথবা ইয্‌যত-আবরু ধূলাবলুণ্ঠিত হয়েছিলো তারা অভিযোগ পেশ করে এবং নিজেদের অধিকার লাভ করে। এ ব্যবস্থাপনা অল্পদিনেই যা করে দেখিয়েছিলো বড় বড় সুশৃঙ্খল ও সুসংহত সরকারও তা করতে পারে না। এরূপ কড়াকড়ি আরোপ ও তদন্তের ফল এই হয়েছিলো যে, লোকেরা ইসলাম নির্দেশিত ফরয কাজগুলি সম্পাদনের জন্য পুরোপুরি মশগুল হয়ে যায়। এমনকি পুরো গ্রামে তন্ন তন্ন করে তল্লাশী চালিয়েও এমন একজনকে পাওয়া যেতো না, যে সালাত আদায় করে না। মোটকথা, বহু কাল পর দীন মাথা তুলে দাঁড়ায় ও শক্তি অর্জনে সমর্থ হয় এবং তার প্রভাব-প্রতিপত্তি মানুষের অন্তর মানসে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

ফরাসী জেনারেলের সামনে

বিখ্যাত ফরাসী জেনারেল ভ্যাণ্টোরা (Vantora)[১] তার সৈন্যবাহিনীর সাথে সিন্ধু নদ পার হন এবং হিণ্ড দুর্গে[২] ডেরা ফেলেন। জানা গেলো যে, খাবী খান তাকে ডেকে পাঠিয়েছে। ভ্যাণ্টোরা উপজাতীয় সর্দারদের নিকট পূর্ব নিয়ম মাফিক ট্যাক্স ইত্যাদির দাবী করেন যেমনটি তিনি প্রতি বছর করে আসছেন। কিন্তু এবার উপজাতীয় সর্দারমণ্ডলী ট্যাকস প্রদানে অস্বীকার করে বসে এবং তা এজন্য যে, তারা এবার সৈয়দ সাহে-বের হাতে বায়'আত করেছে এবং তাঁর আনুগত্যকে নিজেদের উপর বাধ্যতামূলক করে নিয়েছে। তাদের মধ্যে ধর্মীয় সম্ভ্রম ও মর্যাদাবোধ এবং পাঠানী তেজস্বিতা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। যখন তারা অনুভব করতে পারলো যে, আসলে ব্যাপারটা বড় সঙ্গীন এবং এ থেকে ভাগবার কোন পথও খোলা নেই তখন তাদের মধ্যে অনেকেই সৈয়দ সাহেবের নিকট গিয়ে আশ্রয় নেয়। ভ্যাণ্টোরা এটা জানতে পেরে নিজ সৈন্যবাহিনীসহ পাঞ্জেতারের নিকটবর্তী গিয়ে অবস্থান নেন ও সৈয়দ সাহেবকে বহু তা'রীফ সম্বলিত একটি চিঠি লেখেন। দরখাস্ত করেন যে, লাহোর সরকারকে

---

১. জেনারেল ভ্যাণ্টোরা (Vantora) রণজিৎ সিংহের বিদেশী বিশিষ্ট সমরনায়কদের অন্যতম ছিলেন। সেখানে তিনি যে সম্মান, মর্যাদা ও আস্থা অর্জন করেছিলেন তা আর কোন বিদেশী সমরনায়কের ছিলোনা। ইনি ছিলেন ইটালীর বিশিষ্ট এক বংশের সাথে সম্পর্কিত। দীর্ঘকাল ধরে নেপোলিয়নের অধীনে স্পেন ও ইটালীর সৈন্যদলে চাকরী করেন। যুদ্ধ সমাপ্তির পর ফ্রান্স থেকে বিদায় নেন এবং সামরিক বাহিনীতে চাকুরীর উদ্দেশ্যে বহির্গত হন। মিসর এবং ইরানেও তিনি কিছুকাল অবস্থান করেন। অতঃপর হিরাত ও কান্দাহারের রাস্তা হয়ে তিনি ভারতে আসেন। মহারাজা তার সততা ও বিশ্বস্ততা, আমানতদারী ও অভিজ্ঞতার উপর পুরো আস্থাশীল হবার পর তিনি নিজের বিশেষ সৈন্যবাহিনীর দায়িত্ব জেনারেলকে সোপর্দ করেন। এই দলটি সামরিক প্রশিক্ষণ ও হাতিয়ার বন্দীতে অন্যান্য বাহিমী থেকে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী ছিলো। তিনি মহারাজার জন্য বিরাট খেদমত আঞ্জাম দেন যদ্দ্বারা তার শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশ্বস্ততার পরিচয় মেলে। মহারাজা তাকে বিশেষ 'ইয্যত ও মর্যাদার চোখে দেখতেন এবং এ জন্যই তাকে তিনি লাহোর অংশের শাসক নিযুক্ত করেন। শাহী দরবারে তার স্থান ছিলো তৃতীয় নম্বরে। ১৮৪৩ খৃস্টাব্দে রণজিত সিংহের মৃত্যুর পর তিনি চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। (স্যর লেপেল গ্রিফিন প্রণীত "RANJIT SINGH" নামক পুস্তক থেকে সংক্ষেপিত, পৃষ্ঠা-৯৭-৯৯)

২. সিন্ধু নদের পশ্চিম পাড়ে একটি মযবুত ও সুদৃঢ় দুর্গ এব শহর যা খাবী খানের শাসনাধীনে ছিলো।

প্রতি বছর যে ট্যাক্স ও উপহার-উপঢৌকন উপজাতিগুলোর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়---তা নিয়মমাফিক দেওয়া হোক। তিনি সৈয়দ সাহেবের এখানে আগমনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে জানতে চান। সৈয়দ সাহেব উত্তরে নিজেদের হিজরত ও জিহাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে বিশ্লেষণ করেন। তাকে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন এবং এও লেখেন যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার একজন অনুগত বান্দা মাত্র; তাঁর নিজের এ ব্যাপারে কোনই হাত নেই। তিনি উক্ত এলাকায় শিখদের জুলুম-নির্যাতন ও অন্যায় হস্তক্ষেপের উল্লেখ করেন এবং পরিশেষে লিখে দেন, সর্দারদের নিকট তাঁর এ ধরনের দরখাস্ত করার কোন অধিকার নেই। তিনি এ চিঠি মওলানা খয়ের উদ্দীন শেরকোটির হাতে দিয়ে—যাকে এ জামা'আতের একজন বিচক্ষণ ও বুযুর্গ ব্যক্তি বলে মনে করা হতো---পাঠিয়ে দেন। মওলানা শেরকোটি এ চিঠি জেনারেল ভ্যান্টোরার হাতে অর্পণ করেন এবং তার সাথে অত্যন্ত সৌজন্যমূলকভাবে কথাবার্তা বলেন। এর ভেতর দিয়ে তাঁর বিচক্ষণতা ও যোগ্যতা, দৃঢ়তা ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

এরপর তিনি যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন এবং তিনশো অশ্বারোহীর একটি কোম্পানী মওলানা খয়ের উদ্দীনের অধিনায়কত্বে পাঠিয়ে দেন। এ কোম্পানী জেনারেল ভ্যান্টোরার সামনে ডেরা ফেলে। অপরদিকে ভ্যান্টোরা মুসলমানদের প্রস্তুতির সংবাদ অবগত হন। আল্লাহ্ তা'আলা মুজাহিদ বাহিনীর সংখ্যাকে দুশমনের চোখে বেশী করে দেখান। নিকটস্থ মৌজা ও বস্তিগুলি থেকে যে সমস্ত লোক পালিয়ে পাঞ্জেতার এসেছিলো এদেরকেও তিনি মুজাহিদ বাহিনীর অন্তর্গত বলে মনে করেন এবং তিনি রাতের বেলা অতর্কিত হামলার আশংকা করেন। ফলে তার মনে এতে ভীতির উদ্রেক হয় এবং পশ্চাদপসরণ করে নদী পার হয়ে তিনি পাঞ্জাব সীমান্ত প্রবেশ করেন।

পরবর্তী বছরে এ অধিনায়কই সৈন্যবাহিনীসহ নির্ধারিত সময়ে এসে উপস্থিত হন এবং সেখানকার উপজাতিগুলো থেকে বাংসরিক দেয় ট্যাক্স ও উপঢৌকন দাবী করেন। এর জওয়াব তাই পাওয়া যায় যা গত বছর পাওয়া গিয়েছিলো। সুতরাং তিনি তার সৈন্যবাহিনী পাঞ্জেতার অভিমুখে চালনা করেন। গত বছর ফিরে যাবার কারণে মহারাজা তাকে ভর্ৎসনা করেছিলেন এবং এটাকে ভীরুতা ও কাপুরুষতা বলে গণ্য করেন। এবার

তিনি অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন এবং তার প্রতি আরোপিত কলংক মুছে ফেলার লৌহ কঠিন সংকল্প গ্রহণ করেন। এবারের সৈন্য সংখ্যা ছিলো দশ হাজার এবং খাবী খানও তাঁর সঙ্গে ষড়যন্ত্র লিপ্ত হয়েছিলো।

হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) উপজাতীয় আমীর-ওমরা ও সর্দারমণ্ডলীর প্রতি চিঠি পাঠান এবং এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, দুই পাহাড়ের মাঝখানে এমন একটি প্রাচীর নির্মাণ করা হোক, যার চওড়া হবে চার হাত পরিমাণ---যাতে করে আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনীকে বাধা দেওয়া যায়। সমগ্র মুজাহিদ বাহিনী এবং চতুষ্পার্শের লোকজন গভীর আগ্রহের সাথে একাজে লেগে যায় এবং খুবই অল্প সময়ের ভেতর তা তৈরীও করে ফেলে। তাঁর খেয়াল হয় যে, ঠিক অনুরূপভাবে পেছনের রাস্তাও বন্ধ করে দেওয়া যাক। সমস্ত মুহাজিরীন এবং মুজাহিদ বাহিনী পুনরায় পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু করে---সৃষ্টি হয় খন্দক যুদ্ধের আর এক নবতর সংস্করণ। মুহাজিরমণ্ডলী জমি ভাগ করে নেয় এবং এর পশ্চাদ-ভাগ নির্মাণে মশগুল হয়ে পড়ে। সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আহযাব (খন্দক) যুদ্ধের ঘটনাবলী বর্ণনা করেন এবং এবং তাদেরকে বলেন---কিভাবে মুসলমানেরা খন্দক খনন করার জন্য নিজেদের ভেতর জমি ভাগ করেছিলো আর স্বয়ং রসূলে করীম (স·) নিজে তাঁদের সাথে শরীক ছিলেন, শুনিয়েছিলেন অনেকতরো ছওয়াব এবং অবধারিত ও নিশ্চিত বিজয়ের সুসংবাদ।

পরদিন ভোরবেলা মুজাহিদ বাহিনী ফজরের সালাত আদায়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিলো---ঠিক এমনি মুহূর্তে খবর পাওয়া গেলো যে, প্রতিপক্ষের অশ্বা-রোহী বাহিনী প্রাচীরের পশ্চাদ্ভাগে পৌঁছে গেছে। এখবর শোনা মাত্র সৈয়দ সাহেব এবং মুজাহিদ বাহিনী অতি সত্বর সালাত আদায় শেষ করে অস্ত্র-সজ্জা ও রণ-প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে ভোরও হয়ে যায়। দুশমনপক্ষ পল্লী ও বস্তিতে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং আকাশ জুড়ে আগু-নের ধোয়ায় ভরে যায়। এরই আড়ালে ও ছত্রছায়ায় তাদের সৈন্যবাহিনী অগ্রাভিযান শুরু করে। অপরদিকে সৈয়দ সাহেবও মুজাহিদ বাহিনীসহ অগ্রসর হন এবং পশ্চাদ্ভাগের সামনে গিয়ে যাত্রাবিরতি দেন। সৈন্য বাহি-নীকে সামরিক কায়দায় সুশৃঙ্খল ও সুসংহত করেন এবং গাযীদের বিভিন্ন স্থানে মোতায়েন করেন। মওলানা মুহাম্মদ ইসমা'ঈল সাহেব বায়'আতে

রিযওয়ানের আয়াতে করীমা মুজাহিদ বাহিনীর সামনে তিলাওয়াত করেন, সাথে সাথে করেন এর ব্যাখ্যাও, বর্ণনা করেন এর ফযীলত। উপস্থিত লোকজন সৈয়দ সাহেবের হাতে আবার নতুনভাবে বায়‘আত গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্‌কে হাযির ও নাজির জেনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, তারা কখনও ময়দান থেকে পশ্চাদপসরণ করবে না, চাই কি চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হোক অথবা শাহাদাত লাভই ঘটুক।

লোকজনের মধ্যে একটি নতুন জীবন, জোশ ও আনন্দ প্রবাহ এবং শাহাদাতের প্রতি গভীর আগ্রহ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সর্বাগ্রে মওলানা মুহাম্মদ ইসমা‘ঈল সাহেব সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর হাতে বায়-‘আত হন। এরপর অন্যান্য লোকজনও এতে শামিল হয়। লোকজনের আনন্দ-উদ্দীপনা ও উৎসাহের প্রাবল্য এরূপ পর্যায়ের ছিলো যে, একে অন্যের গায়ের উপর ঢলে পড়ছিলো। এরূপ নতুন প্রভাব সৃষ্টিকারী দৃশ্য দেখে অনেকের চোখই অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। সৈয়দ সাহেব এ সুযোগে দো‘আ করেন এবং নিজের দুর্বলতা, অসহায় ও লাচার অবস্থা, অসমার্থতা এবং আল্লাহ্ তা‘আলার সামনে নিজেদের দারিদ্র্য-দশা ও প্রয়ো-জনীয়তার কথা অন্তর খুলে ব্যক্ত করেন। সবারই অবস্থা ছিলো আত্ম-হারার ন্যায়। কারোর কোনদিকেই লক্ষ্য ও ভ্রুক্ষেপ ছিলো না। রহমত, তৃপ্তি এবং শাহাদাত লাভের প্রবল গভীর আগ্রহই গোটা পরিবেশকে প্রভাবিত ও আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। প্রত্যেকেই একে অপরের নিকট কৃত অন্যায় অপরাধ মা‘ফ করিয়ে নিতে থাকে। গলাগলি ও কোলাকুলি করে এই বলে বিদায় চেয়ে নিতে থাকে যে, যদি জীবিত থাকি---তবে দুনিয়াতে,---অন্যথায় আল্লাহ চাহে তো জান্নাতে মুলাকাত হবে। সবাই পরস্পরকে ওসীয়ত করতে থাকে যে, যদি কেউ শাহাদাত লাভ করে তবে তাকে ময়দান থেকে উঠাবার পরিবর্তে তারা যেন সামনে অগ্রসর হয় এবং বীরোচিতভাবে দুশমনের মুকাবিলা করে।

সৈয়দ সাহেব যুদ্ধের পোশাক পরিধান করেন এবং অস্ত্রসজ্জিত হয়ে টিলার দিকে এগিয়ে যান। তাঁর সাথে কমবেশী আট হাজার ভারতীয় ও কান্দাহারী মুজাহিদ ছিলো। তিনি তাদের লক্ষ্য করে বলেন,---জলদী করবে না,---তারা যতক্ষণ ফায়ার না করবে ততক্ষণ ফায়ার করবে না এবং টিলা পার হবার চেষ্টাও করবে না। তিনি এও নির্দেশ দেন যে,

মুজাহিদ বাহিনী অধিক থেকে অধিকতরো পরিমাণে সূরা কুরায়শ মুখে তিলাওয়াত করবে। এরপর তিনি চুপ করে একান্তভাবে আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশ করেন। সৈন্যবাহিনীর ভেতর পতাকা উত্তোলন করা হয়। মুহাম্মদ নামে একজন আরব শেখের হাতেও একটি ঝাণ্ডা ছিলো যিনি হজ্জ থেকে ফিরবার কালে তাঁর সঙ্গী দলভুক্ত হয়ে যান আর যিনি ছিলেন অত্যন্ত বিশুদ্ধ মন-মানসের অধিকারী।

জেনারেল ভ্যান্টোরা একটি উঁচু টিলায় আরোহণ করে মুজাহিদ বাহিনীর সংখ্যা ও উপস্থিতি নিরূপণ করতে চেষ্টা করেন এবং এরপর দূরবীন লাগিয়ে যুদ্ধের ময়দান দেখতে থাকেন। তিনি দেখতে পান যে, পুরো ময়দানটি মুজাহিদ বাহিনীর সৈন্যদলে ভর্তি হয়ে আছে। এটা দেখে তার মনে ভীতির সঞ্চার হয় এবং খাবী খানের দিকে লক্ষ্য করে বলতে থাকেন যে, আপনি আমাদের সঙ্গে ধোঁকাবাজি করেছেন এবং মুজাহিদ বাহিনীর শক্তি ও সংখ্যাকে খাটো করে দেখিয়েছেন। এখন পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনীর এই দুরন্ত সৈন্যবাহিনী দেখুন এবং ঐ সব ঝাণ্ডা-গুলিও দেখুন যা ময়দানের চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। অতঃপর আপন সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে নীচে অবতরণ করেন এবং প্রাচীরের সামনে থেমে যান। ইতিমধ্যে শিখ বাহিনী প্রাচীর ভাঙতে শুরু করে। সৈয়দ সাহেবের ইঙ্গিত পাওয়া মাত্রই মুজাহিদ বাহিনী হামলা করে এবং ফায়ার শুরু করে দেয়। ভ্যান্টোরা নিশ্চিত হন যে, পরাজয় অবধারিত। এজন্য তিনি সৈন্যবাহিনীকে পিছু হটবার নির্দেশ দেন। মুজাহিদ বাহিনী পাঞ্জে-তার ছেড়ে আরও কিছু দূর পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করে। মুজাহিদ বাহিনীর সংখ্যা এতো বেশী ছিলো না যতটা জেনারেল ভ্যান্টোরা অনুমান করেছিলেন। এটা ছিলো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই সাহায্য ও সহায়তা---তিনি যেভাবে খুশী---যথায় খুশী এবং যেখানে খুশী আসমান যমীনের সৈন্যবাহিনী দিয়ে কাজ নিয়ে থাকেন।

ভ্যান্টোরার পশ্চাদপসরণ---সম্পূর্ণ হ'লে---মুজাহিদ বাহিনী আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে। পাঞ্জেতারের উক্ত নালার কিনারে ওযূ করে দু'রাকাত শোকরানা সালাত আদায় করে।

وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ط

"যুদ্ধে বিশ্বাসীদিগের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট ছিলেন।"

(সূরা আহযাব, ২৫ আয়াত)

একজন অভিজ্ঞ ফরাসী জেনারেলের পক্ষে যুদ্ধের ময়দান থেকে এ ধরনের পশ্চাদপসরণ যিনি অধিকাংশ যুদ্ধে বিজয়মাল্য লাভ করেছেন, এবং মুজাহিদ বাহিনীর হেডকোয়ার্টার থেকে এমনিভাবে ভেগে যাওয়া এমন একটি ঘটনা ছিলো যার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি বহু দূর-দূরান্তর থেকে শোনা গিয়েছিলো। পল্লী ও শহরাঞ্চলের প্রতিটি জায়গা এ ঘটনার আলোচনায় সরব ও মুখর হয়ে উঠেছিলো। সুতরাং ৪৪ হিজরীর যিলহজ্জ মাসের প্রথম দিকে বিভিন্ন উপজাতির মুসলমান কেন্দ্রে এসে পেঁাছে, সৈয়দ সাহেবের হাতে বায়'আত নেয় এবং শরী'আত ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থাও কবূল করে। সিম্মাতে একটি মযবুত দুর্গ ছিলো যাকে আমানজাঈ বলা হতো। এতে প্রায় বারো হাজার আফগানী থাকতো---যাদের কাজই ছিলো লড়াই-ঝগড়া করা, মরা এবং মারা। এরা সবাই সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর হাতে বায়'আত হয় এবং ওশর[১] আদায়ের ওয়াদাও করে। অন্য এক কবীলার সর্দার মুকার্রাব খানের বিশ্বস্ততা ও নির্দোষিতা বলে প্রমাণিত হয়। মুশরিকদের উপর জিযয়া আরোপিত হয় এবং মুসলমানদের উপর ওশর ধার্য করা হয়।

কিন্তু হিণ্ড-এর শাসনকর্তা খাবী খান শত্রুতা সাধন ও বিদ্বেষমূলক তৎপরতার অব্যাহত ধারা পূর্বের ন্যায়ই বজায় রাখে। সে নিজের ভাগ্যকে ইসলামের দুশমনদের ভাগ্যের সাথে জড়িয়ে ফেলে। পরে সন্ধান মেলে যে, ভ্যান্টোরাকে হামলা করবার উস্কানী সে-ই দিয়েছিলো এবং ব্যাপারটাকে অত্যন্ত হাল্কাভাবে পেশ করেছিলো। খাবী খানই তাকে লোভাতুর করে তুলেছিলো,---সকল শক্তি সম্পদ দিয়ে তাকে সাহায্যও করে এবং সম্পূর্ণরূপে তার খয়ের খা-তে পরিণত হয়েছিলো। তাকে এভাবে ছেড়ে দেওয়া এবং উপেক্ষা করা মুসলিম সাধারণ স্বার্থের মোটেই অনুকূল ছিলো না। এর দ্বারা শর'য়ী ব্যবস্থাপনার প্রভাব-প্রতিপত্তি নিঃশেষ হবার আশংকা ছিলো। মুনাফিকদের বিদ্রোহ করবার এবং মাথাচাড়া দিয়ে উঠবার এতে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি হতো। এজন্য মুজাহিদ বাহিনীর দূরদর্শী

১। ইসলামী রাষ্ট্রে উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশ রাজস্ব হিসাবে আদায় করা হয় যাকে ইসলামী পরিভাষায় 'ওশর' বলা হয়। —(অনুবাদক)

ও চিন্তাশীল মনীষীবৃন্দ বিশেষ করে মওলানা মুহাম্মদ ইসমা'ঈল (র) অভিমত ব্যক্ত করেন যে, এ সমস্ত লোকের উচিত শিক্ষা ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবার প্রয়োজন রয়েছে। যদি তারা আনুগত্য প্রকাশে অস্বীকার করে তবে তাদের অনিষ্টের হাত থেকে বেঁচে থাকবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। তিনি নিম্নোক্ত আয়াত স্বীয় অভিমতের স্বপক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করেনঃ

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا - فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا

عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ

فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا - إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ -

"বিশ্বাসীদিগের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইলে তোমরা তাহাদিগের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিবে; অতঃপর তাহাদিগের একদল অপর দলকে আক্রমণ করিলে তোমরা তাহাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে---যতক্ষণ না তাহারা আল্লাহের নির্দেশের নিকট আত্মসমর্পণ করে। তাহাদিগের মধ্যে ন্যায়ের সহিত ফয়সালা করিবে এবং সুবিচার করিবে। যাহারা ন্যায়বিচার করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালোবাসেন।" (সূরা হুজুরাত, ৯ম আয়াত)

মওলানা মুহাম্মদ ইসমা'ঈল (র·) দুশো মুজাহিদসহ খাবী খানের মুকাবিলায় আসেন, খুবই নম্রভাবে তার সাথে কথাবার্তা বলেন এবং অনেকক্ষণ ধরে তাকে বোঝাতে থাকেন। কিন্তু এর ভেতর কোন কথাই তার অন্তরে রেখাপাত করে না। সব শুনে খাবী খান বললো,---রাগবেন না, আমরা সর্দার ও শাসকস্থানীয় মানুষ; সৈয়দ বাদশাহদের মতো মোল্লা মওলবী নই। আমাদের শরী'আত আলাদা,---তার শরী'আতের উপর আমরা পাঠানরা কিভাবে চলতে পারি! বারবার সৈয়দ বাদশাহ্ আমাদের পেছনে কেন লাগেন? আমাদের ব্যাপারে তার পক্ষে যা কিছু করা সম্ভব তা করা থেকে তিনি যেন মাফ না করেন।

কথা যখন শেষ হয়ে গেলো এবং সৎপথে তার ফিরে আসার কোন সম্ভাবনাই যখন আর বাকী রইলো না, বাকী রইলো না তেমনি আল্লাহ্

ও তাঁর রসূল (স)-এর আনুগত্য ও শরী'আতের হুকুম-আহকাম কবুল করার কোন আশা ---তখন বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ এই সিদ্ধান্ত উপনীত হলেন যে, তাকে তার কৃত আচরণের উপযুক্ত শিক্ষা ও শাস্তি দান করা অবশ্য কর্তব্য। সুতরাং গোটা ব্যাপারটা মওলানা মুহাম্মদ ইসমা'ঈল (র)-এর নিকট সোপর্দ করা হয়। কারণ মুজাহিদ বাহিনীর মধ্যে তাঁর মতো আর কেউ তেমন মরতবা ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন না। এমনকি সৈয়দ সাহেবের বিশিষ্ট ও একান্তজনদের মধ্যেও বীরত্বে ও দূরদর্শিতায়, রাজ-নৈতিক প্রজ্ঞায় এবং নেতৃত্বসুলভ যোগ্যতায় কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না।

মওলানা মুহাম্মদ ইসমা'ঈল (র) পাঁচশো নির্বাচিত ও বাছাইকৃত মুজাহিদ সঙ্গে নিয়ে---যারা ছিলো অত্যন্ত ক্ষিপ্র, চতুর আর বাহাদুরও বটে--হিণ্ড-এর দিকে রওয়ানা হন এবং ভোরের উজ্জ্বল কিরণ রেখা দেখা দেবার মুহূর্তে দূর্গে প্রবেশ করেন।

খাবী খান এরূপ আকস্মিক হামলায় হতভম্ব হয়ে যায় এবং মুজা-হিদ বাহিনীর হাতে মারা যায়। এভাবে ইসলামী সৈন্যবাহিনী এরূপ একটি মযবুত ও দূর্গ-বিশিষ্ট প্রাচীর ঘেরা শহর নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে সমর্থ হয়। এর মধ্যে খাদ্য-শস্য ও অস্ত্র-শস্ত্রের একটি ভাণ্ডারও মওজুদ ছিলো। রাত্রিকালীন অতর্কিত এই হামলা পরিচালনাকালে শুধু মাত্র খাবী খান এবং একজন কৃষক মারা গিয়েছিলো। মুজাহিদ বাহিনীর কারো সামান্যতম আঁচড়ও লাগেনি। মোটকথা, ব্যাপারটির অত্যন্ত নিরাপদ উপায়ে নিষ্পত্তি ঘটে এবং মুজাহিদ বাহিনী একটি বড় ধরনের ফিতনা থেকে নাজাত পায়, যা মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতিকে নিঃশেষ করে চলেছিলো এবং এর শক্তিকে দীর্ঘকাল থেকে কমযোর ও দূর্বল করে ফেলছিলো।

এখন বাকী রইলো ইয়ার মুহাম্মদ খানের পালা। সে ছিলো এই ফিতনার চূড়ান্ত মধ্যমণি। মুজাহিদ বাহিনীর বিরুদ্ধে সে বরাবর চক্রান্ত করে চলছিলো আর লক্ষ্য রাখছিলো বাতাস কোন খাতে বইছে। সে নিজস্ব ধ্বংসাত্মক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূর্ণমাত্রায় হাসিলের জন্য সৈয়দ সাহেবের জীবন নাশের চক্রান্ত করে। শিখদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করে যে, হিণ্ড-এ অবস্থিত মুজাহিদ বাহিনীকে দমন করার জন্য লাহোর সরকার যেন নিজেদের সৈন্যবাহিনী পাঠান এবং খাবী খানের পরিবর্তে

আমীর খানকে সেখানকার শাসনকর্তা বানিয়ে দেন। তারা তাদের বাহিনী আমীর খানের কেন্দ্র হরিয়ানায় অবতরণ করায়। তাদের সঙ্গে ছিলো ছ'টি কামান, হাতী ও উটের একটি বিরাট সংখ্যা এবং একটি বিশাল সৈন্যবাহিনী। হরিয়ানা পৌঁছুতেই তারা কামান দাগতে শুরু করে। উদ্দেশ্য ছিলো, স্থানীয় বাসিন্দা--যারা গোলার আওয়াজে খুবই ভয় পেতো---তাদের অন্তরে প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করা। এর ফলে দোদুল্যমান ও মুনাফিক শ্রেণীর লোক তাদের দলে গিয়ে শামিল হয় এবং তারা পল্লীবাসীদের ধন-সম্পদ লুটপাট এবং ক্ষেতের ফসলাদি ধ্বংস ও বরবাদ করতে শুরু করে আর চারদিকে ছড়িয়ে দেয় ধ্বংস ও বিভীষিকার রাজত্ব। দু'দল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ছোটখাটো সংঘর্ষ চলতে থাকে কিন্তু ফলাফল থাকে অনিশ্চিত।

এরূপ অস্থির ও বিব্রতকর অবস্থায় সৈয়দ সাহেব ও ইয়ার মুহাম্মদ খানের ভেতর কয়েক দফা যোগাযোগ স্থাপিত হয়। সৈয়দ সাহেব তাকে বহু বোঝাতে চেষ্টা করেন,---আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করিয়ে দেন, সতর্ক করে দেন বিদ্রোহাত্মক আচরণের পরিণতি সম্পর্কে। কিন্তু ইয়ার মুহা-ম্মদ খান সন্ধির এ পয়গামকে গর্ব, অহমিকা ও অত্যন্ত বিদ্বিষ্ট মন-মানসিকতার সঙ্গে শোনে এবং একে পরিপূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে।

এখন মুজাহিদ বাহিনীও যুদ্ধের জন্য মজবুর হয়ে পড়ে। আটশ' পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে তারা অতর্কিতে ইয়ার মুহাম্মদ খানের কাছে পৌঁছে যায়। এ বাহিনীর নেতৃত্ব ছিলো মওলানা মুহাম্মদ ইসমা'ঈল (র)-এর হাতে। যায়দা নামক স্থানে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুজাহিদ বাহিনী অসাধারণ সাহসিকতার সঙ্গে সামনে এগুতে থাকে ও না'রায়ে তকবীর ধ্বনি তোলে এবং একটি অংশ খুব দ্রুততার সঙ্গে অগ্রসর হয়ে সকলের আগে শত্রু বাহিনীর কামান ইউনিটটি হস্তগত করে ফেলে। এ অবস্থা দেখে দুররানী বাহিনীর পদস্খলন ঘটে এবং নিজেদের সকল সাজ-সামান যুদ্ধের ময়দানে ফেলে রেখে পালাতে শুরু করে---এমন কি ভীতিবিহ্বলতার ভেতর নিজেদের জুতো পরতে পর্যন্ত তারা ভুলে গিয়েছিলো। মুজাহিদ বাহিনী সেখানে পৌঁছার পরও সেখানে বহু জুতো পড়ে থাকতে দেখা যায়। দুররানীরা পালাবার সময় এসব ফেলে গিয়েছিলো এবং মুজা-হিদ বাহিনী এগুলো হস্তগত করে। ডেকচীগুলো চুলোর উপরই ছিলো, খাবার রান্না হয়ে গিয়েছিলো প্রায়, কিন্তু দ্রুততা ও হতবিহ্বলতার কারণে

তাদের খানা খাবার আর মওকা মেলেনি। ইয়ার মুহাম্মদ খান এ যুদ্ধে মারাত্মক আহত হয়েছিলো এবং একটি বিশেষ স্থানে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। পথিমধ্যে সে পরলোক গমন করে। মুসলমানেরা বহু যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হস্তগত করে এবং বহু অস্ত্র-শস্ত্রও তাদের হাতে আসে। কিছু কিশোরীও পাওয়া যায়। তাদেরকে দুররানীরা নিকটবর্তী পল্লী অঞ্চল থেকে অপহরণ করে এনেছিলো। মওলানা মুহাম্মদ ইসমা'ঈল (র) এসব কিশোরীকে তাদের নিজেদের বাড়ীতে পৌঁছে দেন।

সৈয়দ সাহেব পাঞ্জেতার বিজয়ী হয়ে ফিরে আসেন এবং এ বিজয়ে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে শুকরিয়া আদায় করেন। লোকজন তাঁকে অভিনন্দন জানাতে একত্রিত হতে থাকে। মুবারকবাদ ও আল্লাহ্র প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপনে গোটা পরিবেশ মুখরিত হয়ে ওঠে। সৈয়দ সাহেব দাঁড়িয়ে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (মালে গনীমত) চুরির নিন্দায় বক্তৃতা করেন এবং তাদের জন্য যে সাবধান বাণী এসেছে সে সম্পর্কে তাদের সতর্ক করে দেন। এটাও বলে দেন যে, এর দ্বারা ইসলাম ও মুসলিম স্বার্থের কিরূপ ক্ষতি সাধিত হয়েছে, তদুপরি এর দ্বারা নেক আমল এবং জিহাদের পুরস্কার কেমনভাবে বিনষ্ট হয়েছে। তাঁর এ বক্তৃতা স্থানীয় অধিবাসীদের মনে দারুণ রেখাপাত করে এবং তারা যুদ্ধের ময়দান থেকে যা কিছুই লুট করেছিলো এবং যেগুলোর অধিকারী ছিলো একমাত্র বায়তু'ল-মাল---সেগুলো সব এনে মসজিদের নিকট স্তূপীকৃত করে। এসবের মধ্যে ছিলো পাঁচশো ঘোড়া, বহু তাঁবু, শামিয়ানা ইত্যাদি। এর এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা হয় এবং বাকী অংশ আল্লাহ্ ও তদীয় রসূল করীম (স)-এর হুকুম এবং কুরআন ও সুন্নাহ্ বর্ণিত নীতির ভিত্তিতে বন্টন করা হয়। পদাতিক বাহিনীকে এক ভাগ এবং অশ্বারোহীকে দু'ভাগ দেয়া হয়। মুজাহিদ বাহিনী গনীমতে তাদের অংশ পাবার পর বলে যে, যেহেতু আমাদের প্রয়োজনীয় রেশন-সামগ্রী বায়তুল মাল থেকে আমরা পেয়ে থাকি,---আর আমাদের প্রয়োজন যেহেতু সেখান থেকেই পূরণ করা হয়---সেহেতু এ হিস্যা আমাদের নেবার কোনই অধিকার নেই। এ সব কিছু বায়তুল মালে যাওয়াই উচিত। সৈয়দ সাহেব একথা শুনে বললেন যে, এগুলো তোমাদেরই হক এবং অধিকারভুক্ত; যে ভাবে চাও তা ব্যয় করতে পারো। এটা শুনে অধিকাংশ লোকই নিজেদের হিস্যা বায়তুল মালে জমা দিয়ে দেয় এবং যারা তুলনামূলকভাবে ও অপেক্ষাকৃত অভাবী---তারা এথেকে নিজেরা উপকৃত হয়।

এই বিজয়ের ফলে ওখানকার লোকদের উপর এর গভীর প্রভাব পড়ে। যে রাস্তা মুজাহিদ বাহিনীর জন্য ছিলো রুদ্ধ তা খুলে যায় এবং মুজাহিদ ও মুহাজিরদের কাফেলা নিরাপদে ভারতবর্ষ থেকে আসতে থাকে। তদুপরি যে সাহায্য ও টাকা-কড়ি তারা ভারতবর্ষ থেকে এখানে পৌঁছুতে চাইতো নিরাপদেই তা পৌঁছুতে শুরু হয় এবং ইসলামের শান-শওকত তথা প্রভাব-প্রতিপত্তি চারদিক থেকে দৃষ্টিগোচর হতে থাকে।

খাবী খানের ভাই আমীর খান জায়গা-জমি নিয়ে ঝগড়া-বিবাদে প্রতিপক্ষের হাতে নিহত হয়। তাদের সঙ্গে তার দীর্ঘদিন থেকে দুশমনী ছিলো। ফলে দাওয়াত ও জিহাদের জন্য পরিবেশ ও আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে যায়। সত্যের পথ থেকে বাধা-বিপত্তি এবং সকল প্রতিবন্ধকতা বেশ খানিকটা দূরীভূত হয়। মন্দ কাজের পরিণতি মন্দ লোকদের ভাগ্যে পৌঁছে যায় এবং আল্লাহ্ তা'আলার এ ফরমান অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়ঃ

وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ط

"কূট ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্রকারীদিগকেই বেষ্টন করে।"

(সূরা ফাতির, ৪৩ আয়াত)

ওয়াদা পালনে সত্যবাদী, কথায় অটল, অনড়

উপজাতীয় সর্দারদের—যারা মুজাহিদ বাহিনীর সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত অথবা যাদের মুনাফিকী প্রকাশ্য দিবালোকে উদ্ভাসিত এবং যারা দুশমন পক্ষে চক্রান্তে লিপ্ত ছিলো—তাদের কয়েকটি সামরিক কেন্দ্র ও গুরুত্বপূর্ণ আড্ডা মুজাহিদ বাহিনী অধিকার করে নেয়। এসব কেন্দ্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিলো 'আশারাহ ও আম্ব কেন্দ্র। এখানকার শাসন কর্তৃত্বে ছিলো পায়েন্দা খান। ছতরবাঈও তার অন্যায় হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপদ ছিলো না।

ফুলড়া[1] নামক স্থানে শিখ ও মুজাহিদ বাহিনীর মধ্যে একটি বড় রকমের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আর এ যুদ্ধও হয়েছিলো অত্যন্ত প্রচণ্ড। এ

১. ফুলড়া মানশেহ্রা থেকে দশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত পাহাড়ের মাঝে একটি আবাদী বসতি। এর মাঝ দিয়ে নহরে সরণ প্রবাহিত।

যুদ্ধেই সৈয়দ সাহেবের ভাতিজা সৈয়দ আহমদ আলী শহীদ হন। তিনি যুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং পাহাড়ের মতো নিজে অটল, অনড় থাকেন। তাঁর এরূপ দৃঢ়তা প্রদর্শন ও আত্মোৎসর্গ ইসলামী ইতিহাসের মূতার যুদ্ধের কথাই আর একবার স্মরণ করিয়ে দেয়। এ যুদ্ধে তিনি সায়্যিদানা হযরত জা'ফর ইবন আবূ তালিব (রা)-এর অনুসরণ করেন। তার বন্দুক বেকার হয়ে গেলে তিনি বন্দুকের বাট দ্বারাই শাহাদাত বরণ পর্যন্ত লড়তে থাকেন। এ যুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনী নিজেদের রণনৈপুণ্য ও বীরত্ব প্রমাণের বেশ সুযোগ পেয়েছিলো। প্রত্যেকেই বীর পুরুষের মতো ও বাহাদুরীর সঙ্গে লড়েছিলো এবং পাহাড়ের ন্যায় নিজ নিজ জায়গায় ছিলো অটল।

এই সব যুবকের মধ্যে মীর আহমদ আলী বিহারীও ছিলেন। তিনি বন্দুক চালাতে এবং অব্যর্থ লক্ষ্য ভেদে এতই উস্তাদ ছিলেন যে, পুতুলের ন্যায় ক্ষুদ্র জিনিসের উপর নিশানাবাজিতেও তার লক্ষ্য ব্যর্থ হতো না। তার অব্যর্থ গুলীর আঘাতে দুশমনদের বিরাট সংখ্যক ঘোড়সওয়ার মারা যায়। শত্রুরা তাকে ঘেরাও করে ফেলে এবং বড় বড় ঘোড়সওয়ার ও যুদ্ধবাজ যুবক তার চারপাশে জাল সদৃশ ব্যূহ তৈরী করে। অসম সাহসী ও সিংহ-হৃদয় যুবক তাদের সবাইকে চ্যালেঞ্জ দেন যে, তোমাদের আল্লাহ্‌র দোহাই! আমার উপর গুলী চালিও না। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আগে আমার হাতের কৌশল দেখে নাও,—আমার তলোয়ারবাজি ও বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে যাই। আমি ওয়াদা করছি এ বেষ্টনী থেকে বের হবার কোন চেষ্টাই আমি করবো না। এরপর যুবক মীর আহমদ আলী তলোয়ার নিয়ে এমনি খেলা শুরু করলেন যেন এটা যুদ্ধের ময়দান নয়,—কোন খেলার মাঠ এবং কুরবানী নয়—কোন শিল্পকলার অপূর্ব নৈপুণ্য প্রদর্শনী। তিনি তার এই অপূর্ব শিল্পশৈলীর প্রদর্শন করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন। মাথা, কাঁধ ও মেরুদণ্ড কেটে কেটে চারদিকে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিলো। শেষ অবধি জনৈক দশমন গুলী চালিয়ে দেয় এবং তিনি শাহাদাতের অমর সৌভাগ্যে ধন্য হন।

সৈয়দ সাহেব স্বীয় ভাতিজা সৈয়দ আহমদ আলীর শাহাদাতের খবর পেয়ে বললেন,—আলহামদুলিল্লাহ্! এরপর তিনি বহুক্ষণ চুপ করে থাকেন। বর্ণনাকারী যখন তাঁকে এ সংবাদ দেয় যে, সব ক'টি আঘাতই তাঁর মুখমণ্ডলে লেগেছিলো—তখন তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রুর অবিরল ধারা প্রবা-

হিত হতে থাকে। তিনি দু'হাতে চোখের পানি মুছে ফেলছিলেন আর বলছিলেন,—আলহ়ামদুলিল্লাহ্ ! আলহ়ামদুলিল্লাহ ! নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র এ বাণী অবধারিতভাবে সত্যঃ

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه - فمنهم من قضى
نحبه و منهم من ينتظر - وما بدلوا تبديلا -

"বিশ্বাসীদিগের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহর সহিত কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়াছে, উহাদিগের কেহ কেহ শাহাদত বরণ করিয়াছে এবং কেহ কেহ প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। তাহারা তাহাদিগের লক্ষ্য পরিবর্তন করে নাই।"
(সূরা আহযাব, ২৩ আয়াত)

এই পাখীর বাসা অনেক উর্ধ্বে

সিন্ধু নদের এপারে মুজাহিদ বাহিনীর তৎপরতা লাহোর সরকারের ঘুমকে হারাম করে দিয়েছিলো। এর ফলে তাদের সার্বক্ষণিক অস্থিরতা ও মানসিক উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার ভেতর কাল কাটাতে হচ্ছিলো। রঞ্জিৎ সিংহ ছিলেন সে সব সামরিক অধিনায়কদের একজন, যাদের বিশ্বাস ছিলো যে, আগুনের সামান্য ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ফুলকীটাকেও কখনো অবজ্ঞা ও অবহেলা করতে নেই। তিনি মনে করতেন যে, এই জিহাদী আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সমঝোতার দরওয়াজা এখনো খোলা আছে এবং এ বিপদ ও আশংকার হাত থেকে নাজাত পাওয়া এখনও সম্ভব। তার মনে বারবার এ ধারণা উঁকি মারছিলো যে, তিনি (সৈয়দ আহমদ বেরেলভী) একজন উঠতি, সম্ভাবনাময় ও ভাগ্যান্বেষী যুদ্ধবাজ ব্যক্তি; তাঁকে কিছু জায়গা-যমিন কিংবা জায়গীর প্রদান করেই খুশী রাখা যাবে। তার নিজের জীবনে বহু আমীর-ওমরা, অভিজাত ব্যক্তি ও উপজাতীয় সর্দার, 'উলামা ও মাশায়েখের ক্ষেত্রে এ ধরনের অভিজ্ঞতা রয়েছে যারা বহু জোরে-শোরে জিহাদের ঝাণ্ডা উড্ডীন করেছিলো এবং নিজেদের চারপাশে বহুসংখ্যক যুদ্ধবাজ ও উচ্চ পদপ্রার্থীদের সমাবেশ ঘটাতে সমর্থও হয়েছিলো,—কিন্তু শেষ অবধি কোন জায়গীর ও জায়গা-জমি মিলতেই হাত-পা গুটিয়ে বসে গেছে অথবা সরকার তাদের

জন্য কিছু বৃত্তি কিংবা মাসোহারা নির্দিষ্ট করে দিয়েই পরম নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে।

রঞ্জিৎ সিংহ এ পদ্ধতিই আমীরু'ল-মুজাহিদীনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চাইলেন। সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তাঁর সাথে দর কষাকষি করতে হবে যেন প্রয়োজনবোধে বাড়ানোও যায়---যাতে করে আগুনের এ ফুলকীটি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে সীমান্ত ও আফগানিস্তানকে গ্রাস করতে না পারে এবং উপজাতীয়দের ভেতর জিহাদের প্রেরণা যেন সঞ্চার করতে না পারে যা কিনা তার সিংহাসনের জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়াবে। এতদুদ্দেশ্যে লাহোর সরকার হাকীম 'আযীযুদ্দীন-এর নেতৃত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধি দল পাঠায়। হাকীম সাহেব ছিলেন সরকারের বিশেষ উপদেষ্টা ও সদস্য এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অধিকারী ও সরকারের একজন খায়ের-খাঁ। মহারাজা তার একনিষ্ঠতা, বুদ্ধি ও প্রখর মেধাশক্তির উপর পূর্ণ আস্থা-শীল ছিলেন। তাকে সাহায্য ও সহায়তা প্রদানের জন্য তিনি জেনারেল ভ্যান্টোরাকে সাথে পাঠান এবং দু'জনকে বিশেষভাবে বলে দিয়েছিলেন যে, তারা যেন সৈয়দ সাহেবের সাথে কথাবার্তা বলে তাঁকে সন্তুষ্ট ও শান্ত করার চেষ্টা করেন। হাকীম 'আযীযুদ্দীন সাহেবের সাথে একটি চিঠিও মহারাজা পাঠিয়ে ছিলেন যার ভেতর তিনি অত্যন্ত নরম ও মোলায়েম ভঙ্গী অনুসরণ করেন। সৈয়দ সাহেবের তা'রীফ এবং তাঁর ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক মর্যাদার স্বীকৃতিও এতে ছিলো। তিনি লিখেছিলেন যে, যদি তিনি রাজত্ব করতে আগ্রহী হন তবে মহারাজা তাঁকে সিন্ধুনদের এপারের সমগ্র এলাকা দিতেই প্রস্তুত আছেন। তিনি যেমনটি চাইবেন ---সেভাবেই গোটা ব্যবস্থা-পনা পরিচালনা করতে পারবেন এবং এরূপ ক্ষেত্রে মহারাজা তাঁর থেকে বাৎসরিক কোন ট্যাক্সও চাইবেন না। সৈয়দ সাহেব নিজস্ব গণ্ডীতে যিক্‌রে ইলাহী ও 'ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকুন এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ও উপজাতীয় ঝগড়া-বিবাদ থেকে দূরে অবস্থান করুন,---যুদ্ধ-জিহাদের খেয়াল পরিত্যাগ করুন অথবা মহারাজার সাথে মিলিত হোন। এমতাবস্থায় তাঁকে মহারাজার সৈন্যবাহিনীর সিপাহসালার নিযুক্ত করা হবে।

সৈয়দ সাহেব প্রতিনিধিদলকে অত্যন্ত উদারচিত্তে ও উত্তম ব্যবহার এবং গভীর ধৈর্য ও স্থৈর্যের সাথে অভ্যর্থনা জানান। তিনি মহারাজার মুসলিম দূতের সামনে হিজরত, জিহাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং যেসব

বিষয় ও কার্যকারণ তাঁদেরকে এত দূর-দরাজ এলাকায় টেনে এনেছে, মযবুত ও শক্তিশালী হুকূমতের মুকাবিলায় দাঁড় করিয়েছে---সব বিস্তারিত খুলে বলেন।

মুসলিম দূত সৈয়দ সাহেবের এ ভাষাকে বুঝতেন এবং তাঁর ঈমানী প্রেরণার পরিমাপও জানা ছিলো যা এই সম্ভ্রম ও মর্যাদাবোধে উদ্দীপ্ত মু'মিনের অন্তর রাজ্যে বাসা বেঁধেছিলো এবং এই গোটা আলোচনার উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলো। স্বীয় দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, অসাধারণ মেধাশক্তি, অগাধ জ্ঞান এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়ার কারণে তাঁর আন্দাজ ছিলো যে, তিনি (সৈয়দ সাহেব) অন্য ধরনের মানুষ। তাঁকে সাধারণ সিপাহ্সালার যুদ্ধবাজ এবং দর কষাকষি সৃষ্টিকারী লোকদের দাঁড়িপাল্লা দিয়ে মাপা যায় না যারা জিহাদ ও যুদ্ধকে শুধুমাত্র ক্ষমতার মসনদ এবং বিত্ত-সম্পদ হাসিলের মাধ্যম ও সিড়ি হিসেবে গ্রহণ করে। তিনি অনুভব করতে পারেন যেন কোন ঈমানী কারেন্ট তার অন্তরকে স্পর্শ করছে এবং তার প্রবাহ শরীর ও শিরা-উপশিরায় সঞ্চারিত হচ্ছে। সৈয়দ সাহেবের ঈমানী কুওত, গভীর আস্থা ও সুদৃঢ় প্রত্যয় তাঁকে কাবু করে ফেলছে।

সৈয়দ সাহেব তাকে বললেন ঃ

"আমরা মুসলমানরা যারা এই দেশে এসেছি তারা কোন রাজ্য ছিনিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে কিংবা রাজত্ব করবার কোন আগ্রহ নিয়ে আসিনি। আমরা তো এসেছি শুধুমাত্র 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্'র উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহ্র কলেমাকে সমুন্নত ও বুলন্দ করার জন্যে। যে রঞ্জিৎ সিংহ এতবড় বিরাট ভূখণ্ড দেবার লোভ দেখাচ্ছেন---তিনি যদি তার সমগ্র দেশটাও দিয়ে দেন তবুও আমরা তার মুখাপেক্ষী নই। হাঁ! তিনি যদি মুসলমান হয়ে যান তবে তিনি আমাদের ভাই হবেন আর আল্লাহ্র ফযলে যে পরিমাণ ভূখণ্ড আমাদের হাতে এসেছে আমরা তাও তাকে দিয়ে দেবো। অধিকন্ত তার নিজের দেশ তো রইলোই।"

হাকীম সাহেব বললেন---,আমরা লোকমুখে আপনার অবস্থাদি সম্পর্কে এতদিন যা শুনে এসেছিলাম তার চেয়েও অনেক বেশী আমরা পেলাম। আপনার দাবী সত্য। আমাদের কাছে এর উত্তরে "আমান্না ও সাল্লামনা (আমরা বিশ্বাস করলাম ও অবনত মস্তকে মেনে নিলাম) ব্যতীত আর কোন জওয়াব

নেই। সৈয়দ সাহেব অত্যন্ত আদর-সমাদর ও ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে নিজের কাছেই হাকীম সাহেবের থাকার ব্যবস্থা করেন এবং মেহমানদারী করেন। তাঁর এ সৈন্যবাহিনীতে ডোগরা বাহিনীর একজন জমাদার রঞ্জিৎ সিংহের কোন ব্যাপারে নাখোশ হয়ে চলে এসেছিল। সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) তাকে এবং আরো পঞ্চাশ-ষাটজন ডোগরাকে কর্মচারী হিসেবে রেখে দেন। এদের নামে মহারাজার একটি পরওয়ানা হাকীম সাহেব এনেছিলেন যেন তারা নিজেদের লোকের সাথে চলে আসে। হাকীম সাহেব উক্ত পরওয়ানা উল্লিখিত জমাদারকে দেন এবং নিজের সাথে তাকে নিয়ে যেতে চাইলেন। সে এসে সৈয়দ বেরেলভী (র)-এর খেদমতে সব কিছু খুলে বলে। তিনি তাকে বললেন,—এ ব্যাপারে তুমি স্বাধীন। যদি তুমি ইচ্ছা করো তবে চলে যেতে পার। উক্ত জমাদার এবং তার সাথীদের বেতনাদি যা কিছু বকেয়া ছিলো পরিশোধ করে দেয়া হয়। হাকীম 'আযীযুদ্দীন সাহেব বিদায় নিতে চাইলে তিনি মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহের নামে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত জানিয়ে একটি চিঠি লিখে দেন যা 'আযীযুদ্দীন সাহেবকে তিনি মুখে বলেছিলেন।

অপর দিকে জেনারেল ভ্যান্টোরা এক বিরাট বাহিনীসহ (যা বারো হাজার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর সমষ্টি ছিলো) পেশোয়ারের নিকটবর্তী লাণ্ডে নদীর ধারে এসে অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি ইচ্ছে প্রকাশ করেন যে, মুজাহিদ বাহিনীর কোন বিচক্ষণ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিকে তার সাথে মুলাকাতের উদ্দেশ্যে যেন পাঠানো হয় যাতে করে তিনি এ সমস্যার ব্যাপারে তার সাথে আলোচনা করতে পারেন। সৈয়দ সাহেব এতদুদ্দেশ্যে মওলানা খয়ের উদ্দীন শেরকোটিকে মনোনীত করেন। তাঁকে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে অত্যন্ত বিজ্ঞ ও চাতুর্যের অধিকারী বলে মনে করা হতো এবং তিনি সঠিক ও যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী, উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন এবং উত্তম আলোচক ছিলেন। সৈয়দ সাহেবও তাঁর প্রতিভা ও যোগ্যতার প্রশংসা করতেন, স্বীকৃতি দিতেন এবং মওলানার উপর তাঁর আস্থাও ছিলো গভীর।

মওলানা খয়ের উদ্দীন শেরকোটি অস্ত্রসজ্জিত হয়ে ফরাসী জেনারেলের তাঁবুতে তার সাথে সাক্ষাত করেন।

তিনি দেখতে পান যে, দু'জন বিলেতী অফিসার (জেনারেল ভ্যান্টোরা ও জেনারেল এ্যালার্ড) নিজেদের চেয়ারে উপবিষ্ট। একটি ছোট্ট টেবিল তাদের সামনে রাখা। এছাড়া আর দ্বিতীয় কোন চেয়ার তাঁবুতে নেই। অবশ্য

একটি উত্তম ও অত্যন্ত বড় ধরনের কার্পেট টেবিলের নীচে বিছানো রয়েছে। হাজী বাহাদুর শাহ্ খান,—"আস্‌সালামু 'আলা মানিত্তাবা'আল-হুদা" (সত্যাশ্রয়ীদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলে প্রবেশ করলেন এবং টেবিলের নিকট বসে গেলেন। উযীর সিংহ তাঁবুর দরজায় এবং ভ্যান্টোরা সাং-বাদিক ও হাকীম 'আযীযুদ্দীনকেও ডেকে নিয়ে দূতদের পাশে বসালেন।

ভ্যান্টোরা দূতদের প্রতি সম্বোধন করে বললেন,--আপনাদের ভেতর মওলবী কে? হাজী সাহেব মওলবী খয়ের উদ্দীনের দিকে ইশারা করলেন। ভ্যান্টোরা ছিলেন যুবক আর ফার্সী ভাষায়ও তার যথেষ্ট দখল ছিলো। তিনি বললেন, আমি আপনার সাথে কিছু জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক কথা-বার্তা বলতে চাই। মওলবী খয়ের উদ্দীন সাহেব বললেন,---যদি আলাপ-আলোচনা ধর্মীয় বিষয় ও সমস্যাদি নিয়ে হয় তবে পরিষ্কার, খোলামেলা ও তিক্ত জওয়াবের জন্য বেজার হবেন না--তেমনি হবেন না অন্যায়ভাবে উত্তেজিত।—অন্যথায় এ ধরনের কথা-বার্তার কোন প্রয়োজন নেই। ভ্যান্টোরা বললেন, --যা কিছু আপনার মনে আসে নির্দ্বিধায় বলুন, মনে কিছু নেব না। কিন্তু জওয়বাব পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও বিজ্ঞজনোচিত হওয়া চাই। আর তা এজন্য যে, আমি আপনার ধর্ম সম্পর্কে জানি। বিশেষ করে আমি আপনাদের ইতিহাস ও ধর্মীয় বিষয়ক কিতাবাদি অনেক পড়েছি। অন্য বিলেতী অফিসারটি (এ্যালার্ড) ছিলেন বয়স্ক এবং কথা-বার্তা খুব কম বলেন,---চুপচাপ বসে কাটান।

ভ্যান্টোরা আলোচনা শুরু করলেন এবং বললেন যে, আমাদের ডেরা হাযারাতে থাকাকালে দৃশ্যত একজন ফকীর খলীফা সাহেবের পক্ষ থেকে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলো। তিনি বলেছিলেন যে, যদি খালসা সরকার (মহারাজা) মালিক ইউসুফজাই-এর রাজস্ব আমাদের মারফতে উশুল করেন—তবে সরকার সৈন্যবাহিনী পরিচালনার তকলীফ ও জোরযবরদস্তি প্রয়োগের হাত থেকে ছুটি পান। এলাকার লোকেরাও প্রতি বছর ধ্বংস ও পয়মাল, বিরান ও আগুন লাগাবার মুসীবত থেকে বেঁচে যায়। আমাদের একথা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ বলে মনে হয়েছিলো,—কারণ এর ভেতর উভয় পক্ষের কল্যাণই নিহিত ছিলো। সরকারকে হাঙ্গামা, গোলযাগ এবং প্রজাদের হয়রানী ও পেরেশানীর হাত থেকে চিরদিনের তরে নাজাত মিলে যায়। আমি জানতে চাই যে, একথা কি সত্যি?

মওলবী খয়ের উদ্দীন সাহেব বললেন,--একথা একেবারেই বাহুল্য ও একদম ভিত্তিহীন। এই বাহুল্য লোকটি শুধুমাত্র নিজের জান বাঁচাবার জন্য নিজের থেকে মনগড়া কথা বানিয়েছে। খলীফা সাহেবের কাফিরদের আনুগত্য এবং তাদের রাজস্ব প্রদানের সাথে কি সম্পর্ক? কারণ তিনি এই দূর-দরাজ এলাকায় রাজ্য ও জায়গীর লাভের জন্য আসেন নি।

ভ্যান্টোরা বললেন,---আচ্ছা! যদি এ ধরনের লোভ না থাকে তবে এরূপ সাজ-সরঞ্জামহীন অবস্থায় এমন একজন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কেন তিনি সংগ্রামে লিপ্ত যিনি ধনভাণ্ডার, অফিস-আদালত ও বিরাট সৈন্যবাহিনীর অধীশ্বর? মওলবী সাহেব বললেন, আপনি শুনে থাকবেন যে, খলীফা সাহের ভারত-বর্ষের বুকে জাঁক-জমক ও মান-মর্যাদার অধিকারী,---লাখ লাখ মানুষ অত্যন্ত গর্ব ও আনন্দের সাথে তাঁরই মুরীদ দলভুক্ত। তিনি সেখানে উঁচু আমীর-ওমরাদের মতোই আরাম-আয়েশের জীবন যাপন করতে পারতেন, দেশ ত্যাগ এবং পাহাড়-পর্বত ও পথ-প্রান্তর অতিক্রম করবার দরকার ছিলো না তাঁর।

ভ্যান্টোরা বললেন,--হাঁ! আমার জানা আছে যে, খলীফা সাহেব যেখানে ছিলেন সেখানে তার এরূপ আরাম-আয়েশ, 'ইযযত ও মর্যাদা ছিলো এবং সেখানকার সরকার প্রধানও তাঁকে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদা এবং খাতির যত্ন করতেন। মওলবী সাহেব বলেন, "এমন সহায়-সম্পদ, 'ইযযত -মর্যাদাকে বিদায়-সালাম জানিয়ে সফরের দুঃখ-কষ্ট, স্বদেশের বিচ্ছেদ এবং একটি কাল্পনিক আশা-ভরসার পেছনে দিবা-রাত্র কঠোর পরিশ্রম ও ক্লেশদায়ক জীবন অবলম্বন এবং সাজ-সরঞ্জামহীন অবস্থা সত্ত্বেও একটি শক্তিশালী দুশমনের মুকাবিলা করার সুদৃঢ় অভিপ্রায় রাখা--যিনি একটি দেশের ও বিরাট সৈন্যবাহিনীর মালিক---কোন মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি সমীচীন মনে করবে?

"এবার খেয়াল করে শুনুন যে, এর পেছনে নিহিত উদ্দেশ্যটা কি। আপনার জানা আছে যে, দীন ইসলামের পাঁচটি বিধান ফরয হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো পালন করার জন্যে আল্লাহ্ রাব্বু'ল-'আলামীনের তরফ থেকে শক্ত তাকীদ এসেছে; আর সেগুলি হলো সালাত, সিয়াম, যাকাত, হজ্জ এবং জিহাদ। সালাত আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয---সে ধনীই হোক অথবা গরীব। ঠিক এমনিভাবেই সিয়াম পালনও বাধ্যতামূলক।

অবশ্য যাকাত কেবল ধনাঢ্য ব্যক্তির উপরই ফরয। এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর ধনী ব্যক্তিকে নিজ সম্পদের চল্লিশ ভাগের একভাগ আল্লাহ্‌র রাহে প্রদান করতে হয়। এ তিনটি থেকে অধিকতর কষ্টসাধ্য হজ্জের ফরয---যদিও তা ধনাঢ্য ব্যক্তির উপর সারা জীবনে মাত্র একবারই ফরয। কিন্তু যেহেতু এর জন্য সমুদ্র ভ্রমণ, নিজেকে বিপদের মুখে নিক্ষেপ করা এবং নিজের পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হবার প্রয়োজন হয়, তদুপরি আরও বহুবিধ কষ্ট-ক্লেশ এর সাথে সম্পর্কিত, সে জন্য অধিকাংশ ধনাঢ্য ব্যক্তি এই ফরযটি আদায়ের ব্যাপারে ঔদাসীন্য দেখিয়ে থাকে এবং এর সৌভাগ্য থেকে মাহরূম থাকে। এ পর্যায়ে আপনি শুনে থাকবেন যে, সৈয়দ সাহেব সাজ-সরঞ্জাম তথা উপায়-উপকরণহীন হওয়া সত্ত্বেও শত শত লোক-জন সহকারে হজ্জ আদায় করেছেন এবং এতে হাজার হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে যা বড় থেকে বড়োতর আমীরের পক্ষেও এরূপ উচ্চ মনোবল ও প্রশস্ত হৃদয়ের সাথে হজ্জ করবার তৌফিক হয় নি।" ভ্যান্টোরা বললেন,-- আপনি সত্য বলেছেন যে, এরূপ শান-শওকতের সাথে সে সময়ে কেউ হজ্জ করেনি।

মওলবী সাহেব বললেন, জিহাদের ন্যায় 'ইবাদত হজ্জ অপেক্ষাও কঠিনতর এবং এটা ধন-দৌলতের আধিক্য ও প্রাচুর্যের উপরই শুধু নির্ভর-শীল নয় বরং তা আল্লাহ্‌র মর্জি ও তৌফিকের উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ্ তা'আলা শুধুমাত্র স্বীয় ফযল ও করমে কাউকে এরূপ দুর্লভ সৌভাগ্যের জন্য মনোনীত ও নির্বাচিত করেন। এর দুঃখ-কষ্ট ও ক্লেশ এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এই 'ইবাদতের ছওয়াব অপরাপর 'ইবাদতের তুলনায় অনেক বেশী এবং তা এ জন্যে যে, এই 'ইবাদতে জানমাল এবং পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়। এটাও স্মরণ রাখা দরকার যে, এ জিহাদ শুধু আমাদের পয়গম্বর (স·)-এর উপরই ফরয ছিলো না—বরং হযরত ইবরাহীম ('আ), হযরত মূসা ('আ), হযরত দাউদ ('আ), এঁদের উপরও ফরয ছিলো; আপনি ইতিহাস গ্রন্থ থেকে স্বয়ং একথা জেনে থাকবেন। ভ্যান্টোরা বললেন,—জী, হাঁ! মওলবী সাহেব বললেন,—"সৈয়দ সাহেব আল্লাহ্‌র ফযল ও করমে তাঁরই মকবুল বান্দাহ্, সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তির অধিকারী এবং উচ্চ মনোবলসম্পন্ন বুযুর্গ। তিনি এই ফরযটি আদায় করতে মনস্থ করেছেন। এটা আদায়ের জন্য দু'টি শর্ত ঃ প্রথমত, জামা'আতে মুজাহিদী-নের কোন ইমাম অথবা আমীর থাকবেন যাঁর অধীনে শর'য়ী তরীকার

উপর জিহাদ করা হবে। দ্বিতীয়ত, দারু'ল-আমান (নিরাপদ রাষ্ট্র বা ভূখণ্ড) হবে যেখান থেকে এ ফরয আদায়ের প্রাথমিক সূত্রপাত ঘটবে। ভারতবর্ষে কোন দারু'ল-আমান নেই। সেখান থেকে জানা গেলো যে, ইউসুফজাঈ কবীলা শিখদের সাথে জিহাদ করছে। কিন্তু তাদের কোন ধর্মীয় ইমাম অথবা আমীর নেই। পার্বত্য এলাকা তাদের আবাসভূমি আর সেটা দারু'ল-আমান। এজন্যই তিনি ছয়শ' জন অনুসারীসহ এদেশে তশরীফ রাখেন এবং এদেশের মুসলমানদেরকে এই গুরুত্বপূর্ণ ফরযটি পালনের প্রতি উৎসাহিত করেন ও উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। এমন কি ঐ সমস্ত লোকেরা তাঁর পবিত্র হাতের উপর হাত রেখে ইমামতের বায়'আত করত তাঁকে নিজেদের সর্দার বানায়। সেই মুহূর্ত থেকেই তাঁকে আমীরু'ল-মু'মিনীন এবং খলীফা উপাধিতে অভিহিত করা হচ্ছে।

"এটাও আপনার জানা উচিত যে, জিহাদ যুদ্ধ ও রাজত্ব করার নাম নয়; বরং জিহাদের শর'য়ী মর্মার্থ আল্লাহ্র কলেমাকে সমুন্নত রাখা, কাফিরদের শক্তি খর্ব করা এবং ধর্ম ও মযহাবের কলহ-বিবাদ অবদমন করতে সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ করা। এটা মনে রাখবেন যে, 'জামা'আত মুজাহিদীনে'র ইমামের জন্য এটাও শর্ত নয় যে, তার প্রস্তুতি এবং সাজ-সরঞ্জাম দুশমনের সাজ-সরঞ্জামের সমান হবে। ধর্মের উন্নতি এবং সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহের প্রচেষ্টা অবশ্যই শর্তভুক্ত বিষয়। অতএব যদি যুদ্ধ দেখা দেয় এবং তা যদি হয় অবস্থা ও সামগ্রিক কল্যাণের দাবী তবে যুদ্ধ করা হবে। বিজয়লাভ হলে দুশমনের সম্পদকে মালে গনীমত বানানো হবে, তাদের স্ত্রী-পুত্রদের বন্দী করা হবে এবং তাদের দেশ হস্তগত করাও চলবে। তবে যাই হোক, এর আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য দীনের উন্নতি ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি। বিজয়গুলো তার অর্জিত ফসল; বরং উচ্চতর শ্রেণীর বিজয় এটাই যে, যতক্ষণ ধড়ে প্রাণ থাকবে—গাযী এবং মুজাহিদ থাকবে। তাদের ফযীলত, মহান বৈশিষ্ট্য ও মরতবা কুরআন মজীদে খোলাখুলি ও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর যদি কাফিরদের হাতে আল্লাহ্ তা'আলা শাহাদত নসীব করেন তা হলেও হাজারও সৌভাগ্য! রিসালাতের পর এ মরতবা থেকে বড় ও বিরাটতর কোন মরতবাই নেই।"

ভ্যান্টোরা বললেন যে, হ্যাঁ! নিশ্চিতই আপনাদের মযহাবে শহীদদের মরতবা অত্যন্ত বড় ও বিরাট। মওলবী সাহেব বললেন, আপনার উপর

আমি বড়ই তাজ্জব হচ্ছি যে, আপনি এখনই স্বীকার করেছেন,---সমস্ত পয়গম্বররা নিজ নিজ যমানায় জিহাদ করছেন; এর পরও আপনি বলছেন যে, "তোমাদের মযহাবে!" ভালো,--বিশেষভাবে এ কথাটি যোগ করার আবশ্যকতা কি? আপনার তো এটাই বলা উচিত ছিলো যে, পয়গম্বরদের নিকট এই 'ইবাদতটি মহা মর্যাদাসম্পন্ন।

ভ্যাণ্টোরা বললেন,--আমি এটা মেনে নিলাম। কিন্তু একথা যুক্তি-বিরুদ্ধ বলে মনে হয় যে, এরূপ সাজ-সরঞ্জামহীন অবস্থায় খলীফা সাহেবের কাছে না আছে সৈন্য, না আছে কামান-গোলার কারখানা কিংবা ভাণ্ডার, না আছে কোন পুঁজি-পাট্টা আর না আছে কোন দেশ অথচ তাঁর আকাঙ্ক্ষা অভিপ্রায় এই! মওলবী সাহেব বললেন,--হাঁ! দুনিয়াদার লোকেরা সৈন্য, কামান এবং ধন-ভাণ্ডারের উপর আস্থাশীল হয় আর আমরা আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের উপর ভরসা ও আস্থা রাখি। আমরা বিজয়ের দাবীদার যেমন হই না, তেমনি পরাজয়ের কারণে বিমর্ষও হই না। এ দু'টো জিনিসই আল্লাহ্ পাকের হাতে। আমাদের বিশ্বাস হলোঃ

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ -

"আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করিয়াছে!" (সূরা বাকারা, ২৪৯ আয়াত)

যদি এটাকে আপনি অস্বীকার করতে চান তবে আপনার ইতিহাস পাঠের দাবী ভ্রান্ত। আর এজন্য যে, ইতিহাসে এটা বহুবার ও বহু ভাবে প্রমাণিত হয়েছে—বহু যবরদস্ত অত্যাচারী বিরাট বাহিনী, সংখ্যায় যারা প্রচুর---অবজ্ঞেয় ও কমযোর লোকদের হাতে পর্যুদস্ত ও বরবাদ হয়ে গেছে,—বিশেষ করে যখন দুর্বলেরা আল্লাহ্‌র দীনের সাহায্য ও সমর্থনে কোমর বেঁধেছে। পয়গম্বরদের ক্ষেত্রেও এমনি ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে যা ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কোন পয়গম্বরের কাছেই ধনভাণ্ডার, কামান-গোলা ও সৈন্যবাহিনী ছিলো না। অল্প সংখ্যক অনুসারী নিয়ে—যারা ছিলো আবার গরীব ও দরিদ্র--তাঁরা বড় বড় যবরদস্ত ও উদ্ধত গর্দানকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। তাঁদের স্থলাভিষিক্ত ও অনুগামীরাও বিরাট বিশাল সাম্রাজ্যকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দিয়েছে। এ ব্যাপারে বেশী বলার প্রয়োজন নেই; কারণ আপনি নিজেই একজন ইতিহাসবিদ। ইতিহাস গ্রন্থাদি স্বয়ং পথ প্রদর্শনের জন্য যথেষ্ট।

এই সুযোগে জেনারেল এ্যালার্ড বললেন,--এটা হয় না যে, সাজ-সরঞ্জামহীন সাজ-সরঞ্জামের অধিকারীর মুকাবিলায় এবং অস্ত্রসজ্জিতের মুকাবিলায় অস্ত্র-শস্ত্রহীন কামিয়াব হয়। এতে ভ্যান্টোরা বললেন,---না—মওলবী সাহেব ঠিকই বলেছেন, বড়োরা ছোটদের হাতে পরাজিত হয়েছে।

বিতর্কের শেষে জেনারেল ভ্যান্টোরা বললেন, আমার ইচ্ছা এতটুকুই যে, আমার এবং খলীফা সাহেবের মধ্যে উপহার-উপঢৌকন পাঠাবার প্রথা চালু হোক। প্রথমে আমি কিছু জিনিষ পাঠাবো, এরপর খলীফা সাহেব কোন তোহ্ফা পাঠাবেন যাতে করে এখানে থেকে ফিরে যাবার কোন ওজর আমার মিলে যায়। এরপরে খলীফা সাহেব ইউসুফজাঈ -এর দেশের পুরো ইখতিয়ার,--যা চাইবেন করবেন; খালসা সৈন্যবাহিনী অতঃপর এ দেশের উপর আর কখনও পা রাখবে না।

মওলবী সাহেব বললেন, খলীফা সাহেব আপনাদের মহব্বত ও বন্ধুত্বের কোন প্রয়োজন বোধ করেন না। যদি আপনার প্রয়োজন হয় তবে প্রথমে আপনিই শুরু করুন। খলীফা সাহেব অত্যন্ত উচ্চতর মনোবলের অধিকারী এবং উচ্চ সাহসিকতাসম্পন্ন লোক। তিনি আপনার তোহ্ফার জওয়াব অবশ্যই দেবেন। কিন্তু খলীফা সাহেবের সরকারের তোহ্ফা এটাই যে, তিনি কাউকে পাগড়ী, কাউকে বিশেষ ধরনের টুপি এবং কাউকে জোব্বাও দিয়ে থাকেন। তাঁর সরকারের হাতিয়ারও অত্যন্ত মূল্যবান। আশ্চর্য নয় যে, তার ভেতর থেকেও কিছু প্রদান করবেন।

ভ্যান্টোরা বললেন,—পাগড়ী এবং বিশেষ জাতের টুপী আমরা কি করবো? যদি তোহ্ফার বিনিময়ে একটি ঘোড়া খলীফা সাহেব প্রদান করেন তবে তাই হবে যুক্তিসঙ্গত।

মওলবী সাহেবঃ আমি আপনার মতলব বুঝতে পেরেছি। আমরা কখনই আপনাকে ঘোড়া দেবো না।

জেনারেল ভ্যান্টোরাঃ আপনি অস্বীকার করছেন। খলীফা সাহেবেকে আপনি লিখুন। তিনি এ প্রস্তাব নিশ্চয়ই পসন্দ করবেন। আর এর জন্য প্রয়োজন দূরদর্শিতার।

এ সময় হাকীম সাহেব, সাংবাদিক এমনকি হাজী বাহাদুর শাহ খান পর্যন্ত মওলবী সাহেবকে ইশারা করেন যেন ভ্যান্টোরা যা কিছু বলছেন তিনি তা কবূল করে নেন। কিন্তু মওলবী সাহেব নিজ জ্ঞানবুদ্ধিতে ও

দুরদর্শিতায় ঘটনার তলদেশ পর্যন্ত পেঁৗছে গিয়েছিলেন।[১] তিনি বললেন,— এ প্রস্তাব তার জন্য সমীচীন—যিনি দেশ ও জায়গীরের কর্তৃত্বে সমাসীন, কিন্তু তার জন্য মোটেই নয়—যিনি জিহাদ শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র কলেমাকে সমুন্নত রাখার জন্য শুরু করেছেন। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি সালাত, সিয়াম এবং অন্যান্য নেক 'আমল শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জগতের বুযুর্গী হাসিলের জন্য করে, সে 'আযাব ও গযবের হকদার। এমনিতরো জিহাদ ও নিয়তের ভ্রষ্টতার কারণে গযব অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আমি এমন কথা খলীফা সাহেবকে লিখতে পারি না। এরূপ নিয়তের ক্ষেত্রে আমি এবং খলীফা সাহেব সমান। পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, আমরা তাঁকে ইমাম বানিয়েছি এজন্যে যে, ইমামের নিযুক্তি জিহাদের অপরিহার্য শর্তাবলীর অন্যতম। যে জিনিস জিহাদের ছওয়াবকে বাতিল করবে তার অস্বীকৃতিতে আমি এবং খলীফা সাহেব সমান বরাবর।

ভ্যান্টোরা দু'তিনবার একথারই পুনরাবৃত্তি করেন। মওলবী সাহেব বললেন,---এক কথা বারবার বলাতে কোনই ফায়দা নেই। ঘোড়া তো ঘোড়া---আমরা গাধাও আপনাদের দেবো না। আমাদের তো ইচ্ছা আপনা-দের কাছ থেকে জিযয়া ও রাজস্ব উসুল করার,--আমরা আপনাদের রাজস্ব দেব কেন?

ভ্যান্টোরা ঃ যদি খলীফা সাহেব স্বীয় কারামতীর দ্বারা সাজ-সরঞ্জামহীন অবস্থায় অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে এরূপ প্রবল-প্রতিপত্তিশালী ও ঐশ্বর্যের অধিকারী একটি সরকারের উপর বিজয় লাভ করেন তবে সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের খালসা সরকারকে ছেড়ে-ছুড়ে খলীফা সাহেবের দিকে প্রত্যাবর্তন করবো।

মওলবী সাহেব ঃ আমি খলীফা সাহেবের অবস্থা আপনাদের কি বলবো, ---আপনি স্বয়ং দেখেন নি। যদি মুলাকাত করবার মনোবল থাকে তবে

---

১. ভ্যান্টোরার উদ্দেশ্য ছিলো যেন কোনক্রমে সৈয়দ সাহেব তোহফার ভেতর একটি ঘোড়া ভ্যান্টোরার নিকট পাঠিয়ে দেন। তাতে করে তিনি মহারাজার হুকুমতের লোকজনের মধ্যে মশহুর করে দেবেন যে, সৈয়দ সাহেব কর হিসাবে ঘোড়া দিয়ে মহারাজার হুকু-মতের ট্যাক্স প্রদানকারী অনুগত প্রজা এবং এলাকার রক্ষক হওয়াকে মঞ্জুর করে নিয়েছেন। মওলবী খায়রুদ্দীন সাহেব এ চাতুরী বুঝেছিলেন আর এজন্যেই কোন অবস্থাতেই ঘোড়ার তোহ্‌ফা তিনি স্বীকার করতে চান নি।

তৈরী হয়ে নিন। ইনশাআল্লাহ্‌ তাঁর আলাপ-আলোচনা শুনে "আমান্না ওয়া স'াদ্দাক না" (বিশ্বাস করলাম এবং সত্য বলে স্বীকার করলাম) ছাড়া আর কিছু বলবেন না।

ভ্যান্টোরা এ কথা শুনে বললেন, "না! না!" এরপর অল্প কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। অতঃপর বললেন, আপনার যদি এর উপরে লিখতে আপত্তি থাকে তবে কি মুখে আমার এ পয়গাম পৌঁছে দেবেন?

মওলবী সাহেবঃ এটা আপনার বলার উপর নির্ভরশীল নয়। আমি বিন্দুমাত্রও এ থেকে কোন কথা লুকোব না এবং সকল আলোচনা কোনরূপ কমবেশী করা ব্যতিরেকেই তা হুবহু শুনিয়ে দেবো।

ভ্যান্টোরাঃ এরপর যা আপনারা বলবেন তা হাযারুতে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন।

মওলবী সাহেবঃ জওয়াব পৌঁছানো অথবা না পৌঁছানো আমাদের ইখ-তিয়ারাধীন নয়। এটা খলীফা সাহেবের অভিমতের উপর নির্ভরশীল। এ কারণেই আমি এর ওয়াদা করছি না।

ভ্যান্টোরাঃ আপনি আমার সামনে যা কিছু বললেন--খড়ক সিংহের সামনেও তা বলে দেবেন কি?

মওলবী সাহেবঃ কিছু অগ্রসর হয়ে বলবো।

কথা এতদূর পর্যন্ত পৌঁছতেই ভ্যান্টোরা বললেন যে, আপনি এখন যেতে পারেন। আমরা এরপর অন্য কোন সময়ে ডাকবো।

মওলবী সাহেব ওখান থেকে বিদায় নিয়ে হাকীম 'আযীযুদ্দীন সাহেবের ডেরায় আসেন এবং আহারাদি সম্পন্ন করেন। মাগরিব পর্যন্ত সেখানেই থাকেন। অতঃপর সালাত আদায়ের পর নিজের ডেরায় ফিরে আসেন। পরদিন উযীর সিংহ এসে গোপনে বলেন যে, আজ জোহরের সময় খড়ক সিংহের ডেরায় দু'জন বিলেতী অফিসার এবং খাবী খানের ভাই আমীর খান সমবেত হয়েছিলো। তারা পরামর্শ করেছে যে, এই মওলবী অত্যন্ত তেজী মেযাজের, আমাদের কথা কবুল করছে না। কাজেই পাঞ্জেতারের দিকে সৈন্যবাহিনীর যাওয়া প্রয়োজন।

এক প্রহর রাত থাকতে মার্চ করবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সংবাদ মওলানা ইসমা'ঈলের পাওয়া উচিত। তখনই মওলবী সাহেব উক্ত মোল্লার

মারফত যার কাছে তিনি মেহমান ছিলেন---এক ব্যক্তিকে তিনি পাঞ্জেতার পাঠিয়ে দেন এবং সংবাদবাহককে বলে দেন যে, পথে যে সমস্ত পল্লী ও বস্তি অঞ্চল পড়বে সেখানকার লোকজনকে সতর্ক করে যাবে যে, আগামী কাল শিখ সৈন্যবাহিনী পাঞ্জেতারের উপর চড়াও হবে। অতএব প্রত্যেকেই যেন নিজের নিজের জান-মাল নিয়ে সতর্ক থাকে। খড়ক সিংহ ব্যতিরেকে সমগ্র বাহিনী যায়দা নামক স্থানে তাঁবু ফেলে। এখান থেকে পাঞ্জেতারের দূরত্ব ছ'ক্রোশ। সূর্যাস্তকালীন সময়ে শিখ সৈন্যবাহিনীতে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, আজ রাত্রে গাযী বাহিনী পাঞ্জেতারে অবস্থিত সৈন্যদের উপর অতর্কিত হামলা চালাবে। এ সংবাদ মিলতেই সৈন্যবাহিনীর ভেতর এক ধরনের অস্থির চাঞ্চল্য এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। কেউই নিজের বিছানায় আরামের সাথে শুতে পারেনি। সবাই নিজ নিজ ঘোড়ার লাগাম হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাত কাটায়। সবাই তাঁবুর খুঁটা মাটি থেকে তুলে ফেলে এবং গোটা বাহিনীর ভেতরই গোলযোগ শুরু হয়ে যায়---আর প্রত্যেকেই পালাবার জন্য ছিলো সদা প্রস্তুত। বিলেতী অফিসারবৃন্দ সৈন্যবাহিনীর এ জাতীয় রূপ দেখে ইউসুফ খান ও অন্যান্য অফিসারদের ডেকে বলেন যে, শেষমেষ এ কি মুসীবত নেমে এলো আর বাহিনীতে ত্রাসই বা বিরাজ করছে কেন? প্রত্যেকেই পালাবার জন্য প্রস্তুত। তাদের সান্ত্বনা দিয়ে থামানো দরকার। অফিসারবৃন্দ নির্দেশ মাফিক সৈন্যদের বোঝালেন। অল্প রাতই অবশিষ্ট ছিলো। ঠিক এমনি মুহূর্তে সৈন্যবাহিনী লাণ্ডে নদীর দিকে চলতে শুরু করে এবং এমন অবস্থায় যে, কেউ কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ পর্যন্ত করেনি। অতঃপর অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সাকোঁর সাহায্যে নদী পার হয়ে পুনরায় সাকোঁ ভেঙ্গে দিয়ে যায়। সেখানে কতক্ষণ বিলম্ব করে দিবাভাগ এক প্রহর থাকতে আটকের পথে রওয়ানা হয়ে যায়।

অনুমান করা যায় যে, পুরো ঘটনাবলীই রণজিৎ সিংহ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে থাকবে এবং তারও অনুমিত হয়ে থাকবে যে, তাকে এমন একটি বাজপাখীর মুখোমুখী হতে হয়েছে যাকে খাদ্যশস্যের কয়েকটি দানা কিংবা দস্তরখানে পড়ে থাকা অবশিষ্ট এঁটোকাঁটা দিয়ে পোষ মানানো সম্ভব নয়।

চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় লাভ

যায়দার যুদ্ধে সংখ্যাল্পতা, সাজ-সরঞ্জামহীনতা ও বিদেশাগত হওয়া সত্ত্বেও মুজাহিদ বাহিনীর বিজয় এবং ইয়ার মুহাম্মদ খানের ধ্বংস এমন

একটি ঘটনা ছিলো যার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া রাজপরিবারে অনুভূত হওয়াটা ছিলো অপরিহার্য। সুলতান মুহাম্মদ খানের মা তাকে তার ভাইয়ের হত্যায় বরাবরই গ্লানি ও ধিক্কার দিয়ে আসছিলো এবং হত্যার প্রতিশোধ নিতে ও রক্তের দাগ মুছে ফেলতে উৎসাহিত করছিলো। শেষ পর্যন্ত সে প্রতিশোধ গ্রহণে কৃতসংকল্প হয় এবং নিজ সৈন্যবাহিনীসহ মুজাহিদ বাহিনীর দিকে গতি পরিবর্তন করে। তার ইচ্ছা ছিলো গোটা গোলযোগের সকল কিস্‌সাই খতম করে দেওয়া এবং দৈনন্দিন জ্বালাযন্ত্রণার হাত থেকে নাজাত পাওয়া যা তার শান্তি ও নিরাপত্তা আমূল বিনষ্ট করে দিয়েছে। যে সমস্ত আমীর-ওমরা, উপজাতীয় সর্দার, জায়গীরদার ও বিলাস-বৈভবের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ সৈয়দ সাহেবের বিরোধী ছিলো,—ছিলো হিংসা-বিদ্বেষের শিকার এবং যারা সৈয়দ সাহেবের নেতৃত্ব, ধর্মীয় ইমামত, সর্দারী, তাঁর উত্থান ও সৌভাগ্যকে নিজেদের পিছিয়ে পড়া ও অবনমিত হওয়ার সমার্থক মনে করতো তারা সবাই স্বাভাবিকভাবেই তার সাথে হাত মিলায়।

সুলতান মুহাম্মদ খান অপরাপর আমীর-ওমরা ও উপজাতীয় সর্দারকে ধমকও দিয়েছিলো যে, সে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেবে। কেননা ইয়ার মুহাম্মদ খানের হত্যা তাদেরই নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় এবং তাদেরই চোখের সামনে সংঘটিত হয়েছে। অথচ তারা তার কোন সাহায্যই করতে সক্ষম হয়নি। এ অভিমতের শরীক তার বোন, দু'ভাই সর্দার পীর মুহাম্মদ খান এবং সর্দার সৈয়দ মুহাম্মদ খানও ছিলো। তার বড় ভাই কাশ্মীরের শাসনকর্তা মুহাম্মদ 'আজীম খানের ভাতিজা হাবিবুল্লাহ্ খানও ছিলো উক্ত অভিমতেরই সমর্থক।

শেষাবধি এই সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হয় যে, এই বিপদের মুকাবিলা ও মূলোৎপাটন করা হবে অথবা একে যে কোন প্রকারে অপসারণ করা হোক। সৈয়দ সাহেব আম্বের দুর্গ থেকে যেখানে তিনি অবস্থান করছিলেন-- নিজের প্রাক্তন সেনানিবাস পাঞ্জেতার প্রত্যাবর্তন করেন। পেশোয়ারের সৈন্যবাহিনী হোতি নামক স্থানে অবস্থান করে এবং সৈয়দ সাহেব এর মুকাবিলায় তুর্দ নামক স্থানে অবস্থান নেন।

হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর এ যুদ্ধে যা দু'জন মুসলমানের ভেতর সংঘটিত হতে যাচ্ছিলো—মোটেই উৎসাহ কিংবা আকর্ষণ ছিলো না। পরস্পর এ দু'শক্তির দ্বন্দ্ব ও সংঘাত তাঁর অত্যন্ত অপসন্দনীয় ছিলো (কেননা

এতদুভয়ের মিলিত শক্তিতে ইসলাম ও মুসলমানদের অসীম ফায়দা লাভ সম্ভব হতো এবং উভয়ের সম্মিলিত শক্তি দুশমনের বিরুদ্ধে কাজে আসতে পারতো)। যারা প্রথমে সৈয়দ সাহেবের দিকে আপোষ-নিষ্পত্তি ও বিশ্বস্ততার হাত বাড়িয়েছিলেন সুলতান মুহাম্মদ খান ছিলেন তাদের অন্যতম এবং তাঁর হাতে আনুগত্য, অনুসরণ ও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌র উপর বায়‘আত গ্রহণ করেছিলেন। সৈয়দ সাহেব আপ্রাণ চেষ্টা করেন তাদেরকে এ যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করতে যার কোন প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতাই নেই। তিনি তাদের ধর্মীয় অনুভূতি এবং ইসলামী আবেগ ও প্রেরণাকেও জাগিয়ে তুলতে চেয়ে ছিলেন যা থেকে কোন মুসলমানের অন্তর-মানসই মুক্ত নয়। এতদুদ্দেশ্যে তিনি তূর্দ মৌজার একজন ‘আলিমে রব্বানী মওলবী ‘আবদুর রহমান সাহেবকে মনোনীত করেন। তিনি সৈয়দ সাহেবের একনিষ্ঠ ভক্তদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি তাঁকে সুলতান মুহাম্মদ খানের নিকট দূত হিসাবে পাঠান এবং বলে দেন যে, আমরা এখানে শুধুমাত্র লাহোরের শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার জন্যেই এসেছি। আমরা মনে করি যে, ধর্মের সাহায্য এবং মজলুমের সহযোগিতায় ও সমর্থনে আপনিও আমাদের এ জিহাদে শরীক হবেন। আপনিই তো প্রথম আমার হাতে বায়‘আত হয়েছিলেন এবং আমাকে আপনি সাহায্যের ওয়াদাও করেছিলেন। এখন আপনার অন্তর কি করে এতে খুশী হবে যে, আপনি কাফিরদের সাথে মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার উঠাবেন, তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে লিপ্ত হবেন,— নিজের দীন ও দুনিয়া উভয়টিরই ক্ষতি সাধন করবেন এবং পরবর্তীতে লজ্জা ও অনুশোচনায় নিজের আঙুল কামড়াবেন।

এরূপ আবেদনময়ী ও যুক্তিপূর্ণ আহবানের সুলতান মুহাম্মদ খান অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় জবাব দেন এবং সন্ধি-সমঝোতার সকল আশা-ভরসাই তিরো-হিত হয়ে যায়। সৈয়দ সাহেব পুনরায় দ্বিতীয় দফা দূত প্রেরণ করেন এবং তাকে বোঝাতে-সমঝাতে ও তার ক্রোধ ঠাণ্ডা করতে আরও চেষ্টা চালান। তিনি তাকে বলেন যে,—যদিও তার ভাই দোস্ত মুহাম্মদ খান তাকে ভয় করতে ও বিরত থাকতে পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং তাকে সতর্ক ও অবহিত করেছিলেন যে, তার ওয়াদার উপর ভরসা স্থাপন না করাই উচিত। কিন্তু স্বয়ং তার অভিমত এটাই ছিলো যে, কোন ফয়সালার ব্যাপারেই অতি দ্রুত কাজ করতে নেই। তাঁর এবং ইয়ার মুহাম্মদ খানের ভেতর অনুষ্ঠিত যে সমস্ত কথাবার্তা শায়দূর যুদ্ধে প্রকাশ পেয়েছিলো তিনি সে সমস্তই মাফ

করে দিয়েছিলেন বরং খারাপের বদলা ভালো দিয়ে করতে চেষ্টা করেছেন। এমন কি ইয়ার মুহাম্মদ খান এক বিরাট সৈন্য ও গোলন্দাজ বাহিনীসহ মুজাহিদ বাহিনী অভিমুখে অগ্রসর হয় তাদের চূড়ান্তভাবে নিঃশেষ করে দেবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের হেফাজত করেন এবং মুজাহিদ বাহিনী বিজয়লাভে সমর্থ হয়। ইয়ার মুহাম্মদ খান নিজস্ব অপরিণামদর্শিতার এবং মুজাহিদ বাহিনীর সাথে দুশমনীর নিজেই শিকার হয়ে পড়েন। এ ব্যাপারে আমাদের কোন দোষ নেই। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "প্রতিটি ব্যক্তিই তার নিজ কৃতকর্মের যিম্মাদার।"

হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) এবং সুলতান মুহাম্মদ খানের মধ্যে কয়েকবার দূত যাতায়াত করে। আলোচনা দীর্ঘ হতে থাকে। পেশোয়ারের শাসনকর্তা কঠিন ও কর্কশ ভাষায় কথাবার্তা শুরু করে। ধমক ও গর্জন বর্ষিত হতে থাকে। এ দেখে সৈয়দ সাহেব মওলবী 'আবদুর রহমান সাহেবকে উপদেশ দেন যে, এখন সেখানে যাওয়া এবং এ বিষয়ে আর কথাবার্তা বলার প্রয়োজন নেই। কারণ তা হবে পণ্ডশ্রম মাত্র। তিনি এও অনুমান করেন যে, এখন যুদ্ধ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। সৈয়দ সাহেব অত্যন্ত বিষাদক্লিষ্ট হৃদয়ে ও বিমর্ষচিত্তে এর জন্য রাযী হন এবং প্রস্তুতি শুরু করেন। লোকজন তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় মোতায়েন করেন। সৈন্যবাহিনী সারা রাত জেগে কাটায়। সবাই যুদ্ধ প্রস্তুতিতে লেগে থাকে এবং কারোরই শোবার মওকা মেলেনি। ফজরের সালাত আদায়কালীন মুহূর্তে বিরাট সংখ্যক মুজাহিদ সৈয়দ সাহেবের সাথে শরীক ছিলেন। এ ব্যাপারে তাদের পরিষ্কার ধারণা জন্মেছিলো যে, একটি ফয়সালামূলক চূড়ান্ত যুদ্ধ তাদের সামনে অপেক্ষা করছে। সালাত আদায়ের পর সৈয়দ সাহেব অত্যন্ত অশ্রু ভারাক্রান্ত অবস্থায় বিনয় ও মিনতি সহকারে বহুক্ষণ ধরে আল্লাহ্র দরবারে দু'আ ও মুনাজাত করতে থাকেন। সবার চোখই ছিলো অশ্রুসজল আর চিত্ত ছিলো বেকারার। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার সামনে নিজেদের কমযোরী ও দুর্বলতা এবং সাজ-সরঞ্জামহীনতার কথা মন খুলে ব্যক্ত করলেন আর এও প্রকাশ করলেন যে, তিনি কোন কিছুরই উপযুক্ত নন, শুধুমাত্র আল্লাহ্র আশ্রয় তাদের শেষ আশ্রয়স্থল।

দো'আ শেষে তিনি মুখে হাত ফেরাতেও পারেন নি ঠিক এমনি মুহূর্তে একজন মোর্চার দিক থেকে দৌড়াতে দৌড়াতে আসলো এবং সংবাদ দিলো যে, যুদ্ধের দামামা বেজে গেছে। সৈয়দ সাহেবও যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে

দিলেন। সবাই কোমর বেধে দাঁড়ায় এবং মুজাহিদ বাহিনী নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র ও যুদ্ধ-সম্ভার নিয়ে জিহাদের ময়দানে অবতরণ করে।

সুলতান মুহাম্মদ খান ও তার দু'ভাই নিয়ম মাফিক কুরআন মজীদের উপর হাত রেখে কসম খেয়েছিলো যে, তারা যুদ্ধ থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না, যুদ্ধে জয়ী হবে অথবা জীবন দেবে। তারা বর্শার সাহায্যে একটি মেহরাব তৈরী করে এবং এর মাঝখানে কুরআন মজীদ লটকে দেয়। সমস্ত সৈন্যবাহিনী এর নীচ দিয়ে অতিক্রম করে যুদ্ধের ময়দানে অবতরণ করে। এটা ছিলো পবিত্র কুরআন শপথের বাস্তব ও বাহ্যিক পদ্ধতি এবং একথারই অঙ্গীকার ও ঘোষণা যে, সৈন্যবাহিনীকে কোন অবস্থাতেই পিছু হটা চলবে না, আর এ ভাবেই এ যুদ্ধ একটি ধর্মীয় যুদ্ধের রূপ নেয় এবং শেষ নিঃশ্বাসটুকু বাকী থাকা পর্যন্ত পূর্ণ বীরোচিত উপায়ে লড়াই চালিয়ে যাবার পাকাপোক্ত অঙ্গীকার করা হয়।

শুরু হলো যুদ্ধ। উভয় পক্ষ একে অপরের মুকাবিলায় সংগ্রাম ঝাঁপিয়ে পড়লো। পোশায়ার বাহিনী আটহাজার অশ্বারোহী ও চার হাজার পদাতিকের সমষ্টি ছিলো। মুজাহিদ বাহিনীতে পাঁচ হাজার অশ্বারোহী এবং তিন হাজার পদাতিক সৈন্য ছিলো। সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) ইমামের পরিপূর্ণ অনুসরণ ও আনুগত্যের নির্দেশ দেন এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, তাড়াহুড়া এবং নিজস্ব মতামতের উপর প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে অবহিত ও সাবধান করে দেন। সৈয়দ সাহেব ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে একটি পদাতিক ইউনিটের অভ্যন্তরে অবস্থান করছিলেন এবং সৈন্য-বাহিনীকে জিহাদের ময়দানে দৃঢ়তা প্রদর্শন ও আল্লাহ্‌র দরবারে সাহায্যপ্রার্থী হবার দিকে মনোযোগী করছিলেন। বাহিনীর কতিপয় বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর খিদমতে দরখাস্ত পেশ করে যে, আপনি ঘোড়ার উপর থেকে অবতরণ করুন। কেননা উঁচু ও দর্শনীয় স্থানে হবার কারণে যে কোন মুহূর্তে তিনি দুশমনের টার্গেটে পরিণত হতে পারেন এবং বিপক্ষ দলের গোলন্দাজ অতি সহজে তাঁর দিকে গোলা নিক্ষেপ করতে পারে। তিনি তাদের পরামর্শ কবুল করেন এবং ঘোড়ার পৃষ্ঠদেশ থেকে নীচে অবতরণ করেন।

যুদ্ধের আবহাওয়া ছিলো উত্তপ্ত। গোলা নিক্ষিপ্ত হচ্ছিলো আর তা বর্ষিত হচ্ছিলো বৃষ্টিধারার ন্যায়। তলোয়ারের আঘাতে এবং নেযার

ঠোকাঠুকিতে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিলো। মুজাহিদ বাহিনী মওলানা খুররম আলী বিলহোরীর[১] জিহাদী কবিতা উচ্চস্বরে আবৃত্তি শুরু করে এবং তাদের ভেতর আগ্রহ-উদ্দীপনা, মত্ততা ও আবেগ-বিহ্বলতার এক অত্যাশ্চর্য অবস্থার সৃষ্টি হয়। সৈয়দ সাহেবের বীরত্ব ও রণনৈপুণ্যের অপূর্ব দৃশ্য এ সুযোগে ভালোভাবে প্রকাশ পায়। তিনি দ্বিধাহীনচিত্তে নিজেকে বিপদের মুখে নিক্ষেপ করতেন। তাঁর ডাইনে ও বামে দু'জন সাথী ছিলেন যারা বন্দুক ভরে ভরে তাঁকে দিয়ে যাচ্ছিলেন আর তিনি অত্যন্ত দ্রুততা, বীরত্ব ও নির্ভীকতার সঙ্গে ফায়ার করছিলেন।

মুজাহিদ বাহিনীর বীরত্ব-ব্যঞ্জকতা, দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞার আশ্চর্য সব দৃশ্য এ যুদ্ধে দৃষ্টিগোচর হয়। মওলানা মুহাম্মদ ইসমা'ঈলের এবং হাফিজ ওলী মুহাম্মদ অগ্রসর হয়ে দুশমনের তোপখানা হস্তগত করেন এবং এর মুখ দুশমনের দিকে ঘুরিয়ে ধরেন। সৈয়দ সাহেব স্বয়ং উপস্থিত থেকে সব কিছু দেখা-শোনা করতেন এবং এ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় উত্তম দিক-নির্দেশনা দিতেন। কামানের মধ্যে কিছু ত্রুটি ধরা পড়ে যা তিনি নিজেই ঠিক করে দেন। এরপর এগুলি দুশমনের বিরুদ্ধে পূর্বের তুলনায় অত্যন্ত উত্তমভাবে কাজ করতে থাকে। ঠিক এমনি মুহূর্তে দুররানী বাহিনী দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলে এবং পালিয়ে যাবার ভেতরই তারা নিজেদের মঙ্গল ও কল্যাণ দেখতে পায়। ফলে মুজাহিদ বাহিনীর পরিপূর্ণ বিজয় সাধিত হয়। বেলা ঢলে পড়তেই মুজাহিদ বাহিনী মায়ার প্রান্তরে বিজয় ও সাফল্যের ঔজ্জ্বল্যে ফিরে আসে। যে সমস্ত লোক যুদ্ধে এদিক-ওদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিলো এবং বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে নিয়োজিত ও ব্যাপৃত ছিলো তারা সবাই এখানে এসে মিলিত হয়। মওলানা মাজহার আলী 'আজীমাবাদী আহতদের ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ-পট্টি বাঁধেন এবং চিকিৎসার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহায়তা দানের নির্দেশ দেন। শহীদানের জানাযা পড়া হয় এবং দাফন সমাপ্ত করা হয়। মওলানা জা'ফর আলী বলেন ঃ

---

১. মওলানা খুররম আলী বিলহোরী কানপুরী সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর অন্যতম সাথী ছিলেন। পরে বান্দাহ্ নামক স্থানে চলে যান। সেখানে নওয়াব জুলফিকার আলী খান তাঁকে গ্রন্থ প্রণয়ন ও অনুবাদের খেদমত সোপর্দ করেন। ফিকাহ ও হাদীছ বিষয়ক কতিপয় গ্রন্থের তিনি উর্দুতে তরজমা করেন। তিনি 'তাকভিয়াতু'ল-ঈমান' জাতীয় তৌহিদ ও সুন্নত বিষয়ক—'নসীহাতু'ল-মুসলিমীন' নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১২৭১ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

"লোকজন যদিও ভোরবেলা ক্ষুধার্ত ছিলো,---কিন্তু বিজয়ের আনন্দে খাবার ব্যাপারে তারা নিস্পৃহ হয়ে পড়ে, তাদের মন ছিলো তৃপ্ত। সারা-দিনের ক্লান্তির কারণে অধিকাংশই যে যেখানে পেরেছিলো সেখানেই শুয়ে পড়েছিলো। কিন্তু শুশ্রূষাকারীরা ক্ষতস্থান সেলাই করা ও ব্যাণ্ডেজ-পট্টি বাঁধা নিয়ে ছিলো ব্যস্ত। তাদের এক বিন্দুও ফুরসত ছিলো না। সাধারণ ভাবে মুজাহিদ বাহিনীর উপর নিদ্রাই নিয়ন্ত্রণ জাঁকিয়ে বসে। আর এটা ছিলো যা তোমাদের একদলকে তন্দ্রাভিভূত করেছিল"---এরই এক দৃশ্য। চোখ আপনা আপনি বুঁজে আসছিলো। অর্ধেক রাত্রির পর আহতদের সেলাই এবং ব্যাণ্ডেজ বাঁধা থেকে নিষ্কৃতি মেলে।

এই যুদ্ধে সততা ও একনিষ্ঠতা, নজীরবিহীন বীরত্ব, সুদৃঢ় প্রত্যয়, শাহাদত লাভের প্রতি গভীর আগ্রহ, মৃত্যুর প্রতি প্রবল আকর্ষণ ও অনুরাগ এবং নবজীবনের প্রতি আরজুমন্দ-এর বহু আশ্চর্য ও হৃদয়গ্রাহী দৃষ্টান্ত গোচরীভূত হয়। তম্মধ্যে কতিপয় ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে পেশ করা হচ্ছে।

আন্তরিক জিহাদ ও শহীদী মৃত্যু

মায়ারের যুদ্ধ শুরু হবার কিছু কাল আগে আমীরু'ল-মুজাহিদীন হযরত সৈয়দ আহমদ (র)-এর খেদমতে একটি স্বাস্থ্যবান ও মোটাসোটা যুবক এসে হাযির হয়। উচ্চ বংশোদ্ভূত ও আভিজাত্যের পরিচয় তার চেহারায় ছিলো পরিস্ফুট এবং মনে হচ্ছিলো---সম্ভবত সে সৈয়দ সাহেবের খান্দান ও পরিবারেরই কোন সদস্য হবে। সে অগ্রসর হয় এবং সৈয়দ সাহেবের সাথে এমনই ভঙ্গীতে কথা বলা শুরু করে যে---যার ভেতর সম্মান ও শ্রদ্ধার সংগে ভ্রাতৃত্ব ও আত্মীয়তার গর্ব এবং আস্থাও ছিলো,---ছিলো সৈনিকের ঠাট-বাট এবং যৌবনের শান-শওকতও। সে সৈয়দ সাহেবকে বলছিলো ঃ

মিঞা সাহেব! যেদিন থেকে আমি আপনার সাথে ঘর থেকে বের হয়েছি---সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত এটাই ধারণা ছিলো যে, ইনি আমার প্রিয় আর আমিও তাঁর সঙ্গেই থাকবো। আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁকে সৌভাগ্যের আসনে অধিষ্ঠিত করবেন তখন তাঁর কারণে আমারও উন্নতি হবে। অদ্যাবধি আমি যেমন এখানে একমাত্র আল্লাহরই উদ্দেশ্যে থাকিনি তেমনি থাকিনি ছওয়াব জেনেও। কিন্তু এখন আমি এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে

তওবাহ্ করেছি এবং নতুনভাবে আপনার হাতের উপর জিহাদের বায়'আত নেবার জন্য এসেছি একমাত্র আল্লাহ্রই উদ্দেশ্যে। আপনি আমার থেকে বায়'আত নিন এবং আমার জন্য দো'আ করুন যেন আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এই নিয়ত ও ইচ্ছার উপর সুদৃঢ় রাখেন। সৈয়দ সাহেব এ কথা শুনে তার থেকে বায়'আত নিলেন এবং তার জন্য দো'আ করলেন। সে সময় সবাই অশ্রুভারাক্রান্ত হওয়ার দরুন সেখানে এক অদ্ভুত অবস্থা বিরাজ করছিলো। আর সকলের চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছিলো অশ্রুর অবিরল ধারা।

কাযী গুল আহ্মদ বর্ণনা করেন: আমি এক জায়গায় গিয়ে দেখলাম যে, সৈয়দ আবু মুহাম্মদ সাহেব (১) আহত হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর যখম এমনই মারাত্মক ছিলো যে, সামান্য নিঃশ্বাস তখনও তার ভেতরে অবশিষ্ট ছিলো। কিন্তু হুশ ও অনুভূতি কিছুই ছিলো না। আমি কয়েক বার কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাক দিলাম,—সৈয়দ আবু মুহাম্মদ সাহেব! আমীরু'ল-মু'মিনীনের বিজয় লাভ ঘটেছে। কিন্তু তিনি কিছুই খেয়াল করলেন না, দিলেন না এর জওয়াবও। তিনি নিজের ঠোঁট চাটছিলেন আর 'আল-হ'ামদুলিল্লাহ্', 'আলহ'ামদুলিল্লাহ' বলে যাচ্ছিলেন; এমনি ছিলো তার

১. সৈয়দ আবূ মুহাম্মদ ব্যাটেলিয়নে জমাদার ছিলেন। অত্যন্ত বাঁকা-তেরছা, জৌলুসগর্বী ও সুদর্শন যুবক ছিলেন। বড় বড় তেজস্বী ও নিপুণ ঘোড়সওয়ারও তার উস্তাদীর স্বীকৃতি দিত। মেযাজের দিক দিয়ে অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও সৌন্দর্যপ্রিয় ছিলেন। কারো হাতের রান্নাকৃত খাবার তার পসন্দ হতো না। নিজের হাতেই সারাদিনে একবার মাত্র পাক করতেন। অধিকাংশ বিষয়েই তিনি ছিলেন পারঙ্গম ও পারদর্শী। কাপড় তিনি এমনভাবে কাটতেন ও সেলাই করতেন যে, বড় বড় উস্তাদ পর্যন্ত হয়রান হয়ে যেতো। পনের বিশ ধরনের পাগড়ী তিনি বাঁধতেন। নিজের হাতেই ঘোড়ার পিঠের জীনসহ সবকিছু সেলাই করতেন। নিজের ক্ষৌরকর্ম নিজেই আয়না সামনে রেখে করে নিতেন। ঢিলা পায়জামা এবং বিশেষ ধরনের আঁটসাঁট আঁচকান পরিধান করতেন। জৌলুসপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও মাথায় কখনও চুল রাখতেন না। হুক্কা কিংবা নেশাকর পানীয়-দ্রব্যাদি কখনও ব্যবহার করেন নি। পর-স্ত্রীর দিকে কখনও দৃকপাত করতেন না। সেবা-শুশ্রূষা ইত্যাদিতে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। রোগীদের পেশাব-পায়খানাও পরিষ্কার করতেন। হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) হিজরতের প্রস্তুতি নিলে তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে বিদায় নিতে যান। কেউ জিজ্ঞাসা করলো যে, আবূ মুহাম্মদ সাহেব! তুমিও কি হিজরত করে জিহাদ করতে যাবে;—তখন বলতেন, জানিনা—হিজরত এবং জিহাদ কাকে বলে। আমাদের ভাই মিঞা সাহেব যাচ্ছেন। আমি মনে করছি যে, আমিও দালমু পর্যন্ত তাঁকে পৌঁছে দিয়ে আসি। এ কথাই বলতে বলতে দালমু, বান্দাহ্ গোয়ালিয়র, টুংক, আজমীর এমন কি সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যান।

অবস্থা। যে সমস্ত লোক ময়দান থেকে শহীদদের লাশ উঠাচ্ছিলো,—আমি তাদের আওয়াজ দিয়ে জানালাম যে, এদিকে এসো! সৈয়দ আবূ মুহাম্মদ এদিক পড়ে আছেন। সেদিক থেকে এক ব্যক্তি আসলো। আমার নিকট একটি কম্বল ছিলো। আমি তাকে উঠিয়ে এর উপর শুইয়ে দিলাম। আমরা দু'জনে তাকে 'তূর্দ'-এ নিয়ে এলাম। তখনও তার ভেতর প্রাণের ক্ষীণ স্পন্দন বাকী। ঠিক তেমনি ঠোট চাটছিলেন আর জিহ্বায় উচ্চারিত হচ্ছিলো—অস্পষ্ট ও বিড় বিড় স্বরে যা আল-হ'ামদুলিল্লাহ্‌র ন্যায় মনে হচ্ছিলো, আর এভাবেই তার রূহ মুবারক অনন্ত মহাশূন্যের বুকে পাখা মেল্‌লো।

মৃত্যুকালে লেগে থাকে ঠোঁটে মুচকী হাসি

মযবুত গড়নের সুঠাম ও দীর্ঘদেহী স্বাস্থ্যবান যুবক। নাম তার কালে খান। তার শরীর দেখে মনে হয়, সম্ভবত মুজাহিদ বাহিনীতে আসবার প্রাক্কালে সে কুস্তিগীর ছিলো। যেমনি ব্যায়ামপুষ্ট দেহ তেমনি মযবুত কাঠামো। এখন পর্যন্ত ভেতরে অতীত দিনের কিছু চিহ্ন ও পরিচয় বাকী রয়ে গেছে। কখনো কখনো যৌবন-তারুণ্যের উচ্ছাসে শিরা-উপশিরাগুলো অধীর চাঞ্চল্যে লাফিয়ে ওঠে আর তখন সে দাঁড়ি-গোফ মোচড়াতে থাকে। হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) আমরু বি'ল-মা'রূফ ওয়া নাহী 'আনি'ল-মুনকার'—সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ-এর ক্ষেত্রে কঠোর নীতি অবলম্বনকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি এ সব কিছুই দেখতেন, কিন্তু কৌশলগত কারণে তাকে কিছুই বলতেন না। এতসব সত্ত্বেও এই যুবক সৈয়দ সাহেবের অত্যন্ত একনিষ্ঠ ভক্ত এবং আত্মোৎসর্গীত ছিলো। একদিন সে দাঁড়ি মুণ্ডন করে সৈয়দ সাহেবের সম্মুখীন হয়। সৈয়দ সাহেব তার থুতনীতে হাত বুলিয়ে দেন এবং বলেন, খান ভাই! তোমার থুতনী কত মোলায়েম ও মসৃণ। একথায় সে খুব লজ্জা পায় এবং নিশ্চুপ থাকে। সৈয়দ সাহেবের কথায় তার অন্তর-মানসে গভীর রেখাপাত করে। কয়েকদিন পর স্বাভাবিক নিয়মেই দাঁড়ি যখন একটু বড় হলো সে চাইলো একে ভেজাতে ও মুণ্ডাতে,—তখন সে আপন মনেই বললো, এই থুতনীতে সৈয়দ সাহেবের হাতের পরশ লেগেছে। এখন এর উপর তোমার ক্ষুর আর চলতে পারে না। এমনিরূপেই থাকতে দাও। এরপর ঐ দিন থেকে সে আর দাঁড়ি মুণ্ডোয়নি এবং পরিপূর্ণ নেককার ও মুত্তাকী বনে যায়।

এই মুজাহিদ মায়ারের যুদ্ধে সৈয়দ সাহেবের সঙ্গে অশ্বারোহী ইউনিটে ছিলো এবং সৈন্যবাহিনীর কাতারের মধ্যে ঘুরে ঘুরে ঘোষণা করছিলো যে, ভাইয়েরা আমার ! কাতার সোজা রাখো এবং সীসার গলিত প্রাচীরের ন্যায় হয়ে যাও। এভাবে বলতে থাকাকালীন অবস্থায়ই তার বাম পার্শ্বে কামানের গোলা এসে লাগে এবং সে ঘোড়া থেকে পড়ে যায় আর কাতার যায় সামনে এগিয়ে। হেদায়েতুল্লাহ্ বানিস বেরেলভী (র) বলেন যে, লোকজন তাকে মায়ারের মসজিদে একটি কামরায় নিয়ে আসে। এ সময় মৃত্যুর সাথে তার লড়াই চলছিলো। মুখে বিড় বিড় করে আউড়ে চলছিলো আল্লাহ্। আল্লাহ্ ! যিকর। কিছুক্ষণ পর সে জিজ্ঞাসা করলো, ভাই ! যুদ্ধের সংবাদ কি? যুদ্ধে কার জয় হলো? সে সময় পর্যন্ত যুদ্ধে দুররানী-দের প্রথম এবং দ্বিতীয় ধাক্কা এসেছিলো। আমি বললাম যে, এখনও যুদ্ধের অবস্থা অত্যন্ত তুঙ্গে। দুররানীদের সম্পূর্ণ পরাজয় এবং সৈয়দ সাহেবের জয়লাভের পর সে আরও একবার জিজ্ঞাসা করেছিলো যে,—এখন যুদ্ধ কোন কোন পর্যায়ে চলছে, --যুদ্ধে কারও হারজিত হয়েছে কিনা? আমি বললাম, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সৈয়দ সাহেবকে বিজয় দানে ধন্য করেছেন। একথা শোনামাত্রই সে 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলে আর পর মুহূর্তেই তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায়।

আহত যুবক

১৭-১৮ বছরের যুবক সৈয়দ মুসা। তার পিতা সৈয়দ আহমদ আলী সাহেব যেদিন ফুলড়ের যুদ্ধে শহীদ হন সেদিন থেকেই তার প্রকৃতি বিমর্ষতায় ঢেকে যায়। কখনো কখনো আপন বন্ধু-বান্ধবদের বলতো যে, যদি কখনো কোন যুদ্ধে যাবার সুযোগ হয় তবে ইনশাআল্লাহ্ ক্ষেতের মাঝ-খানে আমাকে দেখবে অর্থাৎ আমিও লড়াই করে শহীদ হয়ে যাবো। তার এ অবস্থা সম্পর্কে সৈয়দ বেরেলভী (র)-ও অবহিত ছিলেন। সে ছিলো রিসালদার 'আবদুল হামিদ খানের অশ্বারোহী বাহিনীর একজন সদস্য। যখন তূর্দ থেকে মায়ার অভিমুখে সৈন্যবাহিনী রওয়ানা হয় তখন তিনি (সৈয়দ আহমদ বেরেলভী র) তাকে বলেন, তুমি তোমার নিজের ঘোড়া অপর কোন ভাইকে দিয়ে দাও এবং আমাদের সাথে পদাতিক বাহিনীতে থাকো। সে আরয করলো,—আপনি আমাকে এভাবেই থাকতে দিন। দুররানীদের আক্রমণ শুরু হলে সে ঘোড়ার লাগাম

উঁচিয়ে তার ভেতর প্রবেশ করে এবং তলোয়ারের সাহায্যে তাদের কচুকাটা করতে থাকে,—অনেককেই করে আহত। অবশেষে সে নিজেও আহত হয়,—কিন্তু শেষ পর্যন্ত লড়াই অব্যাহত রাখে। অবশেষে আঘাতে আঘাতে হাত দু'টো অচল ও অকর্মণ্য হয়ে গেলে এবং মাথায় কয়েকটি যখম পেলে সে ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে বেহুশ হয়ে পড়ে যায়।

খাবী খান বলেন যে, আমি দূর থেকে শুনতে পেলাম কোন একজন আহত সৈন্য মাটিতে পড়ে 'আল্লাহ্! আল্লাহ্!' বলে কাতরাচ্ছে। আমি নিকটে গিয়ে দেখে তাকে চিনতে পারি। আরে! এ যে সৈয়দ মূসা! মাথার আহত স্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিলো। ফলে তার চোখ ছিলো বন্ধ। আমি বললাম,—মিঞা মূসা! আমি কি আপনাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবো? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—কে তুমি? আর যুদ্ধে জয় হলো কার? আমি বললাম, আমি খাবী খান বলছি আর যুদ্ধে সৈয়দ বাদশাহ্‌র জয় হয়েছে। তিনি শুনে আলহ'ামদুলিল্লাহ বললেন এবং কিছুটা শান্ত ও স্থির হয়ে গেলেন। বললেন,—আমাকে নিয়ে চলো। আমি আমার পিঠে করে তাকে উঠিয়ে আনলাম। সৈয়দ সাহেব তাকে বেচইন দেখে বললেন যে, তাকে মায়ারের মসজিদের হুজরায় পৌঁছিয়ে দাও। অতঃপর তিনি তার কতিপয় বন্ধুকে খেদমতের জন্য তার সাথে পাঠিয়ে দিলেন।

মওলবী সৈয়দ জা'ফর আলী লিখেছেন যে, হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) তাকে দেখবার উদ্দেশ্যে আগমন করেন। তিনি বললেন, এই বাচ্চা অত্যন্ত পুরুষ-সিংহ এবং বিশ্বজাহানের যিনি মালিক মোখতার,—তাঁর হক খুবই উত্তমভাবে আদায় করেছে। এরপর তাকে সম্বোধন করে বললেন—আলহ'ামদু লিল্লাহ্! তোমার হাত-পা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যবহৃত হয়েছে। তোমার প্রচেষ্টা কৃতজ্ঞতা লাভের হকদার হয়েছে। যদি তুমি কাউকে দেখতে পাও সে ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়েছে, তাকে তাকে পায়ের গোড়ালী দিয়ে আঘাত করছে ও দৌঁড়াচ্ছে, তাহলে তুমি এর জন্য আক্ষেপ ও অনুতাপ করবে না যে, আমার হাত-পা ভালো ও অক্ষত থাকলে আমিও অনুরূপভাবে ঘোড়া ছুটাতাম। তোমার হাত-পা আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হয়ে গেছে। আর সে হাত-পা অত্যন্ত মুবারকও বটে যে হাত-পা বিশ্বজাহানের প্রভু-প্রতিপালকের কাজে লেগেছে এবং তাঁরই উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তিকে দেখতে পাও যে, সে

পাট্টাবাজ উস্তাদের মতো তলোয়ারের সাথে খেলছে—তাহলে দুঃখ করবে না যে, আমিও যদি সুস্থ হ'তাম তবে তলোয়ারের যাদুকরী ক্ষমতা ও নৈপুণ্য আমিও প্রদর্শন করতাম। দুঃখ করবে না এজন্যে যে, তোমার হাত-পায়ের মরতবা অত্যধিক। কেননা তা আল্লাহ্‌র রাস্তায় আহত হয়েছে,—যখম খেয়েছে। যে হাত-পা সুস্থ ও কর্মক্ষম তার দ্বারা গোনাহ্‌র আশংকা ষোল আনা,—কিন্তু তোমার হাত পায়ের ছওয়াব আল্লাহ্‌র কাছে জমা রইলো। সায়্যিদানা হযরত 'আলী মুরতাযা (রা)-এর ভ্রাতা হযরত জা'ফর তাইয়ার (রা)-এর দু'বাহুই আল্লাহ্‌র রাস্তায় কাটা গিয়েছিলো। আল্লাহ্ পাক জান্নাতুল ফিরদাউসে "যু'ল-জানাহ্'ায়ন" উপাধি দ্বারা যেমন তাঁকে সম্মানিত করেছেন তেমনি যমররুদ নির্মিত দু'বাহুও তাঁকে দান করেছেন।

সৈয়দ মূসা আরয করলো যে, আমি সহস্র মুখে আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। বর্তমান অবস্থাতেই আমি রাজী এবং শোকর-গোযারও বটে। আমার অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধে আদৌ কোন অভিযোগ নেই। আর তা এজন্যে যে, আমি তো এ কাজের জন্যই আপনার সফর সঙ্গী হয়ে এসেছিলাম। আল্লাহ্ পাকের যাবতীয় প্রশংসা যে, আমার অস্তিত্বকে এরূপ সর্বশ্রেষ্ঠতম 'ইবাদতের মধ্যে বিলীন করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ পাক কবূল করে নিন। কিন্তু আমার এতটুকু আশা যে, আপনি প্রত্যহ একবার আপনার যিয়ারত দ্বারা আমাকে ধন্য করবেন। কেননা হাত-পা হারাবার কারণে স্বয়ং উপস্থিত হতে আমি অক্ষম। এ বঞ্চনা ছাড়া আর কোন কিছুর জন্য আমার আফসোস নেই।

একথা শুনে সৈয়দ সাহেব দাদা আবুল হাসানকে বললেন, আমি তোমাকে এই কাজের জন্য নিযুক্ত করছি যে, যখনই তুমি আমাকে কোন কাজ থেকে এতটুকু অবসর দেখবে তখনই আমাকে এদিকে স্মরণ করিয়ে দেবে যেন স্বয়ং আমি সৈয়দ মূসার কাছে আসতে পারি। এরপর তিনি সৈয়দ মূসাকে অত্যন্ত প্রশংসা করেন এবং খুবই বাহ্‌বা দিয়ে বিদায় নেন।[১]

ঈমানী জ্ঞানের কতিপয় ঝলক

মায়ারের যুদ্ধের ময়দান থেকে মুসলমানেরা বিজয়ী হয়ে ও সাফল্য লাভ করে প্রত্যাবর্তন করে। লোকজনের কাপড়-চোপড় ও চেহারা এতই

১. মনজুরু'স-সা'দাহ্ ;

ধূলোয় ধূসরিত ছিলো যে, এদের অনেককে তাৎক্ষণিকভাবে চেনাই যাচ্ছিলো না। আরবাব বাহ্‌রাম খান সৈয়দ সাহেবের কাছে আসেন এবং রুমাল নিয়ে, তাঁর চেহারা মুবারক থেকে ধূলো ঝেড়ে দেতে চাইলেন। তিনি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, খান ভাই! এ ধূলো বড়ই বরকতময়। হযরত সরওয়ারে 'আলম (স') এ ধূলোর অত্যন্ত ফযীলত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যার পা এ ধূলোয় ধূসরিত হবে সে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুন থেকে নাজাত পাবে। এই যে যাবতীয় তকলীফ ও পরিশ্রম তা এই ধূলোটুকু লাভের জন্যই করেছে। একথা শুনে সকল লোকজন তেমনি ধূলোয় ধূসরিত অবস্থায় রইলো। সেখানে থাকা অবস্থায় কেউই সে ধুলো ঝাড়েনি।

জোহরের সালাত আদায়ের পর খালি মাথায় তিনি বহুক্ষণ ধরে দো'আ মুনাজাতের মাঝে কাটিয়ে দিলেন। এই দো'আতে নিজের উপলব্ধিতে আল্লাহ্ তা'আলার খোদাওয়ান্দী ও প্রতিপালনবাদ, মহত্ব ও মর্যাদা এবং পরাক্রম, রহমত ও ক্ষমাশীলতা, অধিকন্ত এর সাথে নিজের দুর্বলতা ও বিনয়-নম্রতার কোনোটি প্রকাশেই কোনরূপ ত্রুটি রাখেন নি। তাঁর চোখ দিয়ে এরূপ অবিরল ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে যে, দাঁড়ি ভিজে গিয়েছিলো। আর এমনিতরো অবস্থা ছিলো প্রায় সকলেরই। দো'আর পর আরও কতকক্ষণ তিনি বিশ্রাম নেন এবং এরপরই তিনি রওয়ানা হয়ে তূর্দ নামক স্থানে এসে আসরের সালাত আদায় করেন।

যুদ্ধের ময়দান থেকে বিজয় ও সাফল্য লাভ করার পর হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)- বলেন, "আল্লাহ তা'আলার হাজার হাজার শোকর যে, তিনি তাঁর অপার দয়া ও করুণা দ্বারা আমাদেরকে বিজয়মণ্ডিত করেছেন, মুসলমান রেখেছেন এবং এটাও তাঁর বিরাট অনুগ্রহ যে, সংখ্যাল্পতা ও সাজ-সরঞ্জামহীনতা সত্তেও আমাদের মধ্যে কেউ বলে না যে, আমরা জয়-লাভ করেছি, আমরা দুশমনের উপর বিজয়ী হয়েছি; বরং সমস্ত গাযীদের এটাই বক্তব্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা শুধুমাত্র তাঁর অপার কুদরত ও শক্তি দ্বারা আমাদের এমন একটি শক্তিশালী প্রতিপক্ষের উপর—যা ছিলো সাম্রাজ্য ও বিরাট ধনভাণ্ডারের মালিক এবং যা আমাদের উপর পঙ্গপালের মতো চড়াও হয়েছিলো—আমাদের জয়যুক্ত করেছেন।"

এরপর তিনি বললেন, "এটাও আল্লাহ্‌তা'আলার অপার করুণা ছিলো যে, এ যুদ্ধে তিনি আমাদের অন্তরে এমনি আশ্চর্য ধরনের শান্তি ও তৃপ্তি

নাযিল করেছিলেন যে, যুদ্ধের শোরগোল ও হাঙ্গামা আমাদের মনের উপর কোনই প্রভাব ফেলতে পারেনি,—পারেনি কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে। সে সময় আমাদের যুদ্ধের ময়দানে যাওয়া এবং দুশমনের সাথে লড়াই করাটাকে এমন মনে হচ্ছিলো যেন কোন দাওয়াতে যাচ্ছি ; মনে হচ্ছিলো—আমরা যেন কোথাও খিচুড়ী খেতে গিয়েছিলাম।"

যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছিলো তাদের দাফন করার জন্য আনা হলো। মওলানা মুহাম্মদ ইসমা'ঈল বললেন, তাদের চেহারা তাদের পাগড়ী দিয়ে ঢেকে দাও এবং তাদের কাপড় দেখে নাও। পয়সা-কড়ি ইত্যাদি কিছু ওতে বাঁধা থাকলে তা খুলে নাও। জনৈক ব্যক্তি কবরে নেমে তাদের চেহারা ঢেকে দেয় এবং কোমরবন্দ ইত্যাদি খুঁজে দেখে। অতঃপর কয়েক ব্যক্তি বড় ধরনের চাদর কবরের মুখের উপর টান করে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে আর অন্য সবাই মাটি দিতে থাক। তক্তা কিংবা এ জাতীয় কিছুই রাখা হয় নি এবং এ ভাবেই মাটি দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। এরপর মওলানা সাহেব এবং উপস্থিত আরও সবাই মিলে বহু ক্ষণ ধরে সকল শহীদের জন্য দো'আ ও মাগফিরাত কামনা করেন। দাফন কাজে যে সমস্ত লোক ছিলেন তারাও সবাই এদের মহব্বতে কাঁদছিলেন এবং বলছিলেন যে, এই সমস্ত লোক যেই মহান লক্ষ্যের জন্য এসেছিলেন তারা সে লক্ষ্যে পৌছে গেছেন। এ ধরনের শাহাদত আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরও নসীব করেন।

অল্প কিছু পরেই মাগরিবের আযান হয়। সবাই সৈয়দ সাহেবের পেছনে সালাত আদায় করে। সালাত সম্পন্নের পর তিনি বহু ক্ষণ ধরে মাথা খালি অবস্থায় সমস্ত শহীদের মাগফিরাতের জন্য দো'আ করেন, "পরওয়ার-দিগারে 'আলম! তুমি খুবই জানো যে, এ সমস্ত লোক শুধুমাত্র তোমারই সন্তুষ্টি ও রিযামন্দী লাভের জন্য নিজেদের ঘর-বাড়ী ও ধন-সম্পদ পরি-ত্যাগ করে এখানে এসেছিলো—আর শুধুই তোমার রাস্তায় তারা নিজে-দের জীবন বিলিয়ে দিয়েছে। তুমি তাদের গোনাহ্-খাতাকে তোমারই রহমতের আঁচল ছায়ায় ঢেকে নাও এবং জান্নাতু'ল-ফেরদাউসে তাদের স্থান দাও। তাদের প্রতি তুমি সন্তুষ্ট হও। আর আমরা যে কতিপয় দুর্বল ও গরীব তোমারই অনুগত বান্দাহ অবশিষ্ট আছি তাদেরকেও তোমা-রই রিযামন্দী ও সন্তুষ্টির রাস্তায় জীবন ও সম্পদসহ কবুল করে নাও।

বিপদ-আপদ, শয়তানী ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা দূর করে দাও এবং অন্তর-রাজ্যকে ইখলাস ও মহব্বত দ্বারা পরিপূর্ণ করো, তোমরাই দীনে মুহাম্মদীকে শক্তি দাও---উন্নতি দাও এবং যে সমস্ত লোক এই মযবুত ও সুদৃঢ় দীনের দুশমন ও অকল্যাণকামী---তাদের হেয় ও অবমানিত করো, যে সমস্ত মুসলমান শয়তানী ফেরেব ও আত্ম-প্রবঞ্চনার শিকার হয়ে শরী'য়তের রাস্তা ভ্রষ্ট হয়েছে এবং গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার মাঝে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তাদেরকে হিদায়াত দান করো যেন তারা খাঁটি ও পাক্কা মুসলমান হয়ে তোমার এই কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক কাজে জান ও মাল দিয়ে পরিবার-পরিজনসহ শরীক হয়।"

দো'আর পর কোন একজন বললো যে, হযরত! আজকের লড়াইয়ে প্রায় চল্লিশজন গাযী শহীদ হয়েছেন এবং আহতের সংখ্যাও প্রচুর। আর বহু ভালো ভালো লোকও এতে শহীদ হয়েছেন। কিন্তু শহীদ ও আহতদের মধ্যে খেয়াল করে দেখা গেলো যে, ফল্লতওয়ালা ভাইদের মধ্যে শেখ 'আবদুল হাকিম ছাড়া আর কেউ শহীদ হননি। এ কথা শুনে তিনি বললেন, "আমাদের ফল্লতওয়ালা ভাইদের উপর নজর দিও না। ইনশাল্লাহ তাদের শহীদ ভাণ্ডার কোথাও একত্রিত হবে।"[১]

পেশোয়ার বিজয়

মায়ারের যুদ্ধ থেকে নিষ্কৃতি পাবার পর হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) পেশোয়ার অভিমুখে অগ্রাভিযানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। পেশোয়ার হচ্ছে কাবুল ও লাহোরের মধ্যখানে অবস্থিত সবচেয়ে বড় শহর। সুলতান মুহাম্মদ খানের (যে মুজাহিদ বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিরাট সৈন্য-সামন্ত-সহ এসেছিলো, সকল শক্তি নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলো এবং তাদের সাথে কোন প্রকারের নমনীয় মনোভাব ও সদ্ব্যবহার প্রদর্শন করে নি; এমন কি কোন মহানুভব ব্যক্তির প্রতি সামান্যতম মর্যাদা ও শ্রদ্ধাবোধও সে প্রদর্শন করে নি।) পাপের ভাণ্ডার ষোল কলায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। এবং সে পেশোয়ার বিজয়ের জন্য রাস্তাও উন্মুক্ত করে দিয়েছিলো।

সৈয়দ সাহেব সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তুর্দ নামক স্থান থেকে মর্দান অভি-মুখে রওয়ানা হন। তিনি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে পদাতিক বাহিনীর অভ্য-

১. বালাকোট যুদ্ধে এমনটিই হয়েছিলো। শেখ ওয়ালী মুহাম্মদ এবং শেখ উযীর ছাড়া বাকী সবাই শহীদ হন।

ন্তর ভাগে অবস্থান করছিলেন। বাহিনীর অগ্রে ও পশ্চাতে ছিলো অশ্বারোহী সৈন্য। পদাতিক বাহিনীর হাতে ছিলো দু'টো ঝাণ্ডা আর অশ্বারোহী বাহিনীর হাতে ছিলো একটি এবং তিনটি ঝাণ্ডাই শূন্যে আন্দোলিত হচ্ছিলো। মওলবী রহমান আলী ও মওলবী খুররম আলী সাহেবের জিহাদ সম্পর্কিত লিখিত কাব্য-গ্রন্থ থেকে উচ্চ ও মিষ্টি-মধুর ইলহান সহকারে আবৃত্তি করে চলেছিলেন। এর ফলে লোকজনের ভেতর অদ্ভুত ও বিশেষ এক ধরনের অবস্থা বিরাজ করছিলো।

হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) মর্দানে দু'রাত অতিবাহিত করেন। অতঃপর পেশোয়ার অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে কতিপয় বস্তি ও পল্লী অঞ্চলের লোকেরা দুররানীদের জুলুম-অত্যাচার সম্পর্কে তাঁর নিকট অভিযোগ করে। এখান থেকে পেশোয়ার ছিলো পনের ষোল মাইল। নদী পারাপারের কোন নৌকা পাওয়া গেলো না। দুররানী বাহিনী নদী পার হয়ে সকল নৌকাই ডুবিয়ে দিয়েছিলো যেন তা গাযীরা ব্যবহার করতে না পারে। যাই হোক সোয়াত নদীর একদিকে খুব অল্পই পানি ছিলো, সেই দিক দিয়ে সবাই পার হয় এবং মুঠ নামক স্থানে অবস্থান নেয়। সেখানকার লোকেরা মুসলিম সৈন্যবাহিনীর আগমনে অত্যন্ত খুশী হয়। তারা বলতে থাকে, সুবহা'নাল্লাহ্! এ একটি আশ্চর্য বাহিনী যে, ছয় সাত হাজার পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী ডেরা স্থাপন করা সত্ত্বেও কারোর উপর কোন জুলুম-অত্যাচার নেই,—নেই কোন নির্যাতন। অপরদিকে দুররানীদের দু'টো পদাতিক বাহিনী আগমন করলেও আমরা ঘর-বাড়ী পরিত্যাগ করে পাহাড়ে আশ্রয় নিতাম। মোটকথা, মুসলিম সৈন্যবাহিনী যে এলাকার উপর দিয়েই অতিক্রম করতো—জনগণ অন্তর থেকেই তাদের খোশ-আমদেদ জানাতো। নারী-পুরুষ অধিকাংশই রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে সৈয়দ সাহেবকে সালাম করতো ও বরকত হাসিল করতো।

ঐ এলাকায় দু'তিন দিন অতিক্রান্ত হয়। এলাকার জ্ঞানী-গুণী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর খেদমতে হাযির হয়ে পেশোয়ারের গোটা ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণভার নিজেদের হাতে তুলে নেবার জন্য দরখাস্ত পেশ করে। তিনি তাদের প্রশ্ন করেন যে,—তোমাদের এখানে ব্যবস্থাপনা কি ভাবে চলে? তারা বললো, পোশোয়ারের সর্দারমণ্ডলীর তরফ থেকে রাজস্ব আদায়ের এটাই মূলনীতি যে, প্রজাদের ক্ষেতের

খাদ্যশস্যের অর্ধেক অংশ তারা আদায় করে নিয়ে যায় এবং মুনশী ও কয়ালের পারিশ্রমিক পরিশোধের দায়িত্ব তাদেরই (প্রজাদের) বহন করতে হয়। ফল এই দাঁড়ায় যে, প্রকারান্তরে প্রজামণ্ডলীর ভাগে উৎপন্ন ফসলের মাত্র এক-তৃতীয়াংশই অবশিষ্ট থাকে। তিনি বললেন, প্রজামণ্ডলী উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ নগদ অর্থের আকারে আমাদেরকে প্রদান করবে। বাকী যাবতীয় ব্যবস্থাপনার খরচাদি ইমামের দায়িত্বে ও যিম্মায় থাকবে। প্রজামণ্ডলী সে সবের হাত থেকে থাকবে মুক্ত। তিনি এও বললেন যে, যদি আমাদের ব্যবস্থাপনার ভেতর কোথাও কাউকে মজদূরী অথবা চাকরী করানো হয় তবে তার পারিশ্রমিক তাকে দেওয়া হবে। অবশ্য আমাদের অশ্বারোহী কিংবা পদাতিক বাহিনীর কোন সদস্য যদি রাজস্ব আদায়ের জন্য পল্লী অঞ্চলের খানদের নিকট যায় তবে তাদের উচিত হবে তাকে নিজের ভাই মনে করে দাওয়াত করা এবং তারও উচিত হবে না তাদের নিকট কোন জিনিসের ফরমায়েশ দেবার। আর যদি খানদের নিকট কোন জিনি-সের ফরমায়েশ করে তবে আমাদের নিকট তার জন্য তাকে জওয়াবদিহি করতে হবে।

সৈন্যবাহিনী পেশোয়ারের নিকটবর্তী হলে হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) সংবাদ পান যে, সুলতান মুহাম্মদ খান আপন সম্পর্কিত ব্যক্তিদের কোহাট পাঠিয়ে দিয়েছে এবং নিজে স্বয়ং সৈন্যবাহিনীসহ কোন এক পল্লীতে পড়ে আছে। ফয়যুল্লাহ খান সুলতান মুহাম্মদ খানের পক্ষ থেকে উকীল হয়ে আসে এবং সুলতানের পক্ষ থেকে আরয করে যে, আমাদের খুবই অন্যায় হয়েছে যে, আমরা আপনার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলাম। আমরা আমাদের অন্যায় ও অপরাধ থেকে তওবাহ করছি। আপনি আমাদের অন্যায় ও অপরাধ মা'ফ করুন এবং এখান থেকে ফিরে চলুন। সে আরও বলেছিলো যে, যদি কোন কাফিরও আপ-নার খিদমতে আসে ও ঈমান গ্রহণ করে আপনি নিশ্চয়ই তাকে মুসলমান বানাবেন। আমি তো মুসলমানই এবং মুসলমানেরই পয়দায়েশ। নিজের ভুলের স্বীকারোক্তি করছি। আর কখনই এ ধরনের অন্যায় ও কসুর হবে না, সারা জীবনই আপনার অনুগত হয়ে থাকবো।

সৈয়দ সাহেব এসব শুনে বললেন যে, "খান ভাই! আমি তোমাদের খাতিরে এ আবেদন মঞ্জুর করছি। কিন্তু এখান থেকে ফিরে যাবার ব্যাপারে

যে কথা তোমরা বলছো—সে ব্যাপারে আমাদের কথা এতটুকুই যে, তোমাদের সর্দার এরূপ সদয় ব্যবহারের মর্যাদা রাখবে না। এখান থেকে আগামীকাল ইনশাআল্লাহ্ পেশোয়ার যাবো। যদি সে কৃত অঙ্গীকার ও চুক্তি'র উপর আন্তরিকভাবেই কায়েম থাকে তবে আমরা তাকে আমাদের পক্ষ থেকে পেশোয়ারে বসিয়ে চলে আসবো। এটা এজন্যে যে, আমরা এদেশে এ উদ্দেশ্যেই এসেছি, এখানকার সকল মুসলমান ভাইদের এক মতাবলম্বী করে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবো যাতে করে ইসলামের তরক্কী হয় এবং কুফরী শক্তি হয় পর্যুদস্ত।" অতঃপর সৈয়দ সাহেব সর্দার ফতেহ্ খান এবং আরবাব বাহ্‌রাম খানকে ডেকে বললেন, তোমরা নিজেদের লোকদেরকে খবর পৌঁছিয়ে দাও যে, আজ পেশোয়ার যেতে হবে। কিন্তু খবরদার! কেউ যেন প্রজাবর্গের গায়ে হাত না তোলে। কেননা সুলতান মুহাম্মদ খানের তরফ থেকে সন্ধির পয়গাম এসেছে। এরপর তিনি আরবাব বাহ্‌রাম খানকে ডেকে বললেন, তুমি নিজের কোন বিশ্বস্ত লোককে পেশোয়ার পাঠিয়ে দাও, যে সেখানে বাজারে গিয়ে ঘোষণা করে দেবে যে, আজ সৈয়দ সাহেবের বাহিনী এখানে আগমন করবে। সকল দোকানদার নিজ নিজ দোকানের দরোজা বন্ধ করে রাখবে যেন কারও মাল-আসবাব হারিয়ে না যায়।

এরপর তিনি সৈন্যবাহিনীকে অগ্রসর হবার জন্য ঘোষণা দিলেন। মুজাহিদ বাহিনী ঘোষণা শুনতেই প্রস্তুতি সম্পন্ন করে নেয়। কিছুক্ষণ দেরী করতেই আসরের আযান হলো। সবাই সালাত আদায় করলো। সৈয়দ সাহেব খালি মাথায় দো'আ করলেন এবং সেখান থেকে সৈন্যদের নিয়ে রওয়ানা হলেন। অশ্বারোহী বাহিনী সৈয়দ সাহেবের পেছনে ছিলো এবং পদাতিক বাহিনী ছিলো আগে। বাহিনী পশ্চিম দিকের কাবুলী দরজা থেকে বাজার হয়ে শহরে প্রবেশ করে। বাজারের দোকান-পাট ছিলো বন্ধ। কিন্তু জায়গায় জায়গায় পানি ও শরবতের সবীল রাখা হয়েছিলো। স্থানে স্থানে দোকানের উঁচু জায়গায় এবং ছাদের উপর প্রদীপ জ্বালিয়ে আলোকোজ্জ্বল করে রাখা হয়েছিলো। সমস্ত লোকজন সৈয়দ সাহেব এবং গাযীদের জন্য শুভ কামনা করে দো'আ করছিলো। সৈয়দ সাহেব গোল গাঠুরীতে অবস্থান গ্রহণ করেন। এটা ছিলো একটা বিস্তৃত পাকা-পোক্ত সরাইখানা। সৈন্যবাহিনী সরাইখানার বাইরে বিশ্রাম নেয়। পাহা-রার বন্দোবস্ত করা হয়। সৈন্যবাহিনী ধীর-স্থির থাকে এবং যে কোন

বিপদ-আপদের মুকাবিলা করবার জন্যে তৈরী হয়ে যায়। রাস্তা, মহল্লা ও লোক চলাচলের স্থানগুলির উপর পাহারাদার এবং রক্ষী মোতায়েন করা হয়।

ভোরবেলা সৈয়দ সাহেব হাবেলীতে সালাত সম্পন্ন করেন এবং দো'আ করেন। দো'আর পর তিনি আরবাব বাহ্‌রাম খানকে বলে পাঠান যে, বাজারের দোকানদারদের নির্দেশ পাঠিয়ে দাও যে, তারা যেন নিশ্চিন্ত মনে দোকান খোলে। বাজারী মেয়েরা পেশোয়ারের বাজারে—যাদের সংখ্যাও ছিলো বেশ--গা ঢাকা দেয়। যদি কোন পুরুষ তাদের সেখানে যেতেও চেয়েছে তখন তারাই চীৎকার করে বলেছে, খবরদার! এখানে আসবে না। অন্যথায় তোমাদেরও ভালো হবেনা—আর আমাদেরও। এমনি করেই ভাঙ ও মদের দোকানগুলোও বন্ধ হয়ে যায় আর পানাসক্ত'রা যায় গায়েব হয়ে। হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) কঠোরভাবে হিদায়াত পাঠিয়ে দেন যে, বাহিনীর কোন একজন সদস্যও যেন পেশোয়ারের কোন একটি বাগানের ফল না ছিড়ে।

দু'দিন পর্যায়ক্রমে সৈন্যবাহিনী ক্ষুধার্ত ও ভুখা থাকে এবং কোন কিছু খানাপিনা ব্যতিরেকেই রাত কাটায়। শহরে ফল-মূল আর খাদ্যের দোকান ছিলো—ছিলো খাদ্যের ভাণ্ডার। কিন্তু কোন সৈন্যই তার উপর হামলা করতে প্রয়াসী হয়নি। অবশেষে আরবাব বাহ্‌রাম খান শহরের মহাজনদের থেকে কর্জ নিয়ে ঐ সব দোকান থেকে আটা খরিদ করেন এবং তন্দুর রুটি প্রস্তুতকারীদের দ্বারা তা প্রস্তুত করিয়ে নিয়ে তাদের কাজের পারিশ্রমিক প্রদান করেন। ফলে তৃতীয় দিনে সৈন্যবাহিনীর ভাগ্যে খাবার জোটে। পথিমধ্যে সৈন্যরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে বলাবলি করে আসছিলো যে, আজ পেশোয়ারে গিয়ে আঙ্গুর, আনারস, সেব ফল, নাশপাতি ইত্যাদি খুব তৃপ্তির সাথে খাবো এবং একই সঙ্গে চাউল ও দুম্বার গোশত রান্না করবো। লোকেরা রুটি খাবার সময় নিজেরা বলাবলি করছিলো যে, আজ তৃতীয় দিনে রুটি যে মিললো এটা আমাদের পূর্ব খামখেয়ালীরই শাস্তি।

দুররানী বাহিনীর একটি অংশ মুজাহিদ বাহিনীর পেশোয়ার প্রবেশের পূর্বে এই অভিসন্ধিতে ছিলো যে, পেশোয়ারের রাস্তায় কোথাও তাদের উপর হামলা করবে। কিন্তু তাদের এ মওকা মেলেনি এবং মুজাহিদ বাহিনী

শান্তির সঙ্গে ও নিরাপদেই পেশোয়ার প্রবেশ করে। এতে সুলতান মুহাম্মদ খানের সৈন্যবাহিনীর মন ভেঙে যায় এবং এদিকে-ওদিকে যতো অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী ছিলো—তারা তাল-বাহানা করে নিজের নিজের বস্তি অভিমুখে রওয়ানা হয়ে পড়ে। এখন যুদ্ধের আর কোন সুযোগই রইলো না। এতে সে হতভম্ব হয়ে ও উপায়ান্তর না দেখে আরবাব ফয়যুল্লাহ খানের মাধ্যমে সৈয়দ সাহেবকে এই পয়গাম পাঠায় যে, আপনি আমাদের দীন ও দুনিয়ার অনুসরণীয় ইমাম; আমরা আপনার সর্বপ্রকার বাধ্য ও অনুগত থাকবো। আমাদের অন্যায় হয়ে গেছে যে, নিজেদের দূর্ভাগ্যজনক কার্যাবলী দ্বারা আমরা আপনার বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী পরিচালিত করেছিলাম। আমাদের অবিমৃষ্যকারিতার শাস্তিও আমরা পেয়েছি। আমরা আপনার ক্ষমা ও মহৎসুলভ চরিত্রের নিকট আশাবাদী যে, আপনি আমাদের অন্যায় অপরাধ মাফ করে দেবেন। সকল প্রকার দুষ্টবুদ্ধিজনিত কার্যকলাপ থেকে আমরা এখন তওবাহ্ করছি। আল্লাহ্ চাহে তো আমাদের দ্বারা কখনও এ ধরনের কাজ আর হবে না।

ফয়যুল্লাহ্ খানের এ সমস্ত বক্তৃতা শুনে সৈয়দ সাহেব বললেন যে, "খান ভাই! তুমি এর ভেতর থেকো না। সে বড় মিথ্যাবাদী ও বাক্যবাগীশ। যে কোন প্রকারের কার্যোদ্ধার তার একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। অঙ্গীকার কিংবা চুক্তির কোনরূপ ধারই সে ধারে না। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে ভেজা বেড়ালের ন্যায় বাধ্য ও অনুগত ভৃত্য সাজে। কিন্তু যখনই সিদ্ধিলাভ ঘটে তখন এমন আচরণ শুরু করে যেন সে কাউকে চেনেই না। এরা না লজ্জা-শরমের বালাই রাখে আর না আল্লাহ ও আল্লাহ্র রসূলের প্রতিই এদের কোন ভয়-ডর আছে। আমি তাকে এ লড়াইয়ের আগেও—যখন সে এখান থেকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে বেরিয়েছিলো—কয়েকবারই মানুষ পাঠিয়ে বোঝাবার দায়িত্ব পালন করেছি। কিন্তু সে তার একটিও শোনে নাই, অন্যায় ও না-হক'ভাবে আমাদের মুকাবিলা করেছে। অতঃপর পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়ে সে ভেগেছে। আমরা এ পর্যন্ত তার পিছু অনুসরণ করেছি। যখন সে বুঝতে পেরেছে যে, পালাবার আর কোন রাস্তা নেই, তখনই সে তোমাকে মাঝে ফেলে এই চাল চেলেছে।

"এরও আগের ঘটনা। শায়দূতে আমাদের সঙ্গে বুদ্ধ সিংহের সংগ্রাম চলছিলো। তখন এই চার ভাই নিজ নিজ বাহিনীসহ আমাদের সাহায্য

ও সহযোগিতার্থে এসেছিলো। তারা নিজের কূট ষড়যন্ত্র ও দাগাবাজী দ্বারা আমাদের যুদ্ধের ফলাফল ও পরিণতিই একদম পাল্টে দেয়। আমাদের শিখদের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়ে নিজেরা ভেগে যায় এবং শত শত মুসলমানের শাহাদতের কারণ ঘটে। তারপরেও তারা আমাদের সাথে চুক্তি ও অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলো যে, তারা তাদের জীবন ও সম্পদ দিয়ে হলেও আমাদের সাথে সকল অবস্থায় শরীক আছে। তারপর সে অঙ্গীকার পালনের নমুনা কি ছিলো তাও তুমি সব জানো। এখন আবার নতুনভাবে গোড়া থেকেই অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে বলছে; মনে ভেবে নিয়েছে যে, আগে উদ্দেশ্যটা তো হাসিল হোক---তারপর যা হবার পরে দেখা যাবে।

"খান ভাই! আমি তোমার সঙ্গে যে সব কথা বললাম--খুব ভালো-ভাবে কোন কিছু না বাড়িয়ে-কমিয়ে তার সামনে বলবে। আর খান ভাই! তুমি তো ভালো করেই জানো যে, আমরা ভারতবর্ষ থেকে এদেশে এসেছি শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, মুসলমানেরা বিজয়ী হবে এবং ইসলামের উন্নতি হবে। পেশোয়ার নেবার উদ্দেশ্য যেমন আমাদের নেই, তেমনি কাবুল নেবার কোন দরকারও আমাদের নেই। যদি তার অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞার সত্যতা ও বিশ্বস্ততা আমাদের সামনে প্রকাশ পায়---শরী'আত বিরুদ্ধ কার্যাবলী এবং কাফিরদের সঙ্গে সহযোগিতা থেকে সত্যিকার অর্থেই যদি সে তওবাহ্ করে, অধিকন্তু আমাদের মুসলমানদের সাথে ঐক্যজোটে শামিল হয় তবে আমরা এর জন্য এখনও প্রস্তুত আছি।"

আরবাব ফয়যুল্লাহ্ খান আরয করলো যে, আপনি যা কিছু বলছেন তা অত্যন্ত ন্যায্য ও সঠিক। এর ভেতর অসত্যের লেশমাত্রও নেই। যা কিছু ভুলত্রুটি তারই। ইনশা'আল্লাহ্ তা'আলা আপনার বক্তব্য আমি হুবহু তাকে পৌঁছে দেবো। আমি অত্যন্ত সাফ ও দিলখোলা মুসলমান। মুনাফিকী কথাবার্তা আমার স্বভাবে আসে না। আমি তার নুন-নেমক খেয়ে থাকি আর আপনারও খাদেম ও একান্ত বশংবদ। উভয়ের কল্যাণই আমার কাম্য।

তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে সে পুনরায় আসে এবং বলে যে, আমি আপনার সেদিনের বক্তব্য অক্ষরে অক্ষরে সুলতান মুহাম্মদ খানকে জানিয়ে দিয়েছি। শুনে সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়েছে এবং বলেছে যে, সৈয়দ বাদশাহ্ যা কিছু বলেছেন তার ভেতর এতটুকু অতিরঞ্জন নেই। এখন আমি খালেস দিলে অঙ্গীকার করছি এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছি যে, আল্লাহ্ চাহে তো আমার

দ্বারা বিদ্রোহাত্মক ও নাফরমানীমূলক কোন কাজ ভবিষ্যতে আর সংঘটিত হবে না। বিদ্রোহী ও কাফিরদের বন্ধুত্ব ও সকল প্রকার সহযোগিতা থেকে আমরা তওবাহ্ করলাম। আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রসূল (স᾽)-এর সব নির্দেশ আমার চোখের মণি। এ মুহূর্ত থেকে যে জায়গায়ই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সৈয়দ বাদশাহ আমাদের স্মরণ করবেন, সে মুহূর্তেই এবং সেখানেই আমরা বিনা আপত্তিতে নিজেদের জান-মাল দিয়ে—সৈন্যবাহিনীসহ হাযির হবো। এখন আমরা এটাই চাই যে, সৈয়দ বাদশাহ্‌র খিদমতে হাযির হয়ে ইমামতের বায়'আত নবায়ন করবো এবং শরী'আত নিষিদ্ধ সকল কার্যাবলী থেকে পরিষ্কাররূপে তওবাহ্ করবো; সাথে সাথে সৈয়দ বাদশাহ্‌র দেশ সিম্মা থেকে এখান অবধি তশরীফ রাখতে যা কিছু খরচ হয়েছে, জানি না তা কি পরিমাণ হবে, তা যাই হোক চল্লিশ হাজার টাকা আমরা নযরানাস্বরূপ প্রদান করবো। এর ভেতর বিশ হাজার এই মুহূর্তে যখন সৈয়দ বাদশাহ্ নিজের হাতে আমাদের অধিষ্ঠিত করে অগ্রসর হবেন এবং দশ হাজার টাকা—যখন সৈয়দ বাদশাহ্ হশ্‌ত নগর পৌঁছুবেন—সেখানে বালাহিসার দুর্গ থেকে পাবেন এবং বকেয়া দশ হাজার পাবেন তিনি যখন পাঞ্জেতারে পৌঁছুবেন।

সৈয়দ বাদশাহ্ বললেন, খান ভাই! আমরা তো এটাই চাই যে, সে মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতিতে শরীক হোক এবং কাফিরদের মুকাবিলা করুক। আমরা কারো রাজ্য ছিনিয়ে নিতে যেমন আসি নাই,—তেমনি আসি নাই কারো দেশ ছিনিয়ে নিতে। এটা তো সেসব দুনিয়াদার লোকের কাজ যারা দুনিয়ার বুকে রাজত্ব করবার জন্যই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। আমরা শুধু 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌র' নিয়ত রাখি,—নিয়ত রাখি কাফিরদের অবনমিত করতে যাতে ইসলামের তরক্কী হয়। যদি সে সত্যিকার মন-মানসিকতা নিয়ে এই প্রতিশ্রুতিতে অটল ও অনড় থাকে তবে আমরাও ইনশাআল্লাহ্ এ থেকে বাইরে যাবো না।

ক্রমে ক্রমে এ খবর সমগ্র পেশোয়ারে ছড়িয়ে পড়ে। এতে সেখানকার মুসলমান ও হিন্দু সাধারণ ঘাবড়ে যায় এবং তাদের ভেতরকার কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মওলানা মুহাম্মদ ইসমা'ঈল (র)-এর নিকট এসে উপস্থিত হয়ে আরয পেশ করে যে, সারা শহরে সাধারণভাবে মশহুর হয়ে গেছে যে, সৈয়দ বাদশাহ্ পেশোয়ারকে দুররানীদের সোপর্দ করতে ইচ্ছা পোষণ করে

ফেলেছেন। আমাদের অত্যন্ত খুশী ও আনন্দ লেগেছিলো যে, সৈয়দ বাদশাহ্ আমাদের রাষ্ট্র পরিচালক হয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদের সে সমস্ত জালিমদের থেকে নাজাত দিয়েছেন; এখন থেকে আমরা নিশ্চিন্তে থাকতে পারবো। কিন্তু নতুন এ সংবাদে আমাদের মনে খটকা সৃষ্টি হয়েছে যে, পুনরায় আমাদের তাদেরই ধারালো ও হিংস্র নখরের শিকার হচ্ছি এবং এখন আগের তুলনায় আমাদের উপর বেশী করে নির্যাতন চালাবে, করবে জ্বালাতন। তাদের সম্পর্কে আমরা খুব বেশী করেই জানি। তাদের আনুগত্যে ও নিয়ন্ত্র-ণাধীনে আমরা এক পুরুষ বসবাস করছি। আপাত এই মিলমিলাপের অন্তরালে শুধুই ফেরেব আর ধোকাবাজি। আমাদের এটাই দাবী যে, আপনি আমাদেরকে সৈয়দ বাদশাহ্র নিকট নিয়ে চলুন।

তাদের এবম্বিধ বক্তব্য শোনার পর মওলানা বললেন,—আমরা সবাই জানি—তারা এমনই যা তোমরা বলছো। এ ব্যাপারে সৈয়দ সাহেবের নিকট আমরা কিছুই বলতে পারবো না। তোমাদের যা কিছু বলার আরবাব বাহরাম খানের নিকট গিয়ে বলো। তিনি তোমাদেরকে সৈয়দ সাহেবের নিকট নিয়ে যাবেন এবং তোমাদের পক্ষে যা কিছু ভালো বুঝবেন তাও তিনি বলবেন। কেননা তিনি তোমাদেরই দেশের লোক আর তোমাদের এবং দুররানীদের সম্পর্কে তিনি ভালো ওয়াকিফহালও আছেন।

তারা এ প্রস্তাব পসন্দ করলো এবং আরবাব বাহরাম খানের নিকটে গিয়ে উপস্থিত হলো। তিনি তাদের সমাদরের সাথে গ্রহণ করলেন এবং সান্ত্বনা প্রদান করলেন। তিনি তাদের বললেন যে, তোমরা গিয়ে নিজেদের কায়-কারবার করোগে,—সন্ধ্যায় আসবে; সে সময় আমি সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর নিকট নিয়ে যাবো এবং তোমাদের পক্ষ হয়ে প্রয়োজনীয় ওকালতীও করবো।

কিছু বিলম্বের পর সৈন্যবাহিনীর বিশিষ্ট কান্দাহারী এবং সিম্মার বড় বড় খান নেতৃবৃন্দ আরবাব বাহরাম খানের নিকট এসে উপস্থিত হয়। তারা নিজেদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও বিপদের কথা ব্যক্ত করে এবং দুররানীদের জুলুম-নির্যাতন ও বাড়াবাড়ির বিষয়ে বর্ণনা করে। সঙ্গে সঙ্গে এ খাহেশও ব্যক্ত করে যেন তাদের সকল বক্তব্য ও দরখাস্ত সৈয়দ সাহেবের খেদমতে পেশ করা হয়। আরবাব বাহরাম খান তাদের সান্ত্বনা দেন যে, তিনি সৈয়দ সাহেবের খিদমতে তাদের মুখপাত্র হিসেবে পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করবেন।

এশার সালাত আদায়ের পর আরবাব বাহরাম খান আপন ভ্রাতা আরবাব জুম'আ খানসহ সৈয়দ সাহেবের খেদমতে গিয়ে উপস্থিত হন এবং বলেন, হযরত! কিছু কথা আপনার একান্ত সান্নিধ্যে আমরা আরয করতে চাই। একথা শোনামাত্রই সেখানে উপস্থিত লোকজন উঠে চলে যায়। আরবাব বাহরাম খান শহরবাসীদের পক্ষ থেকে যে সমস্ত প্রতিনিধি এসেছিলো তাদের বক্তব্য হুবহু পেশ করলেন,—তাদের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করলেন এবং বললেন, "শহরবাসী বলছে যে,—দুররানীরা যখন নতুন ভাবে এ শহরের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণভার ফিরে পাবে তখন আমাদের উপর নবতর উপায়ে জুলুম-নির্যাতন শুরু করবে। এ জন্যেই তা করবে যে, যারা সৈয়দ বাদশাহর আগমনে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উৎসব প্রকাশ করেছিলো—তারা এর প্রতিটি বিন্দু সম্পর্কে খবর পেয়েছে। তারা আপনার চলে যাবার পরক্ষণেই আমাদের উপর গায়ের ঝাল ঝাড়বে। আমাদের ধ্বংস ও উচ্ছেদের ব্যাপারে চেষ্টার কোন ত্রুটিই তারা করবে না। শহরবাসীদের কেউই এতে রাযী নয় যে, সৈয়দ বাদশাহ্ পেশোয়ার তাদের সোপর্দ করে এখান থেকে প্রত্যাবর্তন করবেন। যদি সৈয়দ বাদশাহ্র সৈন্যবাহিনীর খরচ এবং এখানকার ব্যয় নির্বাহের জন্য দু'চার লাখ টাকারও দরকার হয় তবে আমরা তারও ব্যবস্থা করতে রাযী আছি। এ ছাড়াও আর যা কিছু বলবেন তাতে বিন্দু মাত্রও আমাদের আপত্তি থাকবে না।

"শহরবাসী ছাড়া ফতেহ খান পাঞ্জেতারী এবং ইসমা'ঈল খান ব্যতিরেকেও সিম্মার সকল নেতৃস্থানীয় খান এবং সৈন্যবাহিনীর অমূক অমুক কান্দাহারীও আমার কাছে এসেছিলো। তারাও দুররানীদের অবিশ্বস্ততা, ওয়াদাভঙ্গ এবং নিজেদের ধ্বংস, ঘরবাড়ী বিরান তদুপরি নানা রূপ বেইযযতির কথা খোলাখুলি বলেছে। এও বলেছে যে, তারা কিছুতেই এতে রাযী নয় যে, সৈয়দ বাদশাহ্ তাদের সাথে সন্ধি-সমঝোতা স্থাপন করবেন এবং পেশোয়ার তাদের হাতে উঠিয়ে দেবেন। তারা সবাই আমাকে বলেছে যেন আমি তাদের পক্ষ থেকে উকীল স্বরূপ সকল কথাই সৈয়দ বাদশাহ্র দরবারে গোচরীভূত করি। আমি তাদের নিকট স্বীকার করেছিলাম,—তাদের পক্ষ থেকে আমি নিশ্চয়ই তা পেশ করবো।

"তাদের সবার কথা মনে রেখে আমার নগণ্য অভিমত এই যে, যদি পেশোয়ার আপনি কাউকে দিতে মনস্থই করেন তবে তা আমাকেই দিন।

আমিও আপনার এক নগণ্য খাদিম আর এখানকারই বাসিন্দা। এখানকার রাস্তা-ঘাট ও প্রথা-পদ্ধতি সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত আছি। প্রজা সাধারণও আমার প্রতি সন্তুষ্ট। যদি এ রাজত্ব আপনি আমাকে সোপর্দ করে বিদায় নিয়েও যান তবে আমিই দুররানীদের সঙ্গে বোঝাপড়া করবো। এখন আপনি আমাকে যা বলবেন আমি তাদেরকে সে জবাবই দেবো।"

আরবাব বাহরাম খানের সব কথাবার্তা শোনার পর অনেকক্ষণ নিশ্চুপ থেকে হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) বললেন,—"আল্লাহ্ তোমাকে পুরস্কৃত করুন! তুমি অনেকখানি করেছো যে, সমস্ত লোকের হাল-হকিকত ও মন-মানসিকতা সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেছো। সৈন্যবাহিনীর যে সমস্ত ভাই এবং শহরের যে সমস্ত নাগরিক দুররানীদের গাদ্দারী ও টাল-বাহানার বর্ণনা দিয়েছে তারা সত্য কথাই বলেছে। আমার পরওয়ারদিগার আমার সামনে তাদের যে হাল-হকিকতের প্রকাশ ঘটিয়েছেন---তা যদি সে সমস্ত ভাই জানতে পারতো তবে আল্লাহ্ই জানেন তারা কি করতো। কিন্তু তোমরা সবাই খুব ভালো জানো যে, আমরা ভারতবর্ষ থেকে ঘর-বাড়ী পরিত্যাগ করে এবং আত্মীয়-বান্ধবদের থেকে মুখ ফিরিয়ে শুধুমাত্র এজন্যেই এসেছি যে, তারা সেই কাজ করবে যার ভেতর আল্লাহ্ রাব্বু'ল-'আলামীনের রিযামন্দী ও সন্তুষ্টি লাভ হবে। সৃষ্টির খুশী-অখুশীর সঙ্গে আমাদের কোনরূপ সম্পর্ক নেই। খুশী হলেই বা তারা আমাকে কি বানিয়ে দেবে আর অখুশী হলেই বা তারা আমার কি ক্ষতি করবে? নাদান-মূর্খেরা মনে করে যে, এরা রাজত্ব করবার জন্য এবং দুনিয়া লাভের জন্য এখানে এসেছে। এটা তাদের ভুল ধারণা, এখনও তারা দীন ইসলাম সম্পর্কে অবহিত নয়।

"আর সিম্মার যে সমস্ত খান ভাই তাদের জুলুম ও বাড়াবাড়ি সম্পর্কে অভিযোগ করেছে, নিজেদের বেইযযতি ও ঘর-বাড়ী বিরান হওয়ার কাহিনী বর্ণনা করছে--এসবই সত্য। সে সব এভাবে ধরে নাও যে, চিরদিনই কাফির, আল্লাহদ্রোহী এবং মুনাফিকেরা মুসলমানদের উপর বিভিন্ন ধরনের বাড়াবাড়ি ও চক্রান্ত করে আসছে। কিন্তু যে মুহূর্তে আল্লাহ্‌র রিযামন্দীর কাজ মুকাবিলায় এসে যায় ঠিক সে মুহূর্তেই সকলে হিংসা-বিদ্বেষ ও পারস্পরিক শত্রুতাকে নিজের দেহ-মন থেকে দূর করে দেয়,--তা মুখেও আনে না এবং তাদের সাথে সেরকম ব্যবহারই করে যার ভেতর আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি নিহিত; তার নির্দেশ মান্য করা হবে যদিও নিজ প্রবৃত্তি এবং যুগের গতিধারা

তার বিরোধীও হয়। মুসলমানী, দীনদারী ও আল্লাহ্-পরস্তী এরই নাম, তা না হলে এটাই প্রবৃত্তি-পূজা এবং দুনিয়াদারী।

"যে সব কান্দাহারী ভাই অভিযোগ করছে যে, তাদের একজন ভাইকে তারা শহীদ করেছে,—এটা তো অভিযোগের বিষয় নয় বরং তা শুকরিয়া পাবার যোগ্য। কেননা সে সব ভাই পরম আরাধ্যের নিকট পৌঁছে গেছে। তাঁরা সেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিলের জন্যই এ সব তকলীফ ও মুসীবত সহ্য করে এত দূর-দরাজ পথ অতিক্রম করে 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্'র জন্য এসেছিলো যে, তারা আল্লাহ্ রাব্বু'ল-'আলামীনের রাস্তায় নিজের জীবন ব্যয় করবে। অতএব তাঁরা তাই করেছে আর জিহাদের গোটা কায়-কারবারটাই তো শুধু রাব্বু'ল-'আলামীনের রিযামন্দীর---প্রবৃত্তি পূজা ও পক্ষপাতিত্বের নয়, যেমন দুনিয়াদার ও বস্তুগত স্বার্থবাদীরা করে থাকে।

"আর যে সব শহরবাসী এটা ভয় করছে যে, আমরা সৈয়দ সাহেবের আগমনে আনন্দোৎসব করেছিলাম—এজন্যে তারা আমাদের ধ্বংস করে দেবে---সেটা তাদের অজ্ঞতা, মূর্খতা ও অবুঝ মনের ফসল। তারা এটা জানে না যে, যদি প্রজাবৃন্দকে ধ্বংস ও বরবাদই করা হয় তবে তাদের কার শাসক ও রঈস বলা হবে? প্রজাকুল সাধারণত দুর্বল ও অসহায় হয়ে থাকে, যারাই তাদের উপর বিজয়ী হয় তারা তাদেরই বাধ্য ও অনুগত হয়ে যায়--আর যারা অনুগত হবে না তারা থাকবেই বা কোথায়? প্রজাকুলকে কেউই নষ্ট ও বরবাদ করতে চায় না—তা তাদের শাসকই হোক কিংবা দুশমন অথবা শক্তিশালী অপর কোন প্রতিপক্ষ ; বরং উভয়ই এদের কারণেই আরাম ও প্রশান্তি পেয়ে থাকে এবং তাদের প্রজাদের কারণেই তারা সর্দার কথিত হয়ে থাকে। প্রজাকুল ফলবান বাগানের ন্যায়; মালিক কিংবা অ-মালিক সবাই বাগানের ফল থেকে ফায়দা হাসিল করে,—কেউই ফলবান বৃক্ষ ধ্বংস করে না। আর যে বাগান কেটে ফেলবে-সে বাগবান হিসাবে কিভাবে কথিত হবে আর এতে ফায়দাই বা কি? অতএব খান ভাই! তুমি তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বুঝিয়ে দেবে যে, আল্লাহ্র ফযলে কেউই তোমাদের ধ্বংস ও অনিষ্ট করবে না।

"যারা বলছে,—যদি প্রয়োজন হয় তবে শহরের ব্যবস্থাপনা এবং সৈন্য-বাহিনীর খরচ ও ব্যয় নির্বাহের জন্য আমরা দু'চার লাখ টাকার বন্দোবস্ত করে দেবো—তবুও এখানকার হুকূমত যেন দুররানীদের হাতে তুলে না দেওয়া

হয়,—কিন্তু তা আমাদের মঞ্জুর নয় এবং তা এজন্যে যে, আমাদের আল্লাহ্পাকের রিযামন্দী দরকার যাতে তিনি রাযী হবেন। তিনি রাযী হন এমন কাজই আমরা করবো আর এতে যদি সমগ্র দুনিয়াই নাখোশ হয় তবুও কুছ পরোয়া নেই। যদি একই স্থানে সাতটি দেশের ধন-দৌলত ও রাজত্ব রাব্বু'ল-'আলামীনের রিযামন্দীর বিরুদ্ধে পাওয়া যায় তবে সে ধন-দৌলত ও রাজত্বের কোনই মূল্য নেই। পক্ষান্তরে অন্য এক জায়গায় যদি আল্লাহ্ তা'আলার রিযামন্দী মাফিক সাতটি দেশের ধন-দৌলত ও রাজত্ব চলেও যায় তবুও তার রিযামন্দীই সব কিছু।

"এসব আলাপ-আলোচনার সংক্ষিপ্তসার এটাই যে, সুলতান মুহাম্মদ খান নিজের ভুল-ত্রুটি ও অন্যায়-অপরাধের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়েছে এবং শরী'আতের সমস্ত হুকুম-আহকাম সে কবুল করে নিয়েছে। সে বলেছে যে, এখন থেকে পুনরায় বিদ্রোহ, দুষ্ট-বুদ্ধিজনিত কার্যকলাপ এবং আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূল (স·)-এর ইচ্ছার খেলাফ ও পরিপন্থী কোন কাজ করবে না,---তার অন্যায় ও অপরাধ আল্লাহ্র ওয়াস্তে মাফ করা হোক। যদি একথা মুনাফিকী ও দাগাবাজীস্বরূপ বলে থাকে তবে তা সেই জানে আর জানে তার আল্লাহ্। শরী'আতের হুকুম তো প্রকাশ্য স্বীকৃতির উপর, কারোর অন্তর-মানসে বিরাজিত অবস্থার উপর নয়। অন্তরের খবর তো একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন। আমরা তো তার সাথে সেরূপ ব্যবহারই করবো যা প্রকাশ্যে শরী'আতের হুকুম, চাই কি এতে কেউ রাযী হোক অথবা নারায, এটা কেউ মানুক আর নাই মানুক। এখন আমাদের কেউ যদি তার ওজর-আপত্তি নাই মানে তবে এর উপর আমাদের নিকট কি আর কোন দলীল প্রমাণ আছে? যদি কোন দীনদার আল্লাহ্-পরস্ত 'আলিম কোন শর'য়ী দলীল দ্বারা আমাকে বুঝিয়ে দেয় যে, আমি ভুলের উপর আছি তবে তা আমি মেনে নেবো। এছাড়া অন্য কোন কিছুই আমি কখনো মানব না। কেননা আমরা তো একমাত্র আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (স·)-এরই তাবেদার---আর কারো তাবেদার নই।

যে মুহূর্তে হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এই বক্তব্য পেশ করেছিলেন আশ্চর্যজনকভাবে সে সময় আল্লাহ্ আ'আলার রহমত নাযিল হচ্ছিলো। কাঁদতে কাঁদতে আরবা বাহরাম খান এবং জুম'আ খানের হিচকি আরম্ভ হয়েছিলো। তারা ছিলো নিশ্চুপ,—ছিলো বেহুশ ও আত্মভোলা অবস্থায়। তিনি (সৈয়দ সাহেব) চুপ করবার পর আরবাব বাহরাম খান আরয করলো—আপনি যা কিছুই বলছেন তা অত্যন্ত সত্য এবং সঠিক। আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূল (স·)-এর রিযামন্দীর বিষয় সম্পর্কে আপনিই

ওয়াকিফহাল। আমরা যারা প্রবৃত্তি-পূজারী ও দুনিয়াদার তারা এ সম্পর্কে কিইবা খবর রাখি। আমরা এই মুহূর্তে জানলাম যে, দীন ইসলাম এরই নাম এবং এরই নাম আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসূলের অনুসরণ ও আনুগত্য। এর পরিপন্থী যে সমস্ত ধ্যান-ধারণা আমার অন্তরে ছিলো এখন তা থেকে আমি আপনার সামনে তওবাহ করছি এবং নতুনভাবে আপনার হাতের উপর বায়‘আত করছি ও আপনার দু‘আ প্রার্থনা করছি।

ভোরবেলা আরবাব বাহরাম খান সিম্মার সর্দারবৃন্দ এবং কান্দাহারী-দের সামনে সৈয়দ সাহেবের রাত্রিকালীন পেশকৃত বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করলে তারা সবাই নিশ্চুপ ও শান্ত হয়ে যায়। কিন্তু শহরবাসীরা শান্ত হলো না। তারা বললো,—সৈয়দ বাদশাহ তো একজন ওলী ও আল্লাহ্ওয়ালা ব্যক্তি। তিনি যা কিছু বলেছেন---সঠিক এবং যথাযথই বলেছেন। আমাদের উদ্দেশ্য তো এটাই ছিলো যে, যদি সৈয়দ বাদশাহ্ এখানকার রাষ্ট্রপরিচালক হতেন তাহলে আমরা প্রজাবৃন্দ আরামে ও নিরাপদে দিন গুজরান করতাম,— নাজাত পেতাম জোর-জুলুমের হাত থেকে। কিন্তু সৈয়দ বাদশাহ্ নিজের কাজ-কারবারের মালিক-মোখতার; তিনি যা কিছু ভালো মনে করেন তাই করেন। আমরা এক্ষেত্রে লাচার।

শহরের শেঠ ও ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ যখন দেখলো যে, আরবাব বাহরাম খানের দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য কার্যকরী হলো না--তখন তারা নিজেদের পর-স্পরের মধ্যে সলা-পরামর্শ করে একজন শেঠকে সৈয়দ সাহেবের নিকট পাঠায়। তার নাম ছিলো বুদ্ধরাম। সে কয়েকটি টুকরীতে কিছু মেওয়া ও নগদ অর্থ সৈয়দ সাহেবের দরবারে নযরানাস্বরূপ পেশ করে এবং আরয জানায়,—সে একান্ত সান্নিধ্যে কিছু বলতে চায়। সৈয়দ সাহেব সেখানে উপস্থিত একমাত্র পাহারাদার ব্যতিরেকে আর সবাইকে বিদায় দিয়ে দেন। অতঃপর শেঠ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন, ---কি বলছো --বলো।

শেঠজী বললো,—"শহরে এ খবর অত্যন্ত মশহুর যে, সৈয়দ বাদশাহ্ সুলতান মুহাম্মদ খানকে এখানকার রাজ্য ও হুকূমত পুনরায় দিয়ে দিচ্ছেন। এ খবর শুনে এখানকার সকল শেঠ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত। আমরা তো এখানে সৈয়দ বাদশাহ্র তশরীফ রাখাতে অত্যন্ত খুশী হয়েছিলাম এই ভেবে যে, আল্লাহ্ পাক এমন একজন ন্যায় বিচারক, আল্লাহ্-ভীরু এবং গরীব প্রজাপালককে এখানকার রাষ্ট্র পরিচালক হিসাবে পাঠিয়েছেন। এখন থেকে

আমরা আরামে, নিশ্চিন্তে ও নিরুপদ্রবে দিন গুজরান করবো। কিন্তু বর্তমানে এ খবর অত্যন্ত মশহুর হয়ে পড়েছে যে, আপনি হুকূমত পুনরায় তাদেরকেই সোপর্দ করতে যাচ্ছেন। এ কারণে সমস্ত শেঠ নিজেদের পক্ষ থেকে আমাকে তাদের প্রতিনিধি হিসাবে পাঠিয়েছেন,--যেভাবে সৈয়দ বাদশাহ্ এখানে থাকতে রাযী হন--সেভাবেই তাঁকে রাযী করতে এবং এখান থেকে যেতে না দিতে।

"অতএব আপনার পবিত্র খিদমতে আমাদের আরয এই যে, কি জন্য আপনি এদেশ সুলতান মুহাম্মদ খানকে দিয়ে দিচ্ছেন? যদি এর কারণ এই হয় যে, আপনার কাছে সৈন্যবাহিনী প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম,--এজন্য আরও সৈন্যবাহিনী দরকার,---দরকার গোটা ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করবার জন্য অঢেল অর্থ-সম্পদের, তাহলে আপনি তার জন্য চিন্তা করবেন না। আপনার বলতে মাত্র দেরী,---আর আমি তো আপনার খিদমতেই উপস্থিত আছি,--যে পরিমাণ অর্থের কথা আপনি বলবেন---ঘণ্টা দু'য়েকের ভেতর এ জায়গা'তেই টাকা-কড়ির স্তূপীকৃত রাশি বানিয়ে ফেলবো। আর এদিকে নওকর-লশকর রাখতে আপনি শুরু করে দিন,---যত সংখ্যক প্রয়োজন নওকর রাখুন। আর এর বাইরে অন্যবিধ কোন কারণ থাকলে তা একমাত্র আপনিই জানেন।"

সৈয়দ সাহেব তার এসব কথা শোনার পর তাকে অনেক শাবাশ দিলেন এবং বললেন,---"তুমি অত্যন্ত যোগ্য এবং দেশ ও দশের একজন কল্যাণকামী ব্যক্তি। তোমার পক্ষে যা করার ছিলো তা করার ব্যাপারে তুমি কোন গাফলতি কিংবা শৈথিল্যের অবকাশ রাখো নি। একাজের জন্য তোমার প্রতি আমি অত্যন্ত খুশী।" তিনি আরও বললেন,---"শেঠজী! তুমি একথা অত্যন্ত সুন্দর বলেছো। যে শাসক রাজত্ব করার অভিপ্রায় পোষণ করে তুমি তার কাজ করেছো। কিন্তু আমি তেমন কোন শাসক নই। আমি আমার মহান স্রষ্টার তাবেদার গোলাম মাত্র। যা কিছুই আমরা করে থাকি না কেন তাঁরই মর্জি মাফিক করে থাকি। এ ব্যাপারে কার কতটুকু লাভ হলো কিংবা কার কতটুকু ক্ষতি হলো আমরা তা দেখি না। আমার মহান প্রভুর নির্দেশ যে, কোন ব্যক্তি যতই অপরাধী হোক না কেন-যখন সে তার অন্যায়-অপরাধ থেকে তওবাহ্ করবে, নিজের ভুলত্রুটি স্বীকার করবে তখন তার ভুলত্রুটি ও অন্যায় মাফ করা উচিত এবং এক্ষেত্রে তার ওজর-আপত্তি কবুল করা বাধ্যতামূলক। যদি সে দাগাবাজী ও প্রতারণা-মূলকভাবে তওবাহ করে তবে সে ব্যাপারে আমাদের কিছুই করবার নেই; এ ব্যাপার সেই জানে আর আল্লাহ্ পাকই জানেন। তার ধন-সম্পদ ও

দেশ যবরদস্তিমূলকভাবে নেওয়া ঠিক নয়। আমাদের এবং সুলতান মুহাম্মদ খানের ভেতরকার ব্যাপারটাও এ ধরনেরই। আর তুমি যে সৈন্যবাহিনীর ও ধন-সম্পদের কথা উল্লেখ করলে—তাতে আমাদের আশংকা কিংবা উদ্বেগের কোনই কারণ নেই। যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের থেকে কোন কাজ করিয়ে নিতে চান তবে তিনিই উত্তম থেকে উত্তমতরো সৈন্যবাহিনী, মাল-মাত্তা ও ধনভাণ্ডার চাইবা ব্যতিরেকেই দিয়ে দেবেন।

"আর তোমরা যারা এই ভয় করছো যে, সে তোমাদের ধ্বংস ও বরবাদ করে দেবে,—এটা তোমাদের ধারণামাত্র। এজন্যে তোমাদের ভয়-ভীতি কিংবা আশংকার কোনরূপ কারণ নেই। কোন রাজ্যেই শাসকদের এরূপ নিয়ম নেই যে, শেঠ ও বণিকদের ধ্বংস করবে। কেননা তাদের কারণেই তার দেশ ও তার শহর আবাদ হয়ে থাকে এবং তাদের বড়-বড় কাজ শেঠ ও বণিকদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়ে থাকে। যদি তারা শেঠ ও বণিকদের ধ্বংস ও বরবাদ করে দেয় তবে তাদেরই ক্ষতি হবে; তাহলে শেঠ ও বণিককুল তাদের রাজত্বে বসবাস করবে না।"

সৈয়দ সাহেবের এ জওয়াব শুনে বুদ্ধরাম নিশ্চুপ হয়ে যায়। এরপর সে বলতে থাকে,—আপনি সত্যিকার অর্থেই একজন আল্লাহ্ওয়ালা লোক। আপনার কথার জওয়াব কে দিতে পারে? যা কিছু আপনি বলেছেন তা সঠিক এবং যথার্থ। এরপর সে হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর নিকট থেকে বিদায় নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেলো।[১]

---

১. পেশোয়ারের অধিকার পরিত্যাগ এবং সুলতান মুহাম্মদ খানের মতো বিরোধী দুশমনের হাতে পুনরায় তা তুলে দেবার সমস্যাটা এমন একটি জটিল বিষয় যার সমাধানে এই জিহাদী আন্দোলনের ইতিহাসকার এবং তার সমর্থক ও সহযোগীদের সামনে বেশ সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। কোন কোন লেখক এরূপ ধারণা ব্যক্ত করেছেন যে, সম্ভবত এরূপ একটি সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাড়াহুড়োর ভেতর নেয়া হয়েছিলো এবং এতে ভদ্রতা ও মানবতার দিকটির উপর বেশী প্রাধান্য দেয়া হয়েছিলো যা সৈয়দ সাহেবের অস্থিমজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট ছিলো এবং এ ব্যাপারে তাঁকে তার সর্বোচ্চ পূর্ব-পুরুষ সায়্যিদুনা হযরত 'আলী (ক)-এর কর্মপদ্ধতি ও পদানুসরণ করতেই দেখতে পাওয়া যায় যাঁর রাষ্ট্রনীতির বুনিয়াদই ছিলো ধর্মীয় মূলনীতি ও আখলাকের উপর। এ সমস্যার ক্ষেত্রে হযরত আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর রাজনীতির অনুসরণ করাই তাঁর উচিত ছিলো। বস্তুত হযরত মু'আবিয়া (রা)-র নীতির বুনিয়াদ ছিলো রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

কিন্তু যাদের সে যমানার অবস্থা, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার উপর গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছিলো —তাদের মতে সৈয়দ সাহেব এক্ষেত্রে যে উত্তম ও বাস্তব রাজনৈতিক প্রজ্ঞার

সুলতান মুহাম্মদ খান হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর সঙ্গে মিলিত হবার আগ্রহ প্রকাশ করে। এতে সৈন্যবাহিনীর বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গ এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, প্রথমে মওলানা মুহাম্মদ ইসমা'ঈল

পরিচয় দিয়েছিলেন তার উপর সমালোচনার উলংগ খড়গ নিক্ষেপ করা এত সহজ নয়। এ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কল্পনা-প্রবণতার চাইতে তাঁকে অধিক বাস্তববাদী মানুষ হিসাবে দৃষ্টিগোচর হয়। যদি তিনি বিপরীত পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন অর্থাৎ পেশোয়ারকে নিজ অধিকারে রাখতেন অথবা নিজের ঘনিষ্ঠ ও অনুগত কাউকে এর শাসনভার অর্পণ করতেন তবু পরিণতি এর চেয়ে ভিন্নতর কিছুই হতো না এবং এটাই শেষাবধি সামনে গিয়ে ধরা দিত। কয়েকজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী—যারা আফগান (পাঠান)-এর উপজাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে গভীরভাবে অবহিত এবং সে যুগের পরিবর্তন ও ঘটনাবলী সম্পর্কে খুবই ভালো রকম অবগত এবং যারা একটা দীর্ঘ সময় আফগানিস্তানে অতিবাহিত করেছেন—তারা আমার নিকট বর্ণণা করেছেন যে, সৈয়দ সাহেবের এই পরিকল্পনা অথবা ফয়সালা প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত দূরদর্শিতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। আর এটা এজন্য যে, পায়েন্দা খানের বংশধর যারা আফগানিস্তান এবং সীমান্তের শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ছিলো,—যাদের ভেতর প্রচণ্ড উপজাতীয় রক্তের টান লক্ষ্য করা যায়—তারা কোন অবস্থাতেই সুলতান মুহাম্মদ খান ব্যতীত (শাসকগোষ্ঠির ভেতরকার বয়ঃজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, নেতা এবং দীর্ঘদিন যাবত পেশোয়ারের শাসনকর্তাও বটেন) অন্য কোন ব্যক্তিকে শাসক হিসাবে মেনে নিতে রাজী হতো না। হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)ও এ বাস্তবতাকে মেনে নিয়েছিলেন এবং বিশুদ্ধচিত্ততা, নিঃস্বার্থপরতা, ক্ষমতা ও পদের প্রতি নির্লিপ্ততার সাথে সাথে বাস্তব রাজনৈতিক প্রজ্ঞার শুরুতেই তিনি এরূপ জটিল ও নাযুক অবস্থায় উত্তম থেকে উত্তমতরো সম্ভাব্য রাস্তা অবলম্বন করেছিলেন। এমনিতেই গায়েবের 'ইল্ম তো একমাত্র আল্লাহ্র এবং একজন মুজতাহিদ-এর অভিমতের ভেতর শুদ্ধ-অশুদ্ধ উভয়টার সম্ভাবনা বিদ্যমান। আমার মতে প্রখ্যাত মিসরীয় লেখক ও পর্যালোচক 'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ হযরত 'আলী (ক)-এর দৃষ্টিভঙ্গীর উপর আলোকপাত করতে গিয়ে যা কিছু লিখেছেন এক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে। তিনি বলেছেন ঃ

"নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থার সকল দিক ও খুটিনাটি বিষয় সামনে রেখে—তদুপরি বিভিন্ন পরিণতি ও ফলাফল মেনে নেয়ার পর যে কথা সামনে আসে তা এই যে, হযরত 'আলী (ক)-কে যে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিলো তাছাড়া অপর কোন রাস্তাই সুরক্ষিত ও নিরাপদ ছিলো না—বরং তার সাফল্যের সম্ভাবনা ছিলো সুদূরপরাহত এবং বিপদের আশংকা ছিলো অনেক বেশী।" তিনি অন্য জায়গায় বলেন,—"সে যুগের কিংবা তার পরবর্তী যুগের সমালোচকের মনে কি কখনো এ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, তারা নিজের কাছেই জিজ্ঞাসা করেন, হযরত 'আলী (রা) সে সময় যা করেছিলেন, এছাড়াও তাঁর পক্ষে অন্য কিছু করা কি সম্ভব ছিলো?" ('আবক'ারিয়াত 'আলী ইবন আবী তালিব)

সাহেব সর্দারের সঙ্গে মুলাকাত করবেন। দু'তিনটি সাক্ষাতেই তার মতিগতি বোঝা যাবে। এরপরই শুধু সৈয়দ সাহেব মুলাকাত করলে ক্ষতির কোন আশংকা থাকবে না। অতএব প্রথম দফা হাজারখানি নামক স্থানে (যা (আরবাব ফয়যুল্লাহ খানের গ্রাম এবং পেশোয়ার থেকে এক মাইল কিংবা তার থেকে কিছু দক্ষিণ দিকে অবস্থিত) মওলানা মুহাম্মদ ইসমা'ঈল চল্লিশ-পঞ্চাশ জন সঙ্গী-সাথীসহ গমন করেন এবং অনুরূপসংখ্যক লোকজন সমভিব্যাহারে পেশোয়ারের সর্দারমণ্ডলী এসে উপস্থিত হয়। উভয় পক্ষই ছিলো অত্যন্ত সতর্ক। সুলতান মুহাম্মদ খান সম্পর্কে জনশ্রুতি ছিলো যে, তার নিয়ত খারাপ,--সে ধোঁকাবাজি করছে। সে এই সাক্ষাতে মওলানা ইসমা'ঈলের সামনে তওবাহ করে এবং মওলানাও সৈয়দ সাহেবের নায়েব (সহকারী) হিসাবে তার থেকে বায়'আত নেন। দ্বিতীয় বারেও উক্ত স্থানেই মুলাকাত হয়। সুলতান মুহাম্মদ খান এবার সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে এবং সৈয়দ সাহেব তা অনুমোদন করেন।

পেশোয়ারে সৈয়দ সাহেব এবং মুজাহিদ বাহিনীর তিনটি জুম'আ পড়বার সুযোগ ঘটে। মওলবী মাজহার আলী 'আজীমাবাদী জিহাদ বিষয়ক বক্তৃতা করেন। তিনি লোকদেরকে ফারসী এবং উর্দূ উভয় ভাষাতেই বোঝা-তেন। তাঁর ওয়াজের প্রভাব এতই মর্মস্পর্শী হতো যে, অধিকাংশ লোকই জার জার হয়ে কাঁদতো।

হাফিজ 'আবদুল লতীফ সাহেব বলেন,—আল্লাহ্ তা'আলা হযরত বেরে-লভী (র)-কে এদেশে বিজয়ীর মহিমা দান করেছেন। সুতরাং শহর এবং শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য মসলা-মাসায়েল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ এবং 'আমরু বি'ল-মা'রূফ ও নাহী 'আনি'ল-মুনকার' তথা সৎকার্যে আদেশ ও অসৎকার্য থেকে নিষেধ অত্যন্ত জরুরী। সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) তাকে বললেন যে, আপনি ও খিযির খান কান্দাহারী নিজস্ব সঙ্গী-সাথী সমভিব্যাহারে শহরের সমস্ত মসজিদ পরিভ্রমণ করুন এবং সালাত আদায়ের জন্য জনগণকে তাকীদ করুন। যাকেই সালাত পরিত্যাগ করতে দেখবেন তাকেই শাস্তি ও সতর্ক করে দেবার অনুমতি দেওয়া হলো। অন্যায় ও দুষ্কৃতিকারীরা আপনার ভয়ে ও জিজ্ঞাসাবাদের কারণে সন্ত্রস্ত হয়ে আত্ম-গোপন করবে।

হাফিজ সাহেব খিযির খান ও অন্যান্য সঙ্গীদের নিয়ে শহর পরিভ্রমণ করেন এবং সালাত ও জামা'আতে বাধ্যতামূলকভাবে শরীক হবার তাকীদ করেন। এর প্রভাব বেশ ভালো হয়।

আরবাব ফয়যুল্লাহ্ খান সুলতান মুহাম্মদ খানের নিকট থেকে পুনরায় পয়গাম নিয়ে আসেন যে, মুলাকাতের জন্যে দিন নির্দিষ্ট করা হোক। সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) তাঁর উপদেষ্টা ও পরামর্শদাতাদের নিয়ে বসেন এবং বলেন,—সর্দার সাহেব মুলাকাতের দিন চেয়ে পাঠিয়েছে। অতএব কতজন লোকসহ কোথায় ও কখন ডেকে পাঠাবো? এরূপর পরামর্শদাতা ও উপদেষ্টাবৃন্দ সৈন্যবাহিনীর সকল অফিসার এবং সিম্মার সকল খানকে সমবেত করে পরামর্শ করেন। শেষ পর্যন্ত মওলানা মুহাম্মদ ইসমা'ঈলের প্রস্তাবের উপর সবাই একমত হন যে, তাকে বলে দেওয়া হোক যেন সে তার সকল অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীসহ আসে আর এদিকে আমরাও আমাদের গোটা বাহিনীসহ আসছি। এরপর উভয়েরই ইখতিয়ার থাকবে যত সংখ্যক জনমণ্ডলী তারা চাইবে আসবে এবং আমরাও যত সংখ্যক চাইবো যাবো। এতে আমাদের পক্ষ থেকে যেমন তাদের সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকবে না—ঠিক তেমনি তাদেরও কোনরূপ সন্দেহ সৃষ্টি হবে না আমাদের সম্পর্কে। প্রত্যেকেই জানবে যে, এখন যাই কিছু হোক আমাদের সামনে হবে।

মুলাকাতের জন্য সুলতান মুহাম্মদ খানের পক্ষ থেকে হাযারখানির ময়দানের নাম প্রস্তাব করা হয়। একদিন পূর্বে মওলানা মুহাম্মদ ইসমা'ঈল ও আরবাব বাহরাম খান দুশো-আড়াই শো লোকসহ ময়দানে গমন করেন এবং বেশ ভালোভাবে ঘুরে ফিরে তার উঁচু-নীচু সব দেখেন। আগের দিন সৈয়দ সাহেব সমগ্র বাহিনীতে বলে পাঠান যে, সকল ভাই যেন নিজেদের সাজ-সামানসহ প্রস্তুত থাকে। কাল ভোরে আমাদের সঙ্গে সুলতান মুহাম্মদ খানের সাথে মুলাকাতের উদ্দেশ্যে যেতে হবে। সিম্মার খানদেরও সংবাদ দেওয়া হয়। আরবাব জুম'আ খানকে তিনি ডেকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বলেন যে, কাল ভোরে আমরা সুলতান মুহাম্মদ খানের সঙ্গে মুলাকাত করতে যাবো। তুমি পূর্বের ন্যায়ই লোকজন নিয়ে খুবই হুশিয়ারী ও খবরদারীর সঙ্গে শহরের নিরাপত্তা ঠিক রাখবে।

---

১. মনজুরু'স-সা'দাহ, পৃষ্ঠা ৯১৭-১৮।

পরদিন বাহিনীর গাযীরা (যুদ্ধবিজয়ী বীর) অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় একত্রিত হয়ে ময়দানে হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর অপেক্ষা করতে থাকে। তিনি কিছুক্ষণ পর ওযূ করত পোশাক পরিধান করেন এবং অস্ত্র-সজ্জিত হয়ে বাসভবন থেকে বের হন। সরাইখানার মসজিদে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করেন। হযরত বেরেলভী (র)-এর দেখাদেখি আরো বহু লোক দু'রাকাত নফল পড়েন। অতঃপর নগ্ন মাথায় দাঁড়িয়ে অত্যন্ত আহাজারীর সঙ্গে দো'আ করেন। উপস্থিত সমগ্র জনমণ্ডলীর উপর তখন এক ধরনের আবেগোন্মত্ত অবস্থা বিরাজ করছিলো।

দু'আর পর হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) ঘোড়ায় আরোহণ করে রওনা হন। পেশোয়ারের বাইরে গোরস্তানের (যেখান আখুন্দ দারিও-য়াজাহ বাবার মাযার) নিকটে কিছু দূর আগে অগ্রসর হয়ে গোরস্তানকে পেছনে রেখে দাঁড়িয়ে যান। সমগ্র বাহিনী কাতারবন্দী হয়। পেশোয়ারের হাজার হাজার বিশিষ্ট ব্যক্তি এ দৃশ্য দেখতে এসেছিলো। লোকজনের আধিক্যে ময়দানে মানুষ ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো না। সেখানেই তিনি জোহরের সালাত আদায় করেন। সুলতান মুহাম্মদ খান তার সমস্ত লোকজন সহকারে এসে হাযারখানি মৌজা পিছনে ফেলে দাঁড়িয়ে পড়ে।

কিছুক্ষণ পর উক্ত সর্দার পনের-বিশজন লোক সহকারে সেদিকে যায় আর এদিকে অনুরূপ সংখ্যক গাযী সহকারে সৈয়দ সাহেবও অগ্রসর হন। সর্দার পূর্বেই সে ময়দানে বিছানা বিছিয়ে রেখেছিলো। তার এবং সৈয়দ সাহেবের মধ্যখানে শ'-সোয়াশো' কদমের ব্যবধান থাকতে সকল সঙ্গী-সাথীদের থামিয়ে দেওয়া হয়। তারা সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। এদিকে সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) ঘোড়া থেকে অবতরণ করে শুধু মওলানা মুহাম্মদ ইসমা'ঈল এবং আরবাব বাহরাম খানকে সঙ্গে নিয়ে পদব্রজে অগ্রসর হন। সে সময় শ্রদ্ধেয় মওলানার কোমরে শুধুমাত্র তলোয়ার ঝোলানো ছিলো। আরবাব বাহরাম খানের কোমরে তলোয়ার ও হাতে ছিলো বাঘনখ। হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-কে দেখে উক্ত সর্দারও তার সঙ্গীদের থামিয়ে দেয়। সেও সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে। অতঃপর শুধুমাত্র আরবাব ফয়যুল্লাহ্ খান ও মুরাদ আলী নামে এক ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে আসে এবং সৈয়দ সাহেবকে সালাম জানিয়ে মিলিত হয়ে মুসাফাহা করে। অতঃপর

মওলানা ইসমা'ঈল ও আরবাব বাহরাম খানের সঙ্গে মুলাকাত করে। সৈয়দ সাহেব ও মওলানা ইসমা'ঈল বিছানায় বসে পড়েন এবং আরবাব বাহরাম খান সৈয়দ সাহেবের পেছনে দাঁড়িয়ে যান; আর ওদিকে আরবাব ফয়যুল্লাহ্ খান ও মুরাদ আলী সুলতান মুহাম্মদ খানের পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়।

রজব খান পেটি এবং সল্লু খান ফেকীত যেমন ছিলো শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী—লম্বা তাগড়া জোয়ান—তেমনি ছিলো ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন অত্যন্ত চাতুর্যের অধিকারী। মওলানা মুহাম্মদ ইসমা'ঈল আগেই তাদের বলে রেখেছিলেন যে, তোমরা দু'জন সাক্ষাতের সময় সৈয়দ সাহেবের একান্ত কাছে গিয়ে পৌঁছুবে। সৈয়দ সাহেব যদি তোমাদের নিষেধও করেন তবুও তা মানবে না। এরপর তারা দু'জন সৈয়দ সাহেব হাত দিয়ে নিষেধ করা সত্ত্বেও বিশ-পঁচিশ কদম ব্যবধানে দাঁড়িয়ে পড়ে। যে ময়দানে সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) বসে আলাপ করছিলেন সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে জোয়ারের একটি ক্ষেত ছিলো—যেখানে সুলতান মুহাম্মদ খান প্রথম থেকেই চল্লিশ-পঞ্চাশজন অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত সিপাহী বসিয়ে রেখেছিলো, মুজাহিদ বাহিনী তা জানতো না। আকস্মিকভাবেই তাদের একটি দল ক্ষেতের নিকট গেলে দেখতে পায় যে, কিছু সংখ্যক লোক ক্ষেতের ভেতর লুকিয়ে বসে আছে। গাযীদের এ ক্ষুদ্র দলটি তাদের পেছনে গিয়ে দাঁড়ায় যেন—কোনরূপ দূরভিসন্ধি কিংবা ধোঁকাবাজি ও প্রতারণার উদ্দেশ্য ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বোঝাপড়া করে ফেলা যায়। কিন্তু আল্লাহ্র ফযলে এ ধরনের কোন কিছু ঘটেনি।

সৈয়দ সাহেব কাবুল থেকে মায়ারের যুদ্ধ পর্যন্ত যুদ্ধের সমস্ত ঘটনা, সুলতান মুহাম্মদ খান ও তার ভাইদের বায়'আত করা, জিহাদ ও সাহচর্যের অঙ্গীকার ও চুক্তি, অতঃপর বারবার তা ভঙ্গ করা,—অধিকন্তু উল্টো আক্রমণ ও কাফিরদের সঙ্গে মিলিত হবার সকল বিষয় ও অবস্থা বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, এখনও পর্যন্ত জানতে পারলাম না তোমাদের ভাই-এর এবং তোমার বিদ্রোহের কারণটা কি?

সুলতান মুহাম্মদ খান অত্যন্ত ওজরখাহী করতে শুরু করে এবং নিজের ভুল-ভ্রান্তির কথা স্বীকার করে বলে,—আমাদের অবাধ্যতা ও বিদ্রোহের কারণ,—এই বলে সে জড়ানো মোচড়ানো একটি কাগজ নিজের চিঠির লেফাফা থেকে বের করে সৈয়দ সাহেবের সামনে রেখে দেয়, তিনি তা

খুলে একটি বড় আকারের শরী'আতী হুকুমনামা দেখতে পান। তার উপর ভারতবর্ষের বহু 'উলামা ও পীরযাদাদের সীল মোহরাংকিত দস্তখত ছিলো। চিঠিটির সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু ছিলো এই যে, তোমাদের খান ও সর্দারমণ্ডলীকে লিখিতভাবে জানানো হচ্ছে যে, সৈয়দ আহমদ নামক এক ব্যক্তি ভারতবর্ষের কতিপয় 'আলিমকে নিজের মতাবলম্বী করে বেশ কিছু লোকজনসহ তোমাদের দেশে গেছে। সে বাহ্যত 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'র দাবী করে থাকে,— অথচ এটা তার স্পষ্টতই ধোকা ও প্রতারণা। সে আমাদের এবং তোমাদের দীন ও মযহাবের বিরোধী। তারা একটি নতুন দীন ও মযহাবের উদ্ভব ঘটিয়েছে। সে কোন ওলী ও বুযুর্গকে মানে না। সবাইকে খারাপ ও মন্দ বলে। ইংরেজরা তাকে তোমাদের দেশের হাল-হকিকত জানার জন্য পাঠিয়েছে। তোমরা কোনক্রমেই তার ওয়াজ-নসীহতের জালে আটকা পড়বে না। আশ্চর্য নয় একদিন সে তোমাদের দেশই হয়তো ছিনিয়ে নিতে চাইবে। যেভাবেই তোমাদের পক্ষে সম্ভব হোক তোমরা তাকে ধ্বংস করে দাও আর নিজেদের দেশে স্থান দেবে না। এ ব্যাপারে যদি অলসতা ও গাফলতির আশ্রয় নাও তবে ভবিষ্যতে পস্তাবে; লজ্জা ও অনুশোচনা ছাড়া আর কিছুই হাতে আসবে না।

হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) এ লেখা পড়ে হতবাক হয়ে যান। তিনি উক্ত সর্দারকে লক্ষ্য করে বলেন যে, ভারতবর্ষে দুনিয়াদার—'উলামা ও এক শ্রেণীর তথাকথিত সূফী পীর পূজায় লিপ্ত এবং একেই তারা নিজেদের দীন-ধর্ম ও সংবিধান বলে মনে করে। এরা হারাম-হালাল সম্পর্কে কোন ভেদরেখা মানে না আর এটাই তাদের উপজীবিকার মাধ্যম। আমাদের ওয়াজ-নসীহতের দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা সেখানকার লাখলাখ মানুষকে হিদায়াত নসীব করেছেন। তারা খাঁটি তৌহিদবাদী এবং সুন্নতের পূর্ণ অনুসারী হয়েছে। এর ফলে ঐ সমস্ত দুনিয়া-পূজারী 'আলিম ও পীরদের শিরক্ ও বিদ'আতের বাজার ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সত্যানুসারী ও সত্যাশ্রয়ীদের দৃষ্টিতে, তাদের মর্যাদা খর্ব হয়েছে। যখন তারা কুলিয়ে উঠতে পারে নি তখন আমাদের উপর কল্পিত অভিযোগ ও মিথ্যা অপবাদ চাপিয়েছে এবং তা আপনার পর্যন্ত পাঠিয়েছে। কিন্তু আপনার থেকে একটা মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে যে, এ সম্পর্কে এখন পর্যন্ত আপনি আমাদের অবহিত করেন নি। এর দ্বারা আপনি আপনার দীন-দুনিয়া উভয়টিরই ক্ষতি সাধন করেছেন। অন্যথায় এই সন্দেহ ও সংশয় আপনার মন থেকে আমরা

প্রথমেই মুছে দিতে পারতাম। অবশ্য এর ভেতরও আল্লাহ্‌র কোন মঙ্গল নিশ্চয়ই নিহিত রয়েছে।

এরপর তিনি চিঠির লেফাফা গুছিয়ে মওলানা মুহাম্মদ ইসমা'ঈলকে সোর্পদ করে বলেন,—এটা খুবই হেফাজতের সঙ্গে রাখবেন। এটা সবাইকে দেখাবেনও না—এ সম্পর্কে কাউকে কিছু বলবেনও না এবং তা এজন্য যে, সৈন্যবাহিনীতে গাযীদের অবস্থা এমনিই যে, মিথ্যা অভিযোগ ও অপবাদ শোনার পর যদি যে সব অমঙ্গলাকাঙ্খীদের সম্পর্কে বদদো'আ করে তবে আশ্চর্য নয় যে দ্রুততার সাথে তাদের ক্ষতির কারণ ঘটে যাবে। আমরা মনে-প্রাণে চাই যে, যদি কখনো আল্লাহ্‌ পাক তাদের সঙ্গে আমাদের মিলিত করেন তখনও আমরা তাদের সঙ্গে অত্যন্ত ভালো ও সদ্ব্যবহার ছাড়া আর কিছুই করবো না।

অতঃপর পুনরায় তিনি সর্দারকে লক্ষ্য করে বললেন--খান ভাই! আপনি যে আরবাব ফয়যুল্লাহ্‌ খানের মুখ দিয়ে চল্লিশ হাজার টাকা আমাদের ব্যয় নির্বাহের জন্য দেবার ওয়াদা করেছিলেন--তার জন্য চিন্তা করবেন না। আমরা আপনাকে ক্ষমা করেছি। কেননা মহান পরওয়ারদিগারের দরবারে কোন জিনিসেরই কমতি নেই। আপনি আমাদের ভাই। আপনার নিকট থেকে কোন প্রকার জরিমানা কিংবা ক্ষতিপূরণ নেওয়া আমাদের ইচ্ছা নয়,—একথা বলেই তিনি উঠে পড়লেন। সর্দারও নিজের বাহিনীতে ফিরে গেলে উভয় বাহিনী নিজ নিজ স্থানে এসে যায়।

সুলতান মুহাম্মদ খান দরখাস্ত পেশ করে যে, সৈয়দ সাহেব পেশোয়ারে একজন কাযী যেন নিযুক্ত করে দেন যিনি পবিত্র শরা'র বিধান মুতাবিক লোকজনের মধ্যে বিচার-নিষ্পত্তি করবেন এবং জুমু'আর দিনে ওয়াজ-নসীহত করবেন। আমরা তার অনুসরণ করবো--আর তার ওয়াজ-নসীহত দ্বারা লোকজনও হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে। সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) মওলবী মাজহার আলী সাহেব 'আজীমাবাদীর নাম প্রস্তাব করেন এবং দশ-বারোজন গাযীও তার সঙ্গে পাঠিয়ে দেন। তিনি এদের হাত আরবাব ফয়যুল্লাহ্‌ খানের হাতে দিয়ে বললেন, তোমাদের সর্দারের খাহেশ মুতাবিক আমরা এদেরকে কাযী হিসাবে রেখে গেলাম। এরপর তিনি পাঞ্জেতারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান।

হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) পাঞ্জেতারের নিকটবর্তী হলে তাঁর আগমনের খুশীতে শত শত নারী-পুরুষ প্রশংসামূলক চারটি কবিতা-

শ্লোক আবৃত্তি করতে করতে তবলা বাজিয়ে আনন্দিত ও উৎফুল্ল চিত্তে নিজ নিজ দল ও সংগঠনসহ এগিয়ে আসে এবং সৈয়দ সাহেবের নিকট পুরস্কার দাবী করে। তিনি প্রত্যেককেই পুরস্কৃত করেন,—খুশী করেন সকলকেই। তাঁর আগমনের খুশীতে উল্লাস প্রকাশ করে পাঞ্জেতারের মুজাহিদীন এগার-বার তোপধ্বনি করে।

সওয়ারী থেকে অবতরণ করে সর্বপ্রথম তিনি মসজিদে তশরীফ রাখেন এবং দু'রাকা'ত নফল আদায় করেন। অধিকাংশ মুজাহিদীনও দু'রাকা'ত নফল পড়েন। অতঃপর তিনি খালি মাথায় বহুক্ষণ ধরে উচ্চস্বরে দু'আ করেন আর সবাই তাঁর সঙ্গে আমীন—আমীন বলতে থাকে। দু'আর পর সবাইকে অনুমতি দেন যেন তারা নিজ নিজ ডেরায় চলে যায় এবং তিনি নিজেও নিজের ডেরায় গিয়ে ওঠেন।

জুম'আর দিনে মওলবী আহমদ উল্লাহ্ সাহেব মীরাঠী খুতবাহ্ দেন এবং সৈয়দ সাহেব ইমামতি করেন। সালাত সম্পন্ন হবার পর তিনি ওয়াজ করেন এবং বলেন,—"ভাইয়েরা আমার! আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অপার করুণা ও অনুগ্রহে তোমাদের অল্পসংখ্যক লোককে বিরাট বিরাট সৈন্যবাহি-নীর উপর জয়যুক্ত ও সাফল্যমণ্ডিত করেছেন এবং তোমাদের ধারণাও গেছে বেড়ে যে, আমরা লড়াইয়ে জিতেছি। এরূপ ধারণার ভিত্তিতে অহংকারী ও গর্বিত হয়ো না। আল্লাহ্কে ভয় করো, তওবাহ্ ও ইস্তেগফার করো। সকল গর্ব ও অহংকার সব কিছুর মালিক সেই মহান সত্তা আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর জন্যই সংরক্ষিত।"

ঐশী কানুন ও মনগড়া পথা-পদ্ধতি

সে যুগে মুসলমানদের সমাজ জীবনকে (বিশেষ করে আরব বহির্ভূত দেশগুলোতে যেগুলো ইসলামের কেন্দ্রভূমি থেকে বহু দূরে অবস্থিত ছিলো) জাহিলী ও অন্ধ যুগের বহু আচার-অভ্যাস, স্থানীয় প্রথা-পদ্ধতি এবং নিজে-দের মনগড়া আইন-কানূন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিলো। মুসলমানেরা বহু কাল থেকেই এতে এমনভাবেই লিপ্ত ও জড়িত হয়ে গিয়েছিলো—যেভাবে একজন ঈমানদার মুসলিম শরী'আতে ইলাহী, ধর্মের স্পষ্ট বিধানাবলী এবং ইসলামী শরী'আতের ফরয ও ওয়াজিব বিষয়গুলোতে কার্যকর ভাবে লিপ্ত থাকে। এসব জাহেলী অভ্যাস ও প্রথাপদ্ধতি তথা রসম-রেও-

য়াজ পুরুষানুক্রমে অত্যন্ত সতকর্তা ও হেফাজতের সঙ্গে স্থানান্তরিত করা হতো। এর পরিণতি এই হয়েছিলো যে, এসব তাদের বংশগত, গোত্রীয় ও উপজাতীয় জীবন-যিন্দেগীর অংশে পরিণত হয়ে যায় এবং তা তাদের অস্থি-মজ্জায় মিশে যায় আর এদেরকে এসব থেকে বিচ্যুত হতে উৎসাহিত করা এরূপ কঠিন ছিলো যেমন কঠিন সদ্যজাত শিশু সন্তানকে দুধ থেকে বিচ্যুত করা কিংবা ধামিক ব্যক্তিকে ধর্ম থেকে ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিচ্যুত করা।

এ সমস্ত গোত্রীয় ও উপজাতীয় আচার-অভ্যাস ও রসম-রেওয়াজ তাদের কাছে মযহাবী ও আসমানী শরী'আতের বিধানের মতই ধর্মীয় পবিত্রতা, মর্যাদা, মহব্বত, সম্ভ্রম এবং মযহাবী জোশ-জযবার স্থান লাভ করেছিলো। তারা এর জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত ছিলো। এ ব্যাপারে কোনরূপ নির্লিপ্ততা, অলসতা ও গাফলতী প্রদর্শন কিংবা কোনরূপ অস্বীকৃতি অথবা প্রত্যাখ্যান করা ছিলো লজ্জা, অপমান ও নিন্দার বিষয় এবং সেসব নিয়মিত পালন করাকে তারা নিজেদের জন্য গর্বের বিষয় বলে মনে করতো।

এ ভাবেই শরী'আতের মুকাবিলায় আরও একটি শরী'আত এবং ফিকহ্-এর সমপর্যায়ের আরও একটি নতুন ফিকহ্ ও নতুন মানবীয় বিধান অস্তিত্ব লাভ করে। এই 'মনগড়া শরী'আত' চিরন্তন ও অবিনশ্বর শরী'আতে ইলাহীর সঙ্গে পুরো শক্তি-সামর্থ্য ও দলীল-প্রমাণসহ ছিলো দ্বন্দমুখর এবং সাধারণ মানুষের মন-মগজে তার বিশেষ জায়গা ও জীবনে নিজ প্রভাবাধীন এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছিলো এবং ঐ সমস্ত বিশেষ পরিভাষার আশ্রয় নিচ্ছিলো যা 'উলামায়ে দীনের মধ্যে প্রচলিত ছিলো। এর মধ্যেও ছিলো ফরয-ওয়াজিবের মতোই বাধ্যতামূলক বিষয়,—ছিলো সুন্নত ও মুস্তাহাবও। যারা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতো, তাদেরকে ইসলামের গণ্ডী থেকে খারিজ এবং বিদ'আতী বলে মনে করা হতো। আর যারা এসব বিধি-বিধান পালনের ক্ষেত্রে থাকতো সদা-তৎপর--তাদেরই সত্যিকার ও সুদৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী সাচ্চা দীনদার মুসলমান হিসাবে অভিহিত করা হতো। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

أَمْ لَهُمْ شُرَكَؤُا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّٰهُ -

"ইহাদিগের কি এমন কতগুলি দেবতা আছে যাহারা ইহাদিগের জন্য বিধান দিয়াছে এমন দীনের যাহার অনুমতি আল্লাহ্ দেন নাই?"

(সূরা শূরা : আয়াত ২১)

অন্যত্র বলা হয়েছে :

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ -

"এইগুলি কতকগুলি নাম মাত্র যাহা তোমাদিগের পূর্বপুরুষগণ ও তোমরা রাখিয়াছ এবং ইহার সমর্থনে আল্লাহ্ কোন দলীল প্রেরণ করেন নাই (সূরা নাজ্ম, ২৩ আয়াত)।"

যেহেতু এসব রীতিনীতি ও আইন-কানুন মানুষের কামনা-বাসনা এবং আমীর-ওমরা ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সৃষ্ট, মানুষের অভিজ্ঞতা, বুদ্ধিবৃত্তি ও বিজ্ঞজনদের কষ্ট-কল্পনার ফসল ছিলো আর এর বিরাট অংশই ছিলো বুদ্ধি-বৃত্তিক খামখেয়ালী, অপক্ক ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-দর্শনের সমষ্টি এবং এর উৎসমূল মহাবিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্ট কানুন-বিধান ছিলো না, সেহেতু তাতে জাহিলিয়াতের অবশিষ্ট প্রভাব প্রবণতা, প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনা, অদূরদর্শিতা, জোর-যবরদস্তি, সীমালংঘন, ঘাটতি ও বাড়তি, অপব্যয় ও অপচয়ের আশ্চর্যজনক এক সংমিশ্রণ ছিলো। এসব রীতিনীতি বহু বংশের ও গোত্রের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে পদদলিত করেছিলো। অনুরূপ-ভাবে এসব সমাজ জীবনের জন্যও ছিলো একটি স্থায়ী ও চিরন্তন মুসীবত, বৃহত্তম গযব এবং ভাগ্য বঞ্চনার উৎসমূল। এসবের কারণে ধর্ম তার সরলতা ও অনাড়ম্বরতার একটা বড় অংশ খুইয়েছিলো। জীবন তার স্বাধীনতার নিয়ামত ও আত্মশক্তির সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে গিয়েছিলো। বিশেষ করে যে সোসাইটি এই সব মনগড়া আইন-কানুন ও রসম-রেওয়াজকে বাধ্যতামূলক হিসাবে গ্রহণ করেছিলো সেখানে এগুলো জীবনের জন্য একটি বোঝা অথবা পায়ের বেড়ী ও গলার শেকলে পরিণত হয়েছিলো। সমাজ জীবন একটি সংকীর্ণ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন কয়েদখানায় গুমরে গুমরে জীবন অতিবাহিত করছিলো এবং নিজের আনীত মুসীবতের ভেতর বন্দী হয়ে পড়েছিলো। আল্লাহ্ রাব্বু'ল-'আলামীন যে বস্তুকে হারাম ঘোষণা করেছিলেন তারা তাকে হালাল বানিয়ে নিয়েছিলো, আর—তিনি যা হালাল বানিয়ে-ছিলেন তাকে বানিয়েছিলো হারাম। আল্লাহ্ যার ভেতর সৃষ্টি করে

রেখেছিলেন প্রশস্ততা তারা তাতে সৃষ্টি করেছিলো সংকীর্ণতা। আল্লাহ্ পাকের এ বাণী তাদের ক্ষেত্রে কত সুন্দরভাবেই না প্রযোজ্য ঃ

الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم -

"তুমি কি উহাদিগকে দেখ নাই যাহারা আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বদলে উহা অস্বীকার করে এবং উহারা উহাদিগের সম্প্রদায়কে নামাইয়া আনে ধ্বংসের ক্ষেত্রে জাহান্নামে।" (সূরা ইবরাহীম. ২৮ আয়াত)

আফগান উপজাতি যাদের ভেতর বিশুদ্ধ দীন এবং সহীহ্ সুন্নাতে রসূল (স·)-এর দাওয়াত বিভিন্ন ঐতিহাসিক কার্যকারণের ভিত্তিতে সব সময় কমযোর থাকে তারা এক্ষেত্রে অত্যন্ত এগিয়ে ছিলো। তাদের অধিকাংশ 'উলামায়ে কেরাম শেষ যুগে শুধু ফিকাহর কেতাবাদি এবং পুরনো বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করে বসে থাকে। এই আফগান উপজাতি বহু প্রাচীন কাল থেকেই এ সমস্ত অভ্যাস, রসম-রেওয়াজ এবং বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা আচার-আচরণ ও প্রথা-পদ্ধতি অত্যন্ত শক্তভাবে মেনে চলতো। এসব থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হওয়াকেও তারা ধর্মহীনতা ও বিদ'আতের সমার্থক মনে করতো।[১]

তার উপর যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে 'উলামায়ে কিরাম ও পীর-বুযুর্গদের তোষামোদপ্রিয়তা, দেখেও না দেখার ভাণ করার ন্যায় চরম ঔদাসীন্য প্রদর্শনের পরিণতিতে জাহিলী যুগের বহু আচার-অভ্যাস তাদের ভেতর বদ্ধমূল হয়ে যায়। তাতে করে এসব কুসংস্কার আর অন্যায় বলেই মনে করা হয় না। এসব খারাপ আচার-অভ্যাসের মধ্যে একটি ছিলো,—আপন মর্যাদা মুতাবিক ছেলেদের নিকট থেকে নগদ অর্থ নেয়া ব্যতিরেকে কেউই আপন কন্যাদের বিয়ে-শাদী দিতো না। কেউ ছেলেদের নিকট থেকে একশো টাকা,—কেউ চার-পাঁচ শো—আবার কেউবা হাজার টাকাও নিতো। গরীব

১। এই উপজাতিগুলো সালাতে তাশাহহুদ পাঠকালে অঙ্গুলী উঠানোকে শক্ত রকমের বিদ'আত এবং ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ মনে করতো। এমনকি কতক অত্যুৎসাহী ও রগচটা প্রকৃতির লোক মুসল্লীর আঙ্গুল ভেঙে ফেলতেও দ্বিধা করতো না। এর ভিত্তি ছিলো যে, কোন কোন ফেকাহ্র কেতাব...যেমন 'খোলাসাতু'ল-কায়দানীতে' তাশাহ্হুদের সময় আঙুল উঠানোকে হারাম অভিহিত করা হয়েছে।

ছেলেরা টাকার সন্ধানে হয়রান হয়ে যেতো—আর অন্য দিকে তাদের বেচারী মেয়েরা থাকতো আইবুড়ো হয়ে; বিয়ের নিদারুণ ও ব্যর্থ আশা-অপেক্ষায় কাটতো তাদের দিন। ফলে কোন কোন মেয়ে পাপ ও অন্যান্য অবৈধ কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়তো। তাদের স্বাস্থ্যও যেত-খারাপ হয়ে। আর এভাবেই তাদের দুঃসহ ও কষ্টকর জীবন হতো অতিবাহিত।

এ ধরনের মহিলা ও বস্তির মেয়েরা একবার কোন এক সুযোগে হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর নিকট অভিযোগ জানায় এবং ন্যায় বিচার প্রার্থনা করে। তারা সৈয়দ সাহেবেরই একজন আফগান মুরীদ আহমদ খান কাকার মাধ্যমে এই পয়গাম পাঠায় যে, সৈয়দ বাদশাহ্‌কে আল্লাহ্ পাক আমাদের ইমাম বানিয়েছেন; তিনি যেন আমাদের কন্যাদের জন্য কোন ব্যবস্থা করেন এবং আমাদেরকে এই 'আযাব থেকে নাজাত দেন।

সৈয়দ সাহেব বললেন, তোমরা যারা আমার ইমামত এবং হিদায়াত লাভের জন্য বায়'আত হয়েছো, শরী'আতের সকল হুকুম-আহকাম কবুল করেছো এবং সকল প্রকার গোনাহ্ ও খারাপ কাজ থেকে তওবাহ্ করেছো, —তারা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রসূলের হুকুম জেনেই এই গোনাহ্ থেকে তওবাহ্ করো। শরী'আতের বিধান অনুযায়ী সন্তুষ্টচিত্তে নিজেদের মেয়েদেরকে নিজেদের জ্ঞাতিগোষ্ঠির মধ্যে বিয়ে দিয়ে দাও,—আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (স)-এর নির্দেশের পরিপন্থী টাকা-কড়ি নেবার নিয়মপদ্ধতি পরিত্যাগ করো। যদি তা না করো তবে এটা নিজেদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে।

হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর এ বক্তৃতা শোনার পর সবাই জাহিলিয়াতের এই কুপ্রথা থেকে ইচ্ছা ও অনিচ্ছায় তওবাহ্ করে এবং নিজেদের কন্যা-সন্তানদের বিয়ে দিতে স্বীকার করে।

শর'য়ী হুকূমতের কর্মচারী ও গাযীদের পাইকারী হত্যা

পেশোয়ার প্রত্যর্পণের অল্প কিছু দিন পর পাঞ্জেতার ছাড়া এবং পেশোয়ার ও সিম্মার বিভিন্ন এলাকায় ইসলামী শর'য়ী হুকূমতের যে সব কর্মচারী, তহসীলদার, কাযী, পুলিশ মোতায়েন ছিলো—তাদের সবাইকে একই সময়ে কতল করে ফেলার একটি পরিকল্পনা তৈরী করা হয়। অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে এ সিদ্ধান্তও নেওয়া হয় যে, যাতে করে এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাত থেকে যা আজ কয়েক বছর যাবত চলে আসছে—চিরদিনের মতো নাজাত

লাভ করা যাবে। এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাত কেন ছিলো এবং এইরূপ একটি চরম ও জঘন্য পদক্ষেপ নেয়ার প্রকৃত ও অভ্যন্তরীণ কার্যকারণ কি ছিলো— সবাইকে এই লোমহর্ষক ঘটনাবলীর বিস্তারিত পাঠ করার আগেই তা জেনে নেওয়া দরকার।

এ দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সর্বাপেক্ষা বড় কারণ ছিলো সর্দার, নেতৃস্থানীয় খান ও মোল্লাদের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য হাসিল ও স্বার্থসিদ্ধি : সৈয়দ সাহেব এবং মুজাহিদ বাহিনীর আগমনের পূর্বে এ সমস্ত দল ও গ্রুপ নিজেদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য চরিতার্থকরণ এবং স্বার্থ হাসিলের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলো। এরা সবাই এই সব এলাকায় নিজেদের মনগড়া ও মর্জিমাফিক কাজ-কর্ম করতো। এলাকায় যা কিছু উৎপন্ন হ'তো—তা থেকে এ সকল দল ও গ্রুপ নিজ নিজ অংশ এবং দেশের রেওয়াজ মাফিক ফায়দা লুটতো। উপরে বলা হয়েছে যে, পেশোয়ারের সর্দারমণ্ডলী প্রজাদের ক্ষেতের উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক খাদ্য-শস্য নিজেদের জন্য উসুল করতো এবং বিভিন্ন ব্যবস্থাপনাজাত ব্যয় প্রজা-বর্গের যিম্মায় ছিলো। এভাবে উৎপন্নজাত দ্রব্যাদির দুই-তৃতীয়াংশ তাদের গোলাঘরে চলে যেতো। সৈয়দ সাহেবের আগমন, ইমামতের বায়'আত ও শর'য়ী ব্যবস্থাপনা চালু ও প্রতিষ্ঠার ফলে তাদের কায়েমকৃত এ সমস্ত অধিকার ও স্বার্থে আঘাত লাগে। তারা পরিষ্কার দেখতে পায় যে, যদি এ ব্যবস্থা চলতে থাকে এবং শর'য়ী ব্যবস্থাপনার জড়-মূল আরও সুদৃঢ় হবার সুযোগ পায় তবে তাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব এবং ফায়দা লুটবার অবাধ সুযোগ চিরতরে নিঃশেষ হয়ে যাবে। এতে তারা তাদের অবাধ অধিকার থেকে যা তারা এতদিন ধরে ভোগ করে আসছিলো—বঞ্চিত হয়ে পড়বে। সীমান্তের গোটা রাজ্যটাই এই সব দুনিয়াদার শাসক ও ধর্মীয় নেতাদের কর্তৃত্বাধীনে বন্টিত হয়েছিলো। যে অন্তর ও মন-মানসে ঈমানের মিষ্টতা, আল্লাহ্‌র ভয় এবং পারলৌকিক চিন্তা-ভাবনা ভালোভাবে অনুপ্রবিষ্ট ও বদ্ধমূল না হয়েছে বরং তার পরিবর্তে ধন-সম্পদ প্রীতি, ক্ষমতা ও পদের প্রতি প্রবল মোহ, আয়েশী ও বিলাসী জীবন এবং আত্মপূজার অভ্যাস বদ্ধ-মূল হয়ে গেছে—সে কোন ধর্মীয় কল্যাণ, সামগ্রিক মঙ্গল, পারলৌকিক সুখ-সুবিধা ও সাফল্যের জন্য নিজের ব্যক্তিগত লাভালাভ ও সুযোগ-সুবিধার মায়া কাটাতে পারে না। সে তো নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের হেফাজত এবং কার্যসিদ্ধির জন্য ধর্মের বিরাট থেকে বিরাটতর ক্ষতিও করতে পারে; অত্যন্ত সহজভাবেই কুরবানীও দিতে পারে জনগণের তথা দেশ ও জাতির সামগ্রিক

কল্যাণকেও এবং সঙ্গীন থেকে সঙ্গীনতরো—কঠিন থেকে কঠিনতর পাপেও সে লিপ্ত হতে পারে। মুসলমানদের ইতিহাস ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ও স্বার্থ সিদ্ধির এ ধরনের দুঃখজনক ঘটনাবলী দ্বারা কলংকিত হয়েছে। তাতে একবার নয়, দু'বার নয়—বারবার সামগ্রিক কল্যাণ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে এবং সুদৃঢ় ও মযবুত সাম্রাজ্য কতিপয় ব্যক্তি ও গোষ্ঠি-বিশেষের ব্যক্তিগত স্বার্থ-সিদ্ধি, নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য ফায়দা লাভের হীন মানসিকতার যুপকাষ্ঠে বলি হয়েছে।

এর দ্বিতীয় কারণ এই যে, সীমান্ত প্রদেশে এবং আফগানিস্তানে ইসলামী শরী'আতের বিলকুল সমপর্যায়ের অপর একটি আইন-কানুন শতব্দীর পর শতাব্দী থেকে প্রচলিত ছিলো। এর উপর সীমান্তবাসী আসমানী শরী'আতের ন্যায় 'আমলকারী ও সুদৃঢ় ছিলো। তারা কোন অবস্থাতেই এ সব পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলোনা। এই 'আফগান আইন"-এ তাদের উদ্দেশ্য ও স্বার্থ-সিদ্ধির পথ অত্যন্ত নিরাপদ ও সুরক্ষিত ছিলো। বাপ-দাদার প্রথা ও শতাব্দী কাল ধরে প্রচলিত রসম-রেওয়াজের উপরও আমল করে আসা হচ্ছিলো। 'ইনায়েতুল্লাহ খান সোয়াতী এবং তার সঙ্গী-সাথীদের সাফ সাফ স্বীকৃতি ও ঘোষণা (যা তারা মওলানা ইসমা'ঈল শহীদের জবাবে বলেছিলো) এর উজ্জ্বল প্রমাণ। তারা বলেছিলো ঃ

"তোমরা কিতাব ও সুন্নত থেকে চুল পরিমাণও বেশী 'আমল করো না। কুরআন ও সুন্নাহ এবং 'উলামা সবাই তোমাদের পক্ষে। কিন্তু কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত সে সব বিধান আমাদের উপর অত্যন্ত কঠিন ও বোঝা স্বরূপ। এজন্য আমরা তোমাদের ইয়াজুড়ে যেতে দেবার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছি আর আমরা কোনক্রমেই তোমাদের যেতে দেব না। এ ব্যাপারে যুদ্ধের জন্যও আমরা প্রস্তুত। অতঃপর ফয়সালা যা হবার হবে। যদি আমরা বিজয়ী হই তবে আমরা আফগান প্রথার উপর কায়েম থাকবো; আর যদি তোমরা জয়যুক্ত হও এবং তোমাদের প্রবেশাধিকার এ দেশে ঘটে তবে আমরা এদেশ ছেড়ে কোন কাফির রাজত্বে চলে যাবো যাতে সেখানে শান্তির সঙ্গে নিজেদের বাপ-দাদার তরীকার উপর আমল করতে পারি।"

'ইনায়েতুল্লাহ খান এবং তার সঙ্গী-সাথীদের এই ঘোষণা ও স্বীকৃতি শুধু সোয়াতের নয়, প্রকৃতপক্ষে তা ঐ গোটা এলাকার অধিকাংশের মন-মানসিকতা ও ধ্যান-ধারণার প্রতিনিধিত্ব করছে, যা ছিলো সে যুগের সাধারণ ব্যাপার।

এগুলোই ছিলো সে সব বুনিয়াদী কারণ, যা দেশত্যাগী ও বিদেশ-বিভূঁইয়ে আশ্রিত মুজাহিদ বাহিনীর বিরুদ্ধে এই ভয়াবহ ও বিদজনক পদক্ষেপ গ্রহণে শুধু উৎসাহিতই করেনি বরং সমগ্র শর'য়ী ব্যবস্থাপনা এবং ভবিষ্যতের ধর্মীয় আশা-আকাঙখা ও সকল সম্ভাবনাকে নস্যাৎ ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিতে উস্কানী দিয়েছিলো। বস্তুত বহু শতাব্দী পর সেদেশে এই ধর্মীয় প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছিলো। যে সব এলাকাবাসীকে মদীনার আনসারদের প্রতিনিধিত্ব করা উচিত ছিলো, পক্ষান্তরে তাদের থেকেই এমন হৃদয়হীনতা ও নির্মম কাঠিন্যতার প্রকাশ ঘটে যা কারবালা প্রান্তর ও (অনতিকাল পরেই মদীনা মুনাওয়ারা ও মক্কা মুয়াজ্জমায় সংঘটিত) হাররার ঘটনাবলীকে আরো একবার নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেয়। সম্ভবত এত সহজে তাদের নিজেদের এরূপ নির্মম হৃদয়হীন কাজের হিম্মত হতো না, কারণ, যাদের সঙ্গে বন্য পশুসুলভ ও বর্বরোচিত আচরণ করা হয়েছিলো তারা মুসলমান ছিলেন। ধর্মীয় 'আমল ও নির্দশনসমূহের পাবন্দীতে—অধিকন্তু 'ইবাদত-বন্দেগী ও তাকওয়া-পরহেযগারিতে খোলাখুলিভাবে আশপাশের সকলের মধ্যেই তারা বিশিষ্ট ও উল্লেখযোগ্য ছিলেন। কিন্তু পেশোয়ারের সর্দারমণ্ডলী ও তাদের দরবারী 'উলামা, অধিকন্তু পেশাদার ও প্রথা-পূজারী মোল্লারা এই জামা'ত এবং এর আমীর সম্পর্কে বিভ্রান্ত 'আকীদা-বিশ্বাস ও মুসলমানদের জান-মালের উপর জুলুম-বাড়াবাড়ি ইত্যাদির গুজব ছড়িয়ে রেখেছিলো। তারা এঁদের উপর বিভিন্ন ধরনের অপবাদ আরোপ করেছিলো এবং এসবের প্রচার ও প্রসারও ঘটিয়েছিলো। আর এসব মিলিয়ে এরূপ ন্যাক্কারজনক ও ঘৃণ্য কাজের জন্য প্রয়োজনীয় নৈতিক ও ধর্মীয় বৈধতার তারা উপকরণ যুগিয়েছিলো; যদিও সকল কার্যকলাপের পেছনে স্বার্থসিদ্ধি এবং ব্যক্তিগত ও প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনার পূরণই ছিলো একমাত্র ক্রিয়াশালী বস্তু। এ সব অপবাদও উক্ত মর্মান্তিক ঘটনার পেছনে কিছুটা ইন্ধন যুগিয়েছিলো। বিশেষ করে পেশোয়ার বিজয় এবং তা প্রত্যর্পণের পরই এসব ব্যাপার বেশীর ভাগ উস্কান হয়েছিলো।

মওলানা খায়ের উদ্দীন সাহেব শেরকোটি মুসলিম সৈন্যবাহিনীর একজন বিরাট তীক্ষ্ণধী, মেধাবী ও পর্যবেক্ষণ-জ্ঞানসম্পন্ন 'আলিম ছিলেন। তিনি এই ব্যাপক হত্যাকাণ্ডটি অত্যন্ত যুক্তি-নির্ভর উপায়ে ও বাস্তবোচিতভাবে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখেন। এর কারণ ও পেছনের ক্রিয়াশীল উপাদানগুলো তিনি তাঁর এক প্রবন্ধে সুন্দরভাবে বিবৃত করেছেন। মওলবী জা'ফর আলী

"মনজুরু'স-সা'দাহ" নামক গ্রন্থে উক্ত প্রবন্ধের সারাংশ উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন ঃ

"তকদীরে ইলাহী এবং শহীদবর্গের সৌভাগ্য ছাড়াও এ ঘটনার দু'টি বাহ্যিক কারণ জানা যায়।

"প্রথমত, উক্ত এলাকার লোকজন প্রাচীনকাল থেকেই অনুসরণ ও আনুগত্যে অভ্যস্ত নয়। যখন তাদেরকে অবহিত ও সতর্ক করে দেয়া হ'লো যে, আমীর এবং ইমামের আনুগত্য ধর্মের অপরিহার্য বিষয়গুলির অন্যতম তখন তারা এটাকে কবূল তো করে নেয়--কিন্তু এই আনুগত্যকে তারা কেবল সালাত, সিয়াম ও ওশরের ভেতর সীমাবদ্ধ মনে করতে থাকে। তাদের মতে এতটুকুতেই মাত্র আনুগত্য জরুরী ও অপরিহার্য ছিলো আর তাও মর্জি মাফিক,—যতটুকু মন চাইতো ওশর ইত্যাদি দিয়ে দিতো—চাই কি তা কমই হোক অথবা বেশী। যখন তাদের নিকট পুরোপুরি ওশরের দাবী করা হলো,—যুদ্ধে যোগদান না করার বিনিময়ে জরিমানা ও ক্ষতি পূরণ চাওয়া হলো,—অধিকন্তু মেয়েদের বিয়ে-শাদী এবং জামাতার নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করা ব্যতিরেকেই কন্যা বিদায় করে দেবার জন্য জরুরী তাকীদও দেয়া হলো—তখন তাদের মনে এটা অত্যন্ত কষ্টকর অনুভূত হয়। তারা এসব ব্যাপারকে বরদাশতের বাইরে এবং সাধ্যাতীত কষ্ট-তকলীফ বলে মনে করতে থাকে।

"দ্বিতীয়ত, এরই সাথে সাথে সেই দস্তখতযুক্ত চিঠি যা ভারতবর্ষের এবং সীমান্তের 'আলিমগণ তৈরী করেছিলো—পেশোয়ারের সর্দারদের প্রচেষ্টায় তা স্থানে স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। চারিদিকে এটাও অত্যন্ত মশহুর হয়ে পড়ে যে, এই দলটি যারা জিহাদের নামে এখানে এসেছে তারা দীন-ধর্মের বিরোধী এবং ওহাবী ফেরকার সাথে এরা সম্পর্ক রাখে। এর ফলে লোকজনের অন্তর-মানসে এদের সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। বাধ্য হয়ে তারা এদের আনুগত্য মেনে নেয়,—যেহেতু মুজাহিদ বাহিনীর শক্তি-সম্পদ ও শান-শওকত দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিলো আর তাদের কেউ পরাজিতও করতে পারছিলো না।

"তৃতীয়ত, মেয়েদের বিয়ে-শাদী সম্পর্কে হযরত আমীরু'ল-মু'মিনীনের তাকীদ আর এটা স্বয়ং মেয়েদের ফরিয়াদ ও দরখাস্তের ভিত্তিতেই ছিলো। তারা হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর নিকট পয়গাম পাঠিয়ে-

ছিলো যে, তাদের সঙ্গে ইনসাফ করা হোক। এরই ভিত্তিতে তিনি নির্দেশ জারী করেন—বিবাহিত যে সব মহিলার স্বামী বর্তমান আছে তিন দিনের ভেতর তাদেরকে স্বামীগৃহে প্রেরণ করা হোক। যে সমস্ত মেয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে কিন্তু স্বামী নেই,—এক মাসের ভেতরই তাদের শাদী দিয়ে স্বামীগৃহে বিদায় দিতে হবে। যে সমস্ত মেয়ের বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিলো তারাও—যাদের সাথে সম্পর্কিত হয়েছিলো—নিজেদের বিদায়ের দরখাস্ত পেশ করে। যেহেতু এলাকাবাসী শর'য়ী হুকুম-আহকাম কবূল করেছিলো সেজন্য তাদের পক্ষে তাল-বাহানা করা অথবা প্রমাণ কিংবা ছুতো খোঁজা যুক্তিসঙ্গত ছিলো না। নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে প্রচলিত রসম-রেওয়াজ ও আচার-অভ্যাস যা ছিলো শরী-'আতের খেলাফ—পরিত্যাগ করা সমীচীন ছিলো (এসব অসন্তোষ ও অভিযোগ স্থানীয় খানদের পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিলো)। অপর দিকে হিন্দু বেনিয়া, শিল্প-পতিরা ভারতবর্ষীয়দের হুকূমতের কারণে অত্যন্ত খুশী ছিলো। খানদের হুকূমত ছিলো জুলুম-নির্যাতনে ভরপুর। নিজেদের মেয়েদের বিয়ে-শাদীতে প্রজাদের নিকট থেকে তারা বিরাট অংকের টাকা উশুল করতো। এ সবও শর'য়ী বিধান জারী করার ফলে মওকুফ হয়ে যায়। এজন্যেই তারা সবাই হযরত আমীরু'ল-মু'মিনীন-এর এবং ভারতবর্ষীয়দের অত্যন্ত দু'আ করতো। কারণ, সাধারণ মানুষ এই সব ভারতবর্ষীয়দের মাধ্যমে জুলুম ও বাড়াবাড়ির হাত থেকে নিরাপদ হয়ে গিয়েছিলো।"[১]

উল্লিখিত কারণগুলোর সঙ্গে আর একটা বিষয় সংযোজন করা যেতে পারে যে, সিম্মার এলাকাতে যে সমস্ত গাযী মোতায়েন ছিলো অথবা অবস্থান করছিলো—কিংবা কখনো কখনো পরিভ্রমণ করতো—তাদের ভেতর যাদের সৈয়দ সাহেবের অধিক সাহচর্যে ও প্রশিক্ষণে থাকার সুযোগ ঘটেনি অথবা স্বভাব-মেযাজের দিক দিয়ে রুক্ষ, কর্কশ ও বেপরোয়া ধরনের ছিলো, তাদের থেকে কোথাও কোথাও অনিয়ম, উচ্ছৃঙ্খলতা ও বাড়াবাড়ির ঘটনা প্রকাশ পেয়ে থাকবে। মানবীয় ফিতরাত তথা স্বভাব-প্রকৃতি অপরিবর্তনীয়। এত বড় বিরাট একটি জামা'আতের সবাই একই নৈতিক, চারিত্রিক ও ধর্মীয় মানদণ্ডের হওয়া এবং শরী'আত ও নৈতিকতার ছাঁচে আপাদমস্তক মণ্ডিত হওয়া ছিলো ধারণাতীত ব্যাপার। যারা ছিলো নবাগত অথবা নীচু সমাজ জীবন ও পারিবারিক পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত—তাদের থেকে মাঝে মধ্যে এমন সব ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে, যা এলাকাবাসীর মনে কষ্ট ও বিরক্তির

---

১. মনজুরু'স-সা'দাহ, ১০৩৯-৪০ পৃষ্ঠা।

কারণ হতো। সৈয়দ সাহেব ব্যাপারটি জানতে পেরে অত্যন্ত শক্তভাবে তাদেরকে নিন্দা ও ভৎর্সনা করেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন।

হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) এবং তাঁর জামা'আতের অধিকাংশ 'উলামায়ে কিরাম হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিছে দেহলবী (র)-এর ন্যায় মসলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করতেন এবং ফিকাহ্ ও হাদীছের ভেতর সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করতেন। কিন্তু ১৩শ শতাব্দীতে সাধারণভাবে সমগ্র মুসলিম জাহানে--বিশেষত ভারতবর্ষে এবং তার চাইতেও বিশেষভাবে সীমান্ত প্রদেশে ও আফগানিস্তানে ধর্মীয় ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে বন্ধ্যাত্ম্য বিরাজ করছিলো--সে পরিবেশে প্রচলিত আচার-অভ্যাস, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী ও মত-পথ থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুতি এবং প্রতিটি এমন বিশ্লেষণ যা 'আলিমদের নিকট ছিলো সম্পূর্ণ অপরিচিত ও নতুন--তা আল্লাহদ্রোহিতা, তাঁর প্রতি অবিশ্বাস এবং ধর্মের গণ্ডী থেকে মুক্তি ও স্বাধীনতারই সমার্থক ছিলো। সুতরাং 'আলিমরা চারদিকে প্রচার করে যে, এই সব ভারতীয় 'আলিম এবং তাদের আমীর লা-মযহাবী, প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনার পূজারী এবং স্বাধীন ও মুক্তবুদ্ধি পোষণ করে। এসব প্রোপাগাণ্ডারও প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকবে---যার অনুমান-আন্দাজ আজও করা চলে।

হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর ঈমানী দাওয়াত ও জিহাদ আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজ, তাঁর লেন-দেন, উঠা-বসা--প্রত্যেকটি জিনিসের পেছনে একটি প্রেরণাই সক্রিয় ছিলো আর তা হলো আল্লাহ্র কলেমাকে বুলন্দ করা, ইসলামের বিজয়, রসূলে আকরাম (স)-এর সুন্নত (জীবনাদর্শ) ও ইসলামী শরী'আতের পুনরুজ্জীবন এবং ইসলামের ফৌজদারী বিধানের প্রচলন। তিনি চাচ্ছিলেন যে, মুসলমান এমন এক ইসলামী জীবন যাপন করবে যার মধ্যে জাহিলিয়াত, প্রবৃত্তি-জাত কামনা-বাসনা, আচার-অভ্যাস ও প্রাচীন প্রথা-পদ্ধতির কোন নাম গন্ধও থাকবে না। তারা গায়রুল্লাহ্র হুকূমত থেকে আল্লাহ্র হুকূমতে, যুদ্ধ থেকে শান্তিতে, প্রবৃত্তি-পূজা থেকে আল্লাহ্র 'ইবাদত-বন্দেগীতে প্রবেশ করবে। এটাই ছিলো সেই জিনিস যা তাঁকে হিজরত ও জিহাদ, নিজের পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছেদ এবং বিপদ-আপদ ও মুসীবতকে হাসি মুখে ও প্রসন্ন বদনে পুরুষ সিংহের ন্যায় মুকাবিলা করতে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছিলো।

এই একটি মাত্র জিনিসের জন্য তিনি তাঁর পুরো জীবনকেই ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন। তাঁর মতে ঐ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যদি পূরণ না হতো তবে না হিজরত ও জিহাদের কোন মূল্য ছিলো--আর না ইসলামী হুকূমতেরই কোন মূল্য ছিলো। চিত্রলের শাসনকর্তা সুলায়মান শাহ্র নামে লিখিত এক পত্রে তিনি অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় লিখেছিলেন ঃ

"এই ফকীরের ধন-দৌলত এবং সালতানাত ও হুকূমত লাভের কোনই গরজ নেই। দীনি ভাইদের ভেতর থেকে কোন একজনও যদি কাফিরদের হাত থেকে দেশকে আযাদ করতে,--আল্লাহ্ রাব্বু'ল-'আলামীনের হুকুম-আহ্-কাম সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে চালু করতে এবং সাইয়েদুল মুরসালীন (স) এর জীবনাদর্শকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেবার জন্য প্রয়াস চালায়, রাষ্ট্রে ও আদালতে শরী'আতী আইন-কানূন বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলে তবে অধম ফকীরের মকসূদ হাসিল হবে এবং আমার সকল প্রয়াস ও প্রচেষ্টা হবে কামিয়াব।"

এটা সেই গোপন ও প্রচ্ছন্ন কার্যকরী শক্তি যা আফগান উপজাতিগুলোর অসন্তুষ্টির ছিলো প্রকৃত কারণ যারা দীন ও শরী'আতের মুকাবিলায় নিজেদের (মনগড়া) নতুন শরী'আত কায়েম করে রেখেছিলো। এই অসন্তুষ্টি ও অতৃপ্তি উপজাতীয় সর্দার, খান ও আমীর-ওমরাদের আরও উত্তেজিত করে তোলে। তারা চাইলো যে, এর সাহায্যে সেই ব্যবস্থাপনাকে নিঃশেষে খতম করে দিতে যা তাদের মর্জি-মাফিক জীবন ও মনগড়া উপজাতীয় ব্যবস্থাপনার পথে অন্তরায় ও প্রতিবন্ধক। পেশোয়ার থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) কাযী, পুলিশ এবং কর্মচারীদের নিযুক্তির উপর বিশেষ নজর দেন। জাহিলী যুগের আচার-অভ্যাসের নিন্দাবাদ ও খণ্ডন করবার জন্য জায়গায় জায়গায় ওয়ায়েজীন ও মুবাল্লিগ পাঠান। লোকেরা দেখতে পায় যে, তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব ও মর্যাদার সাথে এ কাজের দায়িত্ব কাঁধে উঠিয়ে নিয়েছেন, নেহায়েত জোরেশোরে তাতে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাতে করে সমাজে নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য বাস্তবায়িত হতে চলেছে।

الَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا

بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَ لِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ -

"আমি ইহাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করিলে ইহারা সালাত কায়েম করিবে, যাকাত দিবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎকার্য হইতে নিষেধ করিবে; সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহেরই ইখতিয়ারে।"

(সূরা হজ্জ—৪১ আয়াত)

এর প্রতিক্রিয়া সে সব উপজাতির মধ্যে একটি ভয়াবহ ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও কিয়ামতে সোগরা বা ছোট কিয়ামত আকারে প্রকাশ পায়। তার অল্প বিস্তর ভগ্ন হৃদয় এবং থমকে যাওয়া কলম থেকে একটু সামনে এগিয়ে বর্ণনা করা হবে।

এ কোন্ পাপের শাস্তি?

অবশেষে একদিন দুররানী এবং উপজাতীয় সর্দার যাদের আযাদী ও স্বেচ্ছা-শাসন শেষ হতে চলেছে বলে চোখে ধরা পড়েছিলো—তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় এবং তারা অনুভব করে যে, আরো কিছুদিন যদি এই শর'য়ী ব্যবস্থাপনা সময় পায় এবং সাধারণ মানুষ এতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে—তাহলে তাদের আযাদ ও বল্গাহীন জীবনে প্রত্যাবর্তন সহজ হবে না। তারা দেখতে পায় যে, তাদের চতুর্দিকের যমিন আস্তে আস্তে সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হতে চলেছে। এমত অবস্থা থেকে যদি যথাসম্ভব সত্বর ছিটকে বেরিয়ে আসা না যায় তবে এ নতুন ব্যবস্থাপনা, নতুন ইমামত ও নেতৃত্ব শক্তিশালী হয়ে উঠবে আর তাদের ক্ষেত্র ও অঙ্গন পূর্বের তুলনায় অধিকতর কমযোর হয়ে পড়বে।

সুলতান মুহাম্মদ খানের অন্তর থেকে (কালের দীর্ঘতা, সৈয়দ সাহেবের অনুগ্রহ এবং তাকে দ্বিতীয়বার সালতানাতের শাসন ক্ষমতা অর্পণ ও উত্তম ব্যবহার সত্ত্বেও) ইয়ার মুহাম্মদ খানের যখম উপশম হয়নি। সে যেভাবে আহত, হেয় ও লাঞ্ছিত, বন্ধু ও সহায়হীন হয়ে এই দুনিয়া থেকে গেছে সে ব্যথা তার অন্তরে তখনো বর্তমান ছিলো। সৈয়দ সাহেবের সঙ্গে তার সন্ধি-সমঝোতা ছিলো উপরে উপরে,—পরিস্থিতির কারণে বাধ্য হয়ে এবং এ ছিলো একটি বাস্তবতার সামনে পরাজয়ের শামিল,—ঔদার্য ও প্রশস্ত হৃদয়ের সঙ্গে নয়। এ জন্যেই সে যথাসম্ভব সত্বর-এর স্পর্শ থেকে মুক্তি পাবার জন্য চেষ্টা-তদবীর করতে থাকে এবং সুযোগের সন্ধানে ওঁৎ পেতে থাকে। পেশোয়ারে সে সময় সৈয়দ সাহেবের প্রতিনিধি ও কাযী ছিলেন মওলানা মাজহার আলী 'আজীমাবাদী। 'আমরু বি'ল-মা'রূফ ওয়া নাহী 'আনি'ল-মুনকার' তথা সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে

নিষেধ, বিবাদ-বিসম্বাদ মীমাংসা এবং শরী'আতের বিধি-বিধানের প্রচলনের ব্যাপারে তিনিই ছিলেন যিম্মাদার। সিম্মাও ছিলো মওলানারই প্রভাবাধীন। এর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সুলতান মুহাম্মদ খান ও তার ভাই অনেক দিন থেকেই দেখে আসছিলো। এমনকি তা হস্তগত করার ব্যর্থ চেষ্টাও করেছিলে া। তাদের ধারণা ছিলো যে, যদি এই শক্তিকে এই মুহূর্তে কমযোর করে না দেওয়া যায় তবে এ শুধুমাত্র পেশোয়ারই জয় করতে সমর্থ হবে না; বরং লাহোর হুকূমতের জন্যেও তা বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে। এ জন্য তার সঙ্গে পরিণয় ও পারস্পরিক স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা অথবা তাকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবার সুযোগ দেওয়া বিপদজনক হবে। আর এও মনে করতো যে, তারা এবং তাদের খান্দান—যারা আফগানিস্তান ও সীমান্তে সব সময়ই রাজত্ব করে আসছে—এ এলাকার একমাত্র হকদার এবং এতে ভাগ বসাবার অধিকার আর কারো নেই।

প্রায় প্রত্যেক গ্রামে এবং পেশোয়ার ও মর্দানের মধ্যখানে অবস্থিত এলাকাতে এক একজন কাযী, পুলিশ, ওশর ও যাকাত আদায়ের কর্ম-চারী ও তহশীলদার বর্তমান ছিলো। তারা সে সব এলাকায় উপজাতীয় সর্দারদের ইজারাদারী ও শাসন ক্ষমতাকে কমযোর ও সংকুচিত করে দিচ্ছিলো। কোন কোন সময় সরদারদের নিজস্ব ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করছিলো,—সতর্ক ও অবহিত করছিলো শরী'আতের হুকুম-আহকাম বিষয়ে। এ ধরনের কথাবার্তায় তারা অস্থির হয়ে উঠতো এবং অত্যন্ত তিক্ততা ও অনীহা সত্ত্বেও তা বরদাশ্‌ত করতো।

এ সব বিভিন্ন প্রকারের মৌলিক বিষয়ের মধ্যে সাযুজ্য ছিলো মাত্র একটি বিষয়ে এবং তা ছিলো সেই জীবনধারা ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে অস্থিরতা ও অতৃপ্তি, যার বিষয়ে তাদের কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিলো না। আর এটা ছিলো তাদের জন্য একদম নতুন ও অপরিচিত। তাদের ভেতর ঈমান ও 'আকীদার সেই শক্তি অথবা দৃষ্টিশক্তি এবং আপন গর্দানের উপর লটকানো দায়িত্ব ও কর্তব্যের সঠিক উপলব্ধি ও চেতনা ছিলো না যা ঐ সব জাহিলী প্রবণতা, ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ও স্বার্থ এবং হিংসা-বিদ্বেষকে পরাভূত করতে পারতো। আফসোস এটাই। ঐ এলাকার আসল বাসিন্দারা নিজেদের সে সব ভাইদের সাথে একাত্ম হয়ে যেতে পারেনি যারা জীবিকার সন্ধানে এবং নিজেদের পুরুষানুক্রমিক সৈনিকবৃত্তি ও

সামরিক স্পৃহাকে বজায় রাখবার স্বার্থে অল্প কাল হলো ভারতবর্ষে এসে-ছিলো এবং তাদের ভেতর আফগানদের বহুবিধ বৈশিষ্ট্য ও উপজাতীয় গুণাবলী অবশিষ্ট ছিলো। এর বড় কারণ ছিলো তাদের চরিত্র, কার্য-কলাপ এবং ধর্মীয় প্রশিক্ষণ। তারও কারণ ছিলো,—ব্যক্তিগত লাভালাভ ও সুযোগ-সুবিধা এবং আর্থিক মুনাফার সামনে আর কোন যুক্তিই চলতো না এবং তার সঙ্গীত ও সুরলহরী সুস্থ-সঠিক বুদ্ধি ও উপলব্ধি দু'টোকেই পঙ্গু, কমযোর এবং অবশ বানিয়ে দেয়।

যাই হোক, উপজাতীয়দের ভেতর বিদ্রোহের ছাই-চাপা আগুন ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকে এবং পেশোয়ারে চক্রান্তের নীল-নকশা প্রণয়ন করা হয়। উপজাতীয় সর্দারমণ্ডলী সুলতান মুহাম্মদ খানের সঙ্গে বরাবরের মতোই মিলিত হতো এবং তার থেকে গোপন নির্দেশ লাভ করে নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবর্তন করতো। এই সময়ের মধ্যে মুহাজিরগণ নিজের নিজের কাজে মশগুল এবং লাহোর হুকুমতের মুকাবিলার প্রস্তুতিতে ছিলো সদা ব্যস্ত। তারা মনে-প্রাণে চাচ্ছিলো যেন শর'য়ী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্র ও পরিধি আস্তে আস্তে ঐ সব উপজাতীয় এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, যেখানে এখন পর্যন্ত তারা পরিচিতি ও প্রবেশাধিকার পায়নি। তাদের মনে কখনো এ কল্পনাও জাগেনি, যে সমস্ত লোক আমীরের কথা 'শুনবে ও মেনে চলবে' বলে বায়'আত করেছে এবং তার প্রতি বিশ্বস্ততার প্রতিশ্রুতিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তারা এভাবে মুখ ফিরিয়ে নেবে। অপরদিকে আরও একটি কঠিন সমস্যা এই ছিলো যে, মুহাজিরীন স্থানীয় লোকদের কওমী যবানের সাথে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলো। এজন্য যা কিছু হচ্ছিলো তার পরিপূর্ণ আন্দাজ করা তাদের পক্ষে ছিলো কঠিন ও দুঃসাধ্য এবং গোপন বার্তা বিনিময় (যা স্থানীয় ভাষায় হচ্ছিলো) বুঝতে পারাটা তাদের জন্য ছিলো অসম্ভব।

মওলানা সৈয়দ মাজহার আলী সাহেবের সঙ্গে সুলতান মুহাম্মদ খান তার ভাই ইয়ার মুহাম্মদ খানের হত্যার ব্যাপারে যে সুরে কথা-বার্তা বলে তা থেকে মওলানা সাহেবের মনে সন্দেহ দেখা দেয় যে, তারা রঙ পাল্টেছে। তিনি নিজস্ব দলীল-প্রমাণ দ্বারা পেশোয়ারের 'উলামাদের যারা এ আলোচনায় শরীক ছিলো তাদের চুপ করে দেন—কিন্তু তা সত্ত্বেও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিলো যে, তারা অসন্তুষ্ট হৃদয়ে চুপ করে আছে। সুলতান মুহাম্মদ খানের ক্রোধ ও আক্রোশ বিশেষভাবে লক্ষণীয় ছিলো।

এরপর মওলানা মাজহার আলী মওলানা মুহাম্মদ ইসমা'ঈল (র)-এর সঙ্গে চিঠিপত্রের যোগাযোগ শুরু করেন এবং এ যুগের ভণ্ডামী প্রতারণা ও মুনাফিকদের অস্তিত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করবার জন্য দরখাস্ত করেন। কারণ—কিছুসংখ্যক 'আলিম মনে করেন যে, নিফাক ও মুনাফিকদের অস্তিত্ব হুযুর আকরাম (স')-এর যমানাতেই শুধুমাত্র ছিলো ঃ এরপর তাদের অস্তিত্ব খতম হয়ে গেছে। জওয়াবে তিনি লিখে পাঠান যে, মুনাফিকদের সম্পর্কে অকাট্য জ্ঞান রিসালতের যমানাতে (ওহীর কারণে) হতে পারতো, —পরবর্তী যুগে তা হওয়া সম্ভব নয়। এজন্যে শেষ যুগে মুনাফিকদের অকাট্যভাবে চিহ্নিত করাও সম্ভব নয়। এর আরো কারণ এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি নিজের ঈমানের প্রকাশ ঘটাবে, কলেমা পাঠ করবে, মুসলমানরা তাকে মুসলমান মনে করতে থাকবে। কিন্তু যে মুহূর্তে সে নিজের ভেতরের নাপাকী ও কুফরীর প্রকাশ ঘটাবে তখন তাকে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হবে। যদি এমনটি না হয় তবে যেসব হাদীছে মুনাফিকদের 'আলামত বর্ণনা করা হয়েছে,—এমনকি এতদূর পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, وان صلى و صام و ظن انه مسلم অর্থাৎ "যদিও সে সালাত আদায় করে, সিয়ামব্রত পালন করে এবং এও ধারণা করে যে সে মুসলিম" (তবুও সে স্পষ্ট মুনাফিক) —এসব হাদীছ কাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।[১]

তিনি সৈয়দ বেরেলভী (র)-র কাছেও এই পরামর্শ চান যে, তিনি কি এখানে অবস্থান করবেন অথবা তাঁদের সান্নিধ্যে চলে আসবেন। মওলানা মুহাম্মদ ইসমা'ঈল তাঁকে ইঙ্গিত দেন যেন তিনি সুলতান মুহাম্মদ খানের অনুমতি নেন এবং মুজাহিদ বাহিনীর হেড কোয়ার্টারে চলে আসেন। কোন

১. বিশেষজ্ঞদের অভিমত এটাই যে, নিফাক মানবীয় ফিতরাতের একটি কমযোরী এবং প্রবৃত্তিজাত রোগ যা কোন দেশ-কাল-পাত্রের সাথে নির্দিষ্ট নয়। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (রহ) স্বীয় বিখ্যাত "আল-ফাউযু'ল-কাবীর' নামক গ্রন্থে এর উপর সংক্ষিপ্ত অথচ অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। হযরত হাসান বসরী (রহ) এবং জমহুর বিশেষজ্ঞদেরও এটাই অভিমত এবং এখন এ ব্যাপারে আর কোন মত-দ্বৈধতা রইলো না। বিস্তারিত জানতে চাইলে লেখকের "তারীখে দাওয়াত ও 'আযীমত, ১ম খণ্ড, তাযকিরায়ে হযরত খাজা হাসান বসরী" দেখুন (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন থেকে বর্তমান অনুবাদক কর্তৃক অনূদিত হয়ে এ গ্রন্থের সব ক'টি খণ্ডেরই অনুবাদ সত্বর প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই এর ১ম ও ৩য় খণ্ডের অনুবাদ "ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক' ১ম ও ৩য় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং ২য় খণ্ড প্রকাশের পথে)।

—অনুবাদক)

কোন মুজাহিদ স্থানীয় অধিবাসীদের এ ধরনের কথা বলতে শোনে এবং তাদের কতিপয় শুভানুধ্যায়ীও তাদেরকে এ ব্যাপারে অবহিত ও সতর্ক করে দেয় যে, এ ব্যাপারে কিছু সত্য অবশ্যই আছে। একে শুধু গুজব বলে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। সুলতান মুহাম্মদ খান এবং উপজাতীয় সর্দারমণ্ডলী এর জন্য (চক্রান্ত কার্যকরী করার জন্য) একটি নির্দিষ্ট দিন ধার্য করেছে, যেদিন তারা নিজেদের পরিকল্পনা একত্রে এবং একই মুহূর্তে বাস্তবায়িত করবে; সমস্ত কর্মচারী ও গাযীদের তারা একই সময়ে শহীদ করবে। এজন্য তারা একটি বিশেষ পরিভাষা (কোড) তৈরী করেছে। এ সংকেত উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাইকারী হত্যা শুরু হয়ে যাবে।

সৈয়দ সাহেবের নিকট এ সংবাদ পৌঁছামাত্রই তিনি নিজেদের সব কর্মচারী ও বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা মুহাজিরদের নির্দেশ পাঠান যেন তারা ঐ সব স্থান পরিত্যাগ করে তার সাথে মিলিত হয়। চক্রান্তকারীরা যখন সংবাদ পেলো যে. সৈয়দ সাহেব তাদের চক্রান্তের খবর অবগত হয়ে গেছেন তখন তারা উক্ত পরিকল্পনা নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই বাস্ত-বায়ন শুরু করে। পাইকারী হত্যার প্রবল ঢেউ গোটা এলাকা গ্রাস করে ফেলে এবং জুলুম ও হত্যাকাণ্ডের এমন সব লোমহর্ষক দৃশ্য সামনে এসে ধরা দেয়, যা ইসলামের ইতিহাস বহুকাল থেকে দেখেনি।

সর্বাগ্রে সৈয়দ মাজহার আলী ও আরবাব ফয়যুল্লাহ খানকে (যিনি সুলতান মুহম্মাদ খান ও সৈয়দ সাহেবের ভেতর অধিকাংশ দৌত্যকার্য সম্পাদন করেছিলেন এবং যার প্রচেষ্টায় সুলতান মুহাম্মদ খান পেশো-য়ারের শাসন ক্ষমতা পুনরায় লাভ করেছিলো)টার্গেটে পরিণত করা হয়। এদেরকে সুলতান মুহাম্মদ খান ডেকে পাঠায় এবং হুকুম দেয় যে, এঁদের মাথা ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হোক।

'ইশার পর বস্তিবাসীরা সবাইকে ঘিরে ফেলে এবং গাযীদের হত্যা করা শুরু করে। কেউ সালাত আদায়রত অবস্থায় শহীদ হয়, আর কেউবা শহীদ হয় ওযূ ও ইস্তেঞ্জা করতে গিয়ে। এ ধরনের অবস্থা সকল বস্তিতেই হয়। কিছু লোক কোনক্রমে পালিয়ে গিয়ে কিংবা কোন ঘরে লুকিয়ে জীবন বাঁচাতে সমর্থ হয় এবং রাতের আঁধারে কোনক্রমে পাঞ্জেতারে সৈয়দ সাহেবের নিকট উপস্থিত হতে সক্ষম হয়। বাকী সবাই শহীদ হয়।

কিছু লোক একটি মসজিদে আটকা পড়ে এবং সেখান থেকেই মুকাবিলা করতে থাকে। দুর্বৃত্তরা চারদিক থেকে এমনি শক্তভাবে ঘিরে রাখে যে, বের হবার এবং বাঁচার আর কোন রাস্তাই থাকে না। বস্তিবাসীরা সমস্ত লোককে ঠেকিয়ে রাখে, দালান-কোঠার ছাদের উপর লোকজন বন্দুক নিয়ে বসে থাকে। গাযীদের গুলী তাদের উপর পড়তো না, কিন্তু এরা তাদের টার্গেটে পরিণত হচ্ছিলো। গাযীদের গোলা-বারুদ নিঃশেষ হয়ে গেলে এরা তখন মযবুর হয়ে দলবদ্ধভাবে মসজিদে প্রবেশ করে এবং ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে শেকল লাগিয়ে দেয়। এদিকে বন্দুক চালানো বন্ধ হয়ে যায় এবং দুর্বৃত্তরা চারিদিক থেকে এসে মসজিদ ঘেরাও করে। সকলেরই অতঃপর একই ধান্ধা কি করে এদের মারা যাবে। কেউ কেউ বললো যে, দেয়ালে সিঁদ কেটে প্রবেশ করে মারা হোক, আবার কেউ কেউ বললো, মসজিদে আগুন লাগিয়ে দেয়া হোক যাতে করে তারা এমনিতেই পুড়ে মরে যায়—আর যারা বাইরে বেরুবে আমরা তাদের মেরে ফেলবো। এ মসজিদের মালিক শাহ্ ওয়ালী খান বললো, আমি এ মসজিদ খনন করতে যেমন দেবো না—জ্বালাতেও দেবো না।

এইরূপ কথাবার্তার মধ্যে উক্ত বস্তির 'উলামা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ আল্লাহ্‌র কালাম পবিত্র কুরআনুল করীম নিয়ে এসে হাযির হয় এবং বিনীত করজোড়ে অনুরোধ-উপরোধসহ আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রসূলের দোহাই দিয়ে তাদের এ থেকে নিরস্ত করার চেষ্টা করে এবং বলতে থাকে যে, এই সব মজলুম মুসলমানদের না-হক মেরো না, আল্লাহ্‌র গযবকে ভয় করো; এরা হাজী, গাযী এবং মুহাজির। তারা তোমাদের কোনই ক্ষতি করে নি। ঠিক এমনি করে বস্তির সমস্ত মহিলারা কেউবা তার স্বামীকে, কেউবা তার ছেলে-সন্তানকে, আবার কেউবা আপন ভাই-ভাতিজাকে জড়িয়ে ধরছিলো আর বলছিলো,—এই সব মজলুম নিরাপরাধ মুসলমানদের মারছো, কাফির হচ্ছো; আল্লাহ্‌র গযবকে ভয় করো, না-হক খুন করো না। কিন্তু দুর্বৃত্তরা কারো কথাই বড় একটা গ্রাহ্যের ভেতর আনেনি।

সবশেষে সেখানকার বেনিয়ারা জড়ো হয় এবং তাদের লক্ষ্য করে বলতে থাকে, আমরা হিন্দু মানুষ। কোন জীব-জন্তুকেও আমরা মারি না, আবার কাউকে মারতেও সাধ্য মতো দেই না। তোমরা এই লোকগুলি মারবার জন্য উত্তেজিত। যা চাও আমাদের নিকট থেকে নিয়ে নাও আর

এদেরকে আমাদের হাতে দিয়ে দাও। আমরা তোমাদের কথা দিচ্ছি যে, এদেরকে পাঞ্জেতারের সৈয়দ বাদশাহ্র কাছে আমরা পাঠাবো না ; সিন্ধু নদের ওপারে শিখ শাসনাধীন এলাকাতে নামিয়ে দেবো। সেখান থেকে যে দিকেই চাইবে---সেদিকে চলে যাবে। তাদের এ আবেদনও ব্যর্থ হয়।

গাযীবৃন্দ মসজিদের ভেতর থেকে এসব কথাই শুনছিলো। দুর্বৃত্তরা সবাই অবশেষে একমতে পৌঁছে মসজিদে আগুন লাগিয়ে দাও। গাযীবৃন্দ যখন স্থির নিশ্চিত হলো যে, এরা অবশ্যই এখন মসজিদে আগুন লাগিয়ে দেবে তখন তারা মসজিদের দরজা খুলে হাতে উলঙ্গ তলোয়ার নিয়ে বের হয়। মসজিদের অঙ্গনে পীর খানের পা ঘায় পিছলে এবং তিনি মাটিতে পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গেই একজন যুবক তাকে উঠিয়ে নেয় এবং বাইরে পূর্ব দিকে চলা শুরু করে। কোন দুর্বৃত্তই জীবনের মায়ায় সে মুহূর্তে গাযীদের পশ্চাদ্ধাবন করে নাই। সবাই মসজিদের ভেতর তাদের পরিত্যক্ত মাল-মাত্তা লুটে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে গাযীবৃন্দ বস্তির বাইরে নালার ধারে গিয়ে উপস্থিত হয়। তারা পানি পান করার জন্য ঝুঁকে পড়ে এবং ভাবতে থাকে যে, আমরা নিরাপদেই বেঁচে গেলাম। ইতিমধ্যে দুর্বৃত্তরা মাল-আসবাব লুটবার কাজ থেকে অবসর হয়ে এদের পশ্চাদ্ধাবন করতে ছুটে যায় এবং নালার ভেতর চারদিক থেকে এদের ঘিরে ফেলে, শুরু করে পাথর ও নেযা-বল্লম ছুড়ে মারা আর সেখানেই সবাইকে হত্যা করে ফেলে ; এদের মধ্যে কাউকেই তারা জীবিত ছেড়ে দেয় নি। এরপর তারা গাযীদের কাপড়-চোপড়, অস্ত্র-শস্ত্র ইত্যাদি নিয়ে বস্তিতে ফিরে আসে।[১]

মোটকথা, এ পাইকারী হত্যার কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম ছিলো না এবং কেউ এথেকে রেহাইও পায়নি। যে কয়েকজন মুহাজির ও মুজাহিদ বুদ্ধিমত্তা, কৌশল ও উপস্থিত বুদ্ধির কারণে পালিয়ে বাঁচতে সমর্থ হয়েছিলো তাদের মধ্যে মওলানা খায়রুদ্দীন শেরকোটিও ছিলেন। তিনি তাঁর বহু সঙ্গী-সাথীসহ উক্ত ঘেরাও থেকে বেরিয়ে আসেন এবং সৈয়দ সাহেবের নিকট বেশ নিরাপদেই পৌঁছে যান। সৈয়দ সাহেব তাদের সুস্থতা ও নিরাপদে ফিরে আসতে পারায় আল্লাহ্র দরবারে শুকরিয়া জানান এবং আগমনের খুশীতে উৎফুল্ল হয়ে তোপধ্বনি করেন যেন শত্রুদের অন্তরে এর কারণে ভীতির সঞ্চার হয়। তিনি এক রাত্রি করে তাদের খাওয়া-

১. সীরতে সৈয়দ আহমদ শহীদ, ৩৪০ পৃষ্ঠা

নোর নির্দেশ দেন এবং তাদের জন্য নতুন পোশাক ও নতুন জুতার ব্যবস্থা করেন।

এই জুলুম ও বর্বরতার শিকারে পরিণত হয়েছিলো তারাই, যারা মুহাজিরীন ও মুজাহিদীনের ভেতর বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী ছিলেন বলা যায়। এ সমস্ত লোক তাদের সংসারের প্রতি উদাসীনতা ও পরকালপ্রীতিতে এবং আমানতদারী ও বিশ্বস্ততায় ছিলো অতুলনীয়। রাত্রিকালে জাগ্রত ‘ইবাদত-গোযার,—দিনের বেলায় ঘোড়সওয়ার এবং দীন-ধর্মের সাহায্য ও সহায়তার মাঝে যাদের সময় কেটে যায়। আর রাত্রিকাল অতিবাহিত হয় মুনাজাতে ইলাহী এবং তাঁরই দরবারে কান্নাকাটি, অধীরতা ও অস্থিরতার ভেতর দিয়ে। পবিত্র কুরআনের ভাষায়ঃ

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا

“তাহারা শয্যা ত্যাগ করিয়া তাহাদিগের প্রতিপালককে ডাকে আশা ও আশংকায়।” (সূরা সিজদা, ১৬ আয়াত)

মোদ্দা কথা, এভাবেই এই জামা‘আতটি যাদের সাহায্যার্থে যাদের ‘ইযযত-আবরু ও পবিত্রতা রক্ষার জন্যে জালিম, অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের হাত থেকে তাদের মুক্তি ও রেহাই দিতে গিয়েছিলো, স্বয়ং তাদেরই জুলুম ও বর্বরতার শিকারে পরিণত হয়।

অদৃশ্য শূন্যলোক থেকে আজও এ আওয়াজ কানে গুঞ্জরিত হচ্ছেঃ

بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

“কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হলো?” (সূরা তাকভীর, ৯ আয়াত)

بر لوح تربت من يافتند از غيب تحريرے

كه اين مقتول را جز بےگناهى نيست تقصيرے

“(পথিকেরা!) আমার কবরের কাঠের ফলকে গায়েবের একটি লেখা পাবে,—এই নিহতের নিরপরাধ ছাড়া কোন অপরাধ নেই।”

নতুন হিজরত! নতুন জিহাদ!

এই বিষাদময় লোমহর্ষক ঘটনা সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর হৃদয়ে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আল্লাহ্ তা‘আলার তরফ থেকে হৃদয়ের

ঐশ্বর্য, উচ্চ মনোবল, অন্তরের প্রশস্ততা, সহনশীল শক্তি, নিজ দুশমনের সঙ্গে উত্তম আচরণ ও সদ্ব্যবহারের যে প্রচুর অংশ তিনি পেয়েছিলেন তা দেখে মানুষের চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধি খেই হারিয়ে ফেলে। এ ক্ষেত্রে তিনি হুযূর আকরাম (স')-এর পূর্ণ অনুসারী ছিলেন। যে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার সঙ্গে উত্তম সম্পর্ক স্থাপন, হাত যে গুটিয়ে নেয় তাকে অনুগ্রহ ও বদান্যতা প্রদর্শন, যে জুলুম ও বাড়াবাড়ি করবে তার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করাই ছিলো তাঁর নীতি ও আদর্শ। নিজের জন্য ক্রোধ প্রকাশ, কোন মানুষের প্রতি অন্তরে হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করা ছিলো তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ। অতএব যে সব লোক তাঁকে বিষ প্রয়োগে শহীদ করবার প্রয়াস চালিয়েছিলো, তাদের তিনি শুধু ক্ষমাই করেন নি—তাদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহারের উজ্জ্বল পরাকাষ্ঠাও প্রদর্শন করেছিলেন এবং এ চেষ্টাও করেছিলেন যেন তাদের অতটুকু আঁচড়ও না লাগে। মন্দ ব্যবহারকারীর সাথে তাঁর ব্যবহারের নমুনা দেখলে যে কেউ ভাবতো সম্ভবত লোকটি কোন সময় সৈয়দ সাহেবকে কোন উপকার করেছিলো। এই কারণে লোকটি পুরস্কার ও শুকরিয়া পাবার হক্‌দার।

কিন্তু এই দুঃখজনক ঘটনার ধরনই ছিলো ভিন্ন। এটা ছিলো একটা বুদ্ধিভিত্তিক ও সুচিন্তিত আঘাত এবং সামাজিক সমস্যা। তাঁর ব্যক্তিগত কোন বিষয়ের সাথে এর কোন সম্পর্ক ছিলো না। আর তাই এজন্য উঁচু ধরনের বদান্যতা ও বিরাট মনোবলেরও প্রয়োজন ছিলো না। অবশ্য এ ধরনের বিপর্যয় ও মুসীবত কাটিয়ে উঠার জন্য তাঁর প্রশস্ত বক্ষে যথেষ্ট জায়গা ছিলো। কিন্তু এই দুঃখজনক ঘটনা দাবী করছিলো গোটা সমস্যাটার আনুপূর্বিক পর্যালেচনার এবং লাভ-লোকসানের পুনরুপি তুলনার।

এই দুঃখজনক ঘটনার উদাহরণ এমন একজন কৃষকের সাথে দেওয়া যায় যে তার ক্ষেত্রে উত্তম থেকে উত্তমতর জাতের বীজ বপন করেছে বরং নিজের অন্তরের প্রতিটি বিন্দু এর পেছনে ক্ষয় করে এবং নিজের রক্ত ও ঘাম দিয়ে এর জন্য প্রয়োজনীয় পানি সিঞ্চন করে—উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর সার প্রয়োগ করে এবং এর লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দিনরাত চষে ফেরে। এরপর ক্ষেত যখন শস্য শ্যামলা পরিপূর্ণ একটি বাগানের রূপ নেয় ঠিক সেই মুহূর্তে অন্য কোন কৃষক অথবা তার কোন প্রতিবেশী এতে আগুন লাগিয়ে ধ্বংস ও বরবাদ করে দেয়। এ ধরনের লোমহর্ষক ও বিষাদাত্মক ঘটনা এখানে একবার নয়—বারবার সংঘটিত

হয়েছে। যদি এক হাত নির্মাণের জন্য এগোয় তবে হাজারো হাত তা ধ্বসিয়ে দেবার জন্য বর্তমান থাকে। যে ভূখণ্ড সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর অসম্মান, অমর্যাদা এবং সদ্ব্যবহারের বিনিময়ে অসদ্ব্যবহার দেখাতে চেষ্টার কোন কসূর করেনি, এখন পুনরায় সেখানে বীজ নিক্ষেপ এবং নতুনভাবে পানি সেচন, যত্ন ও তদারকী, কষ্টসাধ্য পরিশ্রম, অতঃপর পুনরায় অজানা পরিণতি ও ফলাফলের অপেক্ষায় হাতের উপর হাত রেখে নির্বিকার বসে যাওয়াই কি সমীচীন? না কি আল্লাহ্‌র প্রশস্ত ও উদার উন্মুক্ত যমীনের অন্য কোন নতুন এবং পাকসাফ ভূখণ্ডকে স্বীয় গভীর চেষ্টা ও সাধনার কেন্দ্রভূমি বানানো উচিত? যেসব বীজ তখনো অবশিষ্ট ছিলো সেগুলো হেফাজত করা কি সমীচীন নয়? তিনি জানতেন যে, একটি কুকুরও যখন কোন দরজায় বারবার ধর্ণা দেয় তখন লোক তার অধিকার মেনে নেয় এবং রূটির একটা টুকরা হলেও অবশ্যই তার সামনে ফেলে দেয়। সেও বাড়ীওয়ালাদের সাথে পরিচিত হয়ে ওঠে এবং তাদেরকে পরিত্যাগ করতে অথবা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে সে জানে না। তবে কি তিনি এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ এই সব পোষা-পালিত জানো-য়ারের চেয়েও অধম? তবে কি তিনি এ পর্যন্ত শুধু জনমানবহীন মরু-প্রান্তরেই চীৎকার করে ফিরেছেন? এবং শূন্যে হাওয়ার উপরই কি বালা-খানা ও চৌমহলা নির্মাণ করছিলেন? নিজের সমগ্র শক্তি ও সামর্থ্য কি মিছেমিছি ভুল স্থানে অপচয় করছিলেন?

যে জিনিস তাঁর যখমকে আরও গভীরতর করে দিয়েছিলো এবং তাঁকে মানসিক দিক দিয়ে যন্ত্রণাবিদ্ধ করছিলো—তা ছিলো এই যে, ফতেহ-খান পাঞ্জেতারী যে তাঁকে তার এলাকায় আগমনের জন্য দাওয়াত জানি-য়েছিলো এবং ওয়াদাও করেছিলো যে, সে ও তার কওম তাঁর সঙ্গে সেরকম আচরণই করবে যা মদীনার আনসারেরা মুহাজিরদের সাথে করেছিলো, কিন্তু সে এ সময়ে খোলাখুলিভাবে ষড়যন্ত্রকারী ও দুষ্কৃতিকারীদের পক্ষাবলম্বন করে। এর ফলাফল এই দাঁড়ায়—যে কোন মানুষের উপরই পুরোপুরি নির্ভর করা মুশকিল হয়ে পড়ে এবং কারোর বিশ্বস্ততায় আস্থা ও ভরসা স্থাপন করা অর্থহীন বলে প্রতিভাত হতে থাকে। সৈয়দ সাহেব ফতেহ খানকে একবার কোন এক সুযোগে এদিকে ইঙ্গিত করেই বলেছিলেন যে, "আমাদের জন্যে তো জরুরী হয়ে গেছে যেন আমরা নিজেদের দিলের চিকিৎসা আগে করি যাতে করে কলেমা পাঠকদের তরফ থেকে সন্দেহের নিরসন ঘটে।'"

সৈয়দ সাহেব কিন্তু আপন ফয়সালার ক্ষেত্রে কোনরূপ তাড়াহুড়োর আশ্রয় নেননি; বরং তিনি সেসব কার্যকারণ ও সক্রিয় বিষয়গুলো জানতে প্রয়াস পান যা এই পশুসুলভ নৃশংস হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের পেছনে ক্রিয়াশীল ছিলো। এতদুদ্দেশ্যেই তিনি ঐ এলাকার 'উলামায়ে কেরাম, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, খান এবং কতিপয় উপজাতীয় সর্দারের উদ্দেশ্যে পত্র প্রেরণ করেন। ফতেহ খানের নিকটেও এ ব্যাপারে সহযোগিতা কামনা করেন,—সাথে সাথে তাদের পাঞ্জেতারে আসার জন্যও দাওয়াত জানান যেন এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার উপর মত বিনিময় করা যায়।

নিজের সঙ্গী-সাথীদের তিনি আগত মেহমানদের যিয়াফত ও মেহমানদারীর ব্যাপারে অত্যন্ত তাকীদ দেন এবং নির্দেশ প্রদান করেন যে, যদি এমন কোন ব্যক্তিও তাদের দৃষ্টিগোচর হয় যার এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে হিস্যা আছে—তবুও যেন কোন অভিযোগ করা না হয় কিংবা তীর্যক ভঙ্গীতেও যেন তার প্রতি দৃষ্টিপাত করা না হয়; বরং তাদের আরও অধিকতর খাতির-যত্ন করবে।

যে সমস্ত লোক এতদ্‌উপলক্ষে জড়ো হয়েছিলো তাদের ভেতর নির্দোষ নিরপরাধ যেমন ছিলো, তেমনি ছিলো সেই সব ব্যক্তিও যাদের হাত ছিলো শহীদের খুনে রঞ্জিত। মুহাজিরীন এতদুভয়ের মধ্যে বাস্তবিকপক্ষেই কোনরূপ পার্থক্য সৃষ্টি করে নি। তাদের সবাইকে সমভাবে খাতির যত্ন করে। সৈয়দ সাহেব এবং আগত মেহমানদের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ আলাপ-আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করেন যে, কারণগুলো কি ছিলো যা তাদেরকে হত্যা ও খুন করতে উৎসাহিত করেছিলো। তারা উত্তরদান প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে উল্লিখিত কারণগুলোই উল্লেখ করে। অধিকন্তু—সে সব গুজবের কথাও উল্লেখ করে যা এই জামা'আতটি সম্পর্কে সেখানে ছড়িয়ে পড়েছিলো এবং কতিপয় কর্মচারী ও তহ্‌সীলদারের ব্যবহার ও আচরণ সম্পর্কে স্থানীয় অধিবাসীদের অভিযোগের প্রতিও তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) এ সব কথার প্রত্যেকটিরই বিস্তারিত ও পরিপূর্ণ উত্তর প্রদান করেন। আলোচ্য মজলিসে স্থানীয় ও বিদেশী 'উলামায়ে কিরামের মধ্যে কতিপয় 'আলিমও বক্তৃতা করেন এবং এটা পরিষ্কারভাবেই প্রমাণিত হয়ে যায় যে, তাদের যুক্তির কোনরূপ ভিত্তি ও গুরুত্বই নেই। তাদের নিকট এমন কোন যুক্তি ছিলো না যা এতবড়

ব্যাপক ও পাইকারী হত্যাকে (যার ভেতর মুহাজিরীন ও মুজাহিদ বাহিনীর উত্তম নির্যাসগুলো তলোয়ারের নীচে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো) বৈধ প্রমাণ করতে পারে।

শেষাবধি সৈয়দ সাহেব ঐ এলাকাকে (যা তাঁর সমগ্র প্রয়াস ও সাধানাকে ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছিলো এবং সদয় ব্যবহারের বিপরীতে জুলুম-নির্যাতন, বিশ্বস্ততার পরিবর্তে গাদ্দারী ও বিশ্বাসঘাতকতা উপহার দিয়েছিলো, ভবিষ্যতের সকল আশা-ভরসা ও সম্ভাবনাকে দিয়েছিলো নস্যাৎ করে) বিদায় আরয জানাতে সিদ্ধান্ত নেন।

এই সুযোগে হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর কতক সাথী চেষ্টা করেন যেন তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করেন। বিশেষ করে মওলানা খায়রুদ্দীন শেরকোটি তাঁর সঙ্গে এ সমস্যার উপর আলাপ-আলোচনা করেন এবং বলেন—যে, আপনি এখান থেকে হিজরত করবার যে প্রস্তুতি নিচ্ছেন সে ব্যাপারে আমার নগণ্য অভিমত এই যে, এখান থেকে স্থানান্তরে গমন করা সমীচীন নয়। যদি আপনি দ্বিতীয় কোন দেশে যেতে ইচ্ছুক হন তবে সেখানেও দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে। তাদের ওয়াজ-নসীহত করবেন, তাদের আচার-অভ্যাস ও বিভিন্ন রীতি-নীতি সম্পর্কে অবহিত হবেন এবং এরপরও দেখতে হবে যে, সেখানকার লোকগুলো কি ধরনের ও কোন প্রকারের। আপনার সেখানে অবস্থান গ্রহণ করাতে তারা কি রাজী অথবা নারাজ। তার থেকে বরং এখানে অবস্থান করাটাই সমীচীন। কেননা এখানকার লোকগুলো তবুও তো নির্ভরশীল, সত্যনিষ্ঠ ও মুনাফিক এবং অনুগত ও বিদ্রোহ—একে অপরের থেকে সুস্পষ্ট পার্থক্য রেখায় চিহ্নিত। জিহাদের যে ব্যাপার এখানে সহজেই হতে পারবে—তার জন্য অন্যত্র প্রয়োজন হবে একটা দীর্ঘ সময়ের।

হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) বললেন, "কথা তো তুমি সত্যই বলছো, কিন্তু এখানে অবস্থান করার কোন পরিবেশই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। কেননা এখানে সত্যনিষ্ঠ লোকের সংখ্যা অল্প অথচ দুষ্কৃতিকারীর সংখ্যা অনেক। এখন আর এদের হিদায়াত ও সংস্কার কিংবা পরিশুদ্ধির কোন আশাই রইলো না। একবার তাদের থেকে ধোঁকা খেয়ে পুনরায় তাদেরই ভেতর থাকাটা দীনদারী ও সতর্কতার পরিপন্থী। হযরত রসূল মকবূল (স) বলেছেন ঃ

لا يلدغ المؤمن من حجر مرتين

"মুমিনকে একই গর্ত থেকে দু'বার দংশন করা যায় না (অর্থাৎ মুসলমান একই স্থানে বারবার প্রতারিত হয় না)। এ এলাকার পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত সোয়াত রাজ্য, সেও তো আমাদের বিরোধী শিবিরে।

"এছাড়া ফতেহ খান যার এখানে আমরা অবস্থান করছি তার তরফ থেকেও আমাদের আস্থা যেতে বসেছে। সমস্ত লোকই বিরোধী হলেও তবুও কোন পরওয়া ছিলো না, যদি এই লোকটিও অন্তত আমাদের থাকার ব্যাপারে দৃঢ় সমর্থন জানাতো তবুও না-হয় থাকার যুক্তি থাকতো। এখন এখানকার লোকদের প্রতি আমার এমনই ঘেন্না ধরে গেছে যেমন ঘেন্না ধরে মানুষের তার বমির উপর। এখান থেকে তাই হিজরত করাটাই এখন উত্তম।"

মওলবী খায়রুদ্দীন সাহেব বললেন যে, আমরা আপনার আনুগত্যে অটল। আপনি যেদিকেই যাবেন আমরা সকলে বিনা ওযর আপত্তিতে আপনার সফর-সঙ্গী হবো।

আরবাব বাহরাম খান বললেন, আপনি আমাকে এজাযত দিন, তা'হলে আমি সৈনাবাহিনীর একটি অংশ ও কামান গোলা নিয়ে পল্লী ও দেহাত অঞ্চলে একবার একটা চক্কর মেরে আসি। দেখবেন, ইনশাল্লাহ্ যুদ্ধ পর্যন্ত গড়াবে না; ও দিকের সবাই অনুগত ও বশীভূত হয়ে যাবে।

হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) বললেনঃ ভাই! প্রথম প্রথম আমরা যখন এদেশে এসে পৌঁছি তখন আমরা না এই কওমের হাল-হকিকত সম্পর্কে অবহিত ছিলাম, না তারাই আমাদের অবস্থা সম্পর্কে ছিলো অবহিত। আমরা কয়েক বছর যাবত ওয়াজ-নসীহত দ্বারা তাদের অন্তরকে আমাদের দিকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করি। যখন তাতে কোন কাজ হলো না তখন আমরা বিজ্ঞজনোচিত ব্যবহার করি এবং বুদ্ধিমত্তা ও যুক্তি-তর্কের সাহায্যে আমাদের নির্দেশাদির বাস্তবতা প্রমাণিত করতে চেষ্টার কোন কসূর করিনি। আমাদের চেষ্টা-সাধনার পেছনে শুধুমাত্র 'দীনে হক্'-এর প্রচলনই ছিলো একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। তবু এতেও আছর হলো না ----বরং তাদের বিদ্রোহাত্মক ও অনমনীয় মনোভাবের ক্ষেত্রে এতখানি উন্নতি হয় যে, এতগুলো মুসলমান যারা নিজেদের দেশে মণি-মুক্তাসদৃশ ও মগজস্বরূপ ছিলো—শহীদ করে দেয়। আমাদের গৃহীত কর্মপদ্ধতির উদ্দেশ্য রাজ্য-পরিচালনা কিংবা সম্পদ ও প্রাচুর্যের কামনা

বাসনা ছিলো না, আমাদের উদ্দেশ্য তো শুধুমাত্র নৈতিক পরিশুদ্ধি এবং এরই ভিত্তিতে বাস্তব প্রশিক্ষণ ছিলো। এখন আমরা এদেশের লোকদেরকে প্রকৃত প্রতিশোধ গ্রহণকারীর ন্যায়বিচার ও ইনসাফের উপর ছেড়ে দিচ্ছি এবং অবশিষ্ট সাথীদের নিয়ে অপর কোন দেশ পানে যাত্রা করছি এজন্যে যে, যখন আমরা আমাদের দেশ থেকে হিজরত করেছি তখন যেখানেই সত্যাশ্রয়ী এবং সত্যবাদী লোকের দেখা মিলবে সেখানেই আমরা অবস্থান করবো। শুধুমাত্র এদেশের উপরই আমাদের কোন নির্ভরশীলতা নেই।[১]

হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর হিজরতের খবর যখন সর্বত্র মশহুর হয়ে যায় তখন সেসময়ে পাঞ্জেতারে উপস্থিত হককানী 'আলিম, বিশুদ্ধচিত্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও ভক্ত খান যারা ছিলেন—তারা সবাই এ সংবাদে মর্মাহত হন এবং এখবর শোনা মাত্রই চারদিক থেকে ও পরিপার্শ্বস্থ এলাকার একনিষ্ঠ ভক্তবৃন্দ আসতে শুরু করে এবং না যাবার জন্য অনুনয় ও বিনয় প্রকাশ করতে থাকে। একদিন সর্দার ফতেহ মুহাম্মদ খানের নিজ কওমের লোকজন, যারা চতুর্দিকের বস্তিতে বসবাস করতো, সমবেত হয়ে পাঞ্জেতারে আসে এবং ফতেহ খানকে নিজে-দের সঙ্গে নিয়ে এসে উপস্থিত হয়। সময়টা ছিলো 'আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী আর তিনি ছিলেন মসজিদে উপবিষ্ট। ফতেহ খান আরজ করে, আমার কওমের লোকেরা এসেছে। তারা আপনার কাছে কিছু আরজ পেশ করতে চায়। সৈয়দ সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) বললেন, আচ্ছা বলো, ভাইয়েরা কি বলতে চায়। ফতেহ খান বললো, এই সব লোক আপনার খিদমতে আরয করছে যে, আপনি এখান থেকে অন্য কোথাও যেন গমন না করেন। আমরা সবাই আপনারই অনুগত এবং আমাদের জীবনও আপনার সেবায় উৎসর্গীত। আমাদের দ্বারা আজ পর্যন্ত আপনার খিদমতে কোন গোস্তাখী কিংবা কোন প্রকার বেয়াদবী হয়নি।

হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) বললেন: এই সব ভাইয়েরা সত্য কথাই বলছে। আজ পর্যন্ত তাদের থেকে কোন অন্যায় ও কসূর প্রকাশ পায়নি। আমরা তাদের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট। তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক কোন আচরণের অভিযোগও আমার নেই এবং যারা এটা বলছে যে, সৈয়দ বাদ-শাহ্ এখান থেকে যেন না যান, আল্লাহ্ পাক তাদের কল্যাণকর পুরস্কার

১. মনজুরু'স-সা'দাহ ১০০৩ পৃষ্ঠা।

দিন। আসল কথা এই যে, এই সব লোক কেন—যদি সিম্মা, সোয়াত, বুনীর ইত্যাদির সমস্ত লোক এটা বলে যে, তুমি এখন এখান থেকে যেও না—আর কেবল একা তুমি বলো যে—যাও, তবে আমি চলে যাবো। পক্ষান্তরে সমস্ত লোকই যদি বলে যে, তোমরা এখান থেকে চলে যাও আর তুমি একাই শুধু বলো যে—যেয়ো না, তবে আমি কখনোই যাবো না। একথা বলতে যদি কোন সংকোচ কিংবা অন্য কোন বাধা থাকে তবে নিজের অন্তরের কথা না হয় চুপিসারে আমার কানের কাছেই বলে যাও।

একথা বলেই তিনি ফতেহ্ খানকে নিজের কাছে বসিয়ে নিজের কানকে ফতেহ খানের মুখের কাছে নিয়ে যান। অনেকক্ষণ যাবত ফতেহ খান তাঁর কানের কাছে কিছু বলতে থাকে এবং তিনিও তার কানের কাছে কিছু বলতে থাকেন। লোকজন দূর থেকেই এসব দেখতে থাকে, কিন্তু কেউ জানতে পারে না আসলে কথা কি হচ্ছিলো।

ফতেহ খানের সাথে কথা চুকিয়ে ফেলার পর সৈয়দ সাহেব কওমের আগত লোকদের সম্বোধন করে বলতে থাকেন, "ভাইসব! আমরা তোমাদের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট। তোমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কোন অভিযোগ আমাদের নেই। আমরা যারা এখান থেকে চলে যাচ্ছি কোন বৃহত্তর কল্যাণকে সামনে রেখেই তথা বিশেষ সমস্যার কারণেই যাচ্ছি এবং তোমাদের ফতেহ খানকে আমি খলীফা নিযুক্ত করে যাবো। ওশর বাবদ যে খাদ্যশস্য তোমরা সবাই আমাদের দিতে,—এখন থেকে তা তাকে দেবে এবং শরী'আতের যে সব হুকুম-আহকাম ফতেহ খান তোমাদেরকে শিক্ষা দেবে তা কবুল করবে; কোন ব্যাপারেই তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক আচরণ করবে না। ভারতবর্ষ থেকে কোন লোক এদিক দিয়ে যদি কখনো আসে তবে তাদের খাতির-যত্ন করবে এবং কোন ভাবেই তাদের কষ্ট দেবে না।"

এভাবে তিনি তাদের ভালোভাবে বুঝিয়ে সুজিয়ে বিদায় করেন। তিনি 'আসরের সালাত আদায়ের পর মসজিদে বসেন। সর্দার ফতেহ খানও সে সময় বর্তমান ছিলেন। তিনি তাঁর নিজের হাতে খান সাহেবকে খির্কা পরিয়ে দেন, নিজের হাতে পাগড়ী বেঁধে দেন এবং খেলাফতনামা লিখিয়ে দেন।

রওয়ানা হবার পূর্বে তিনি তাঁর সাথীদের এবং স্থানীয় মুসলমানদের একত্র করে বলেনঃ ভাই সব! আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এই

'ইবাদত (জিহাদ)-এর মধ্যে শরীক করেছেন এবং তোমরা একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই এ পথের ঠাণ্ডা ও গরম আবহাওয়াকে বরদাশত করেছো। তোমরা সাহায্য ও সাহচর্যের হক আদায় করেছো। এখন আমরা এদেশ থেকে দূরদরাজ দেশের ইচ্ছা পোষণ করছি; স্বয়ং আমিও জানি না যে, কোথায় যাবো। সফরকে শাস্তির অন্যতম টুকরো বলা হয়েছে। বিশেষত এ সফর পাহাড়ী এলাকায়। এতে খানা-পিনার তকলীফ অবশ্যই হবে,---প্রিয় পরিচিত জিনিস এবং অনেক অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে। এজন্য সেই ব্যক্তিই আমাদের সাথে যেতে পারে যে ধৈর্য ও স্থৈর্যের জন্য প্রস্তুত এবং মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে মুখে এতটুকু অভিযোগও যে উচ্চারণ করবে না। আমি এখন থেকেই সতর্ক ও সাবধান করে দিচ্ছি যে, কষ্ট ও যন্ত্রণা সামনে এসে দেখা দিতেই যেন কেউ এমন না বলে যে, সৈয়দ সাহেব আমাদের ধোঁকা দিয়েছেন কিংবা আমাদের জানা ছিলোনা যে, এত বেশী তকলীফ সামনে দেখা দেবে। অতএব যে ব্যক্তি সবর ও দৃঢ়তার শক্তিতে শক্তিধর কেবলমাত্র সেই যেন এতে শরীক হয়।

পাঞ্জেতার থেকে বালাকোট পর্যন্ত

১২৪৬ হিজরীর রজব মাসে সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (রহ) রওয়ানা হবার কথা ঘোষণা করেন। পথিমধ্যে দৌহিত্র সৈয়দ মূসা ইবন সৈয়দ আহমদ আলী শহীদের সাথে মুলাকাত হয়। তার অবস্থা ছিলো মুমূর্ষু। সে সৈয়দ সাহেবের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলো। সৈয়দ সাহেব স্নেহের খাতিরে তার নিকট একদিন অবস্থান করেন, পরের দিন রাস্তায়ই তিনি তার ইন্তেকালের সংবাদ পান।

এরই মধ্যে কয়েকবার তাঁকে হিজরতের অভিপ্রায় থেকে নিবৃত্ত করবার জন্য চেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু তিনি অত্যন্ত সৌজন্য ও বিনয়ের সাথে অনুরোধ রক্ষায় অক্ষমতা প্রকাশ করেন; বরং ঐ সব বিদ্রোহী ও গাদ্দার-দেরকে বিভিন্ন তোহফা ও হাদিয়া প্রদানপূর্বক বেশ খাতিরদারীর সাথে বিদায় করেন।

পথিমধ্যে সৈয়দ সাহেব বিভিন্ন স্থানে ওয়াজ-নসীহতও করতে থাকেন। এতে জিহাদ ও হিজরতের ফযীলত এবং এতদ্‌সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে যে সব সুসংবাদ, পুরস্কার ও মেহমানদারীর প্রতিশ্রুতি রয়েছে তা

বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতেন। তাতে মুহাজিরীন ও মুজাহিদীনের মনে এক নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা ও জোশের সৃষ্টি হতো।

বুজঢেরী থেকে রওয়ানা হবার একদিন পূর্বে তিনি লোকজনকে সম্বোধন করে বলেন যে, ভাইয়েরা আমার! কাল প্রত্যূষে অগ্রযাত্রা শুরু করা হবে। হুশিয়ার থাকবে এবং যাদের প্রয়োজনীয় কাজ রয়েছে এর পূর্বেই তা সেরে নেবে। এরপর উক্ত মজলিসে বহুক্ষণ ধরে হিজরত ও জিহাদের ফযীলত এবং মুজাহিদ ও শহীদগণের বুলন্দ মরতবার কথা বর্ণনা করেন। বক্তৃতা শুনে উপস্থিত-ব্যক্তিদের অন্তর-মানসে এক নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়; সফরের কষ্ট-তকলীফ সব তারা বিস্মৃত হয় যেমন মৃতপ্রায় ক্ষেত পানি সিঞ্চনে লকলকিয়ে ওঠে।

হিজরতের এ রাস্তাটিও আপন দুরুহ অনতিক্রমতা ও কষ্ট-ক্লেশের দিক দিয়ে সে রাস্তা থেকে কোন অংশে কম ছিলো না, যে রাস্তা দিয়ে ইতিপূর্বে মুহাজিরবর্গ প্রথমে এখানে এসেছিলেন। তাদের রাস্তায় পুনরায় পাহাড় এসে দেখা দেয়, যা অতিক্রম করা মোটেই সহজসাধ্য ছিলো না। কতক স্থানে দিনের বেলায়ও কঠিন ঠাণ্ডার মুকাবিলা করতে হয়। পরিশ্রম ও খাটুনির সাথে অর্ধাহার ও অনাহারের দুর্ভোগও পোহাতে হয়। কিন্তু সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) স্বীয় সঙ্গী-সাথীদের বরাবরের মতো পুরস্কার ও ছওয়াব প্রাপ্তির আশা-ভরসা দিতেন, তাদের মনোবল বাড়িয়ে দিতেন এবং জিহাদের রাস্তায় সর্ব-প্রকারের কষ্ট-তকলীফকে হাসিমুখে বরদাশ্ত করবার জন্য উৎসাহিত করতেন। তদুপরি নিজেও সুখে-দুঃখে তাদের সাথে শরীক হতেন। সে দিনগুলোতে তাঁর চেহারা খুশী ও আনন্দের আভায় ঝলমলিয়ে উঠতো। এমন মনে হতো যেন তিনি আরাম-আয়েশের মধ্যে রয়েছেন এবং অত্যন্ত আগ্রহ-উদ্দীপনা সহকারে নিজের প্রকৃত বাসার দিকে পাখা মেলেছেন। নিজের চরিত্র-ব্যবহার, প্রীতি ও স্নেহ এবং মিষ্টি-মধুর কথায় সবাইকে তিনি নিজের ঘনিষ্ঠ ও পরিচিত করে তুলতেন এবং তাদের সাথে সদয় ব্যবহার ও প্রেমপূর্ণ আচরণ করতেন। বিভিন্ন দেহাত ও কস্‌বায় কয়েকদিন অবধি অবস্থান করতেন এবং সেখানকার স্থানীয় ঝগড়া-বিবাদ, উপ-জাতীয় ও গোত্রীয় বিভেদ নিঃশেষে মিটিয়ে দিতেন আর লোকদের দাওয়াত দিতেন জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌র। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের অদৃশ্যলোক থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করতেন। স্থানে স্থানে তাদের যিয়াফত হতো এবং

'ইযযত ও মুহব্বতের সাথে তাদের মেহমানদারী করা হতো। ইসলামী জীবন, সাম্য, কুরবানী, পারস্পরিক সহমর্মিতাবোধ ও সাহায্য-সহায়তা নেকী ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে পুরোপুরি শান-শওকতের সাথেই এখানে দেদীপ্যমান ছিলো।

পথিমধ্যেই তিনি খবর পেয়ে গিয়েছিলেন যে, যে মুহূর্তে তিনি পাঞ্জেতার পরিত্যাগ করেন তার পরপরই হাজারার শাসনকর্তা হরি সিংহ পঁচিশ হাজার পদাতিক সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হয় এবং সিন্ধুনদ পার হয়ে সেখানকার গ্রামবাসীদের হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ, লুটতরাজ ও মারধরের শিকারে পরিণত করে এবং তার সৈন্যবাহিনী একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলিম মেয়ে ও মহিলাকে অপহরণ করে।

সৈয়দ সাহেব কাশ্মীরের পথে পড়ে এমন একটি ঘাটিতে তশরীফ রাখেন এবং তার পাহারাও সুদৃঢ় করার ব্যবস্থা করেন।

রাজদোয়ারী নামক মৌজায় অধিকাংশ গাযী সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর হাতে আসহাবে সুফ্‌ফাহ্‌র ন্যায় বায়'আত করেন। উক্ত বায়'আতে এই অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি ছিলো যে, তারা নিজেদের ছোট-বড় সকল দরকারী বিষয়াদি একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারও নিকট চাইবে না এবং যে সকল কথা নিজের ক্ষেত্রে দূষণীয় ও অপসন্দনীয় মনে করা হবে তা অন্য কোন মুসলমানকে বলবে না; নিজের প্রয়োজনের মুকাবিলায় মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজনীয়তাকে অগ্রাধিকার দেবে এবং যে জিনিস নিজের জন্য পসন্দনীয় মনে করবে ঠিক সেটি অন্য মুসলমানের জন্যও পসন্দ করবে।

এই পাহাড়ী এলাকাতে শিখদের মারধর, জুলুম-নির্যাতনের তছনছ হবার কারণে অত্যন্ত অস্থির ও অনিশ্চিত অবস্থা বিরাজ করছিলো। শিখেরা এই এলাকার আমীর-ওমরা ও উপজাতীয় সর্দারদের পরস্পরের সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে দিতো। কতক সর্দারকে তাদের নিজস্ব এলাকা ও রাজ্য থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিলো। অতঃপর এই সব লোক সৈয়দ সাহেবের সাথে এসে মিলিত হয়।

কাশ্মীরকে হস্তগত ও তার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং তাকে জিহাদী দাওয়াতের কেন্দ্রভূমি বানাবার জন্য এইসব শক্তির মধ্যে ঐক্য ও সংহতির প্রয়োজন ছিলো। বালাকোট যা কাগান উপত্যকার নিকটেই অবস্থিত ছিলো এবং তিন দিক পাহাড় দ্বারা ছিলো বেষ্টিত, —এতদুদ্দেশ্যে চলাচলের অতি উত্তম কেন্দ্র হতে পারতো। প্রকৃতি তাকে একটি সুদৃঢ় দুর্গের রূপদান

করেছিলো। অতএব এ জায়গাটিকেই মুজাহিদ বাহিনীর কেন্দ্র বানানোর পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সৈয়দ সাহেব মওলানা মুহাম্মদ ইসমা'ঈলকে সেখানে রওয়ানা হবার নির্দেশ দেন। মওলানা ইসমা'ঈল আপন সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে দুপুর সময় ভূগড়মঙ্গ থেকে বালাকোট অভিমুখে রওয়ানা হন। পথ চলতে চলতে পাহাড়ের উঁচু শৃঙ্গ সামনে এসে পড়ে। সেখানে কয়েকটি ঝরনাধারা প্রবাহিত ছিলো। জোহরের ওয়াক্তও এসে গিয়েছিলো। সবাই ওযূ করে সেখানেই সালাত আদায় করেন। অতঃপর তাঁরা কাতারবদ্ধ অবস্থায় পাহাড়ে উঠতে থাকেন। পাহাড় তুষারাচ্ছাদিত থাকার কারণে তা সাদা সীসার ন্যায় মনে হচ্ছিলো। তাঁরা গোজর পেয়ালের চপপল পরে বরফের উপর চলছিলেন। তাঁদের চলার কারণে বরফের উপর চিহ্ন সৃষ্টি হচ্ছিলো এবং এই চিহ্ন ধরেই সবাই আগে পিছে পথ চলছিলো। ইতিমধ্যে মেঘ এসে দেখা দেয়, দেখা দেয় বরফের গুড়ি বৃষ্টি। 'আসরের শেষ ওয়াক্তে বরফ বৃষ্টি বন্ধ হয় এবং সূর্য দেখা যেতে থাকে। লোকজন তৎক্ষণাৎ তাড়াতাড়ি ঐ বরফ দিয়েই ওযূ করে যে যেখানেই সুযোগ পেলো সেখানেই সালাত আদায় করে নেয়। কেউবা একা, কেউ জামাতবদ্ধ অবস্থায়, কেউবা গিরিশৃঙ্গে মাগরিব আদায় করে, আবার কেউবা গিরিগুহায় ও গিরিপথে। সেই মুহূর্তে লোকেরা রম-যানের চাঁদও দেখে।

সেখান থেকে পাহাড়ের ঢালু শুরু হয়। অধিক বরফপাতের কারণে পাহাড়ের উঁচু-নীচু সমান হয়ে গিয়েছিলো। রাস্তার ঠিক-ঠিকানা কিংবা নাম-নিশানা কিছুই মিলছিলো না। সবাই অনুমান করে পথ চলছিলো এবং জায়গায় জায়গায় একে অপরের উপর পা পিছলে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিলো। যে দু'চার বার পিছলে পড়ছিলো পুনরায় চলবার শক্তি তার নিঃশেষিত হচ্ছিলো। বোঝা বহনের যে কয়েকটি খচ্চর গোলাবারুদ ইত্যাদি দ্বারা ভর্তি ছিলো সেগুলিও ছুটে যায়। ঠিক এমনি সময়ে কয়েকজন চীৎকার করে আওয়াজ দেয় যে, মওলানা মুহাম্মদ ইসমা'ঈল সাহেব পড়ে গেছেন। একথা শোনা মাত্র সমস্ত লোকজন শোকে-দুঃখে কাঁদতে থাকে। পাহাড়ের প্রান্তদেশে গোয়ালাদের কয়েকটি ঘর ছিলো। নাসির খানের সাথী গোয়ালারা নিজস্ব বুলিতে স্থানীয় গোয়ালাদের ডাক দেয় যে, জলদী দৌড়াও! গাযীবৃন্দ বরফের মধ্যে পড়ে গেছে; তাদেরকে উঠাও।

বালাকোটে

১২৪৬ হিজরীর ৫ই জিলকদ তারিখে হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) স্বীয় সৈন্যবাহিনীসহ বালাকোট রওয়ানা হন।

এদিকে বালাকোটে ফজরের সালাত আদায়ের পর মওলানা মুহাম্মদ ইসমা'ঈল (র) সকল লোকজন নিয়ে সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর অভ্যর্থনায় এগিয়ে আসেন। পাহাড় থেকে অবতরণ করে তিনি বিস্তিনী মৌজার ঝরনার ধারে এসে উপনীত হন। সেখানেই মওলানা ইসমা'ঈল (র) ও অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে সৈয়দ সাহেবের মুলাকাত হয়। সকলে একত্রে বালাকোটে প্রবেশ করেন। বস্তির খান ওয়াসিল খান তাঁর জন্য নিজের বাড়ী খালি করে দেন এবং সেখানে তিনি অবতরণ করেন। অপরাপর লোকজন বস্তির অন্যান্য ঘরে আশ্রয় নেয়।

বালাকোট কাগান উপত্যকার দক্ষিণ মুখে অবস্থিত। এখানে পৌঁছে উপত্যকাকে পাহাড়ী প্রাচীর বন্ধ করে দিয়েছে। কুনহার নদীর উৎস প্রবাহ ছাড়া আর কোন রাস্তা নেই। পাহাড়ের দুই প্রাচীর সমান্তরাল রেখায় চলে গেছে। মধ্যভাগ খালি, যার প্রশস্ততা আধা মাইলের বেশী নয়। খালি জায়গা দিয়েই কুনহার নদী বয়ে গেছে।

বালাকোটের পূর্বে কালু খানের সুউচ্চ টিলা অবস্থিত। এর শৃঙ্গের উপর কালু খান গ্রাম। পশ্চিম দিকে মাটিকোট নামক টিলা অবস্থিত, যা অত্যন্ত উচ্চ। টিলার উত্তর অংশের শৃঙ্গে মাটিকোট গ্রাম যার সম্পর্কে প্রবাদ রয়েছে—"মাটিকোট যার, বালাকোট তার।" একটি পুরনো চিকন ও সরু একপায়ে পথ দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে পাহাড়ের মধ্য থেকে মাটিকোটের টিলার উপর গিয়ে পৌঁছায়। মওলবী সৈয়দ জা'ফর আলী সাহেব লিখে-ছেন যে, একটি রাস্তা—যা ভারতবর্ষের প্রাচীন সুলতানদের পাহাড় কেটে তৈরী করা, উক্ত শৃঙ্গ পর্যন্ত যেতো—কালের বিবর্তনে সেখানে বড় বড় গাছ গজিয়ে ওঠে এবং পরে জঙ্গলে পরিণত হয়। পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া পাথর উক্ত রাস্তাটিকে খারাপ করে দিয়েছিলো। স্থানীয় লোকজনের কিন্তু উক্ত রাস্তার সাথে পরিচয় ছিলো।

বালাকোটের উত্তর দিকে তিনটি টিলা একত্রে মিলে একটি প্রাচীর নির্মাণ করেছিলো। সেটি বালাকোটের উত্তর ও পশ্চিম কোণ থেকে শুরু

হয়ে উত্তর ও পূর্ব কোণ পর্যন্ত চলে গেছে। পশ্চিম দিকে সিত বেনের টিলা। তার উপর ঐ নামেই একটি বসতি আছে।

দক্ষিণ দিকে কুনহার উপত্যকা যা কাগান থেকে বেরিয়েই বালাকোটের নিকটে দক্ষিণ ও পশ্চিম অভিমুখে চলে গেছে।

বেষ্টিত সীমানার ঠিক মাঝখানেই একটি টিলা অথবা প্রাকৃতিক ঢিবি যার উপর বালাকোট কসবাটি গড়ে উঠেছে। টিবির উত্তর-পশ্চিম দিকে মাটির লেবেল পর্যন্ত ঘরবাড়ী চলে গেছে এবং সাধারণ পাহাড়ী বসতি-গুলোর মত স্তরে স্তরে বিন্যস্ত অর্থাৎ নীচের ঘর-বাড়ীগুলোর ছাদ উপরের বাড়ী-ঘরগুলোর আঙ্গিনা।

শেরসিংহ কুনহার নদীর পূর্ব কিনারে বালাকোট থেকে দুই-আড়াই ক্রোশ দূরে স্বীয় সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাঁবু ফেলে অবস্থান করছিলো। ওয়াকায়ে' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, লোকজন বালাকোট থেকে তাদের তাঁবু ডেরা দেখছিলো। শেরসিংহের জন্য বালাকোটের উপর আক্রমণ পরিচালনা করার রাস্তা মাত্র দু'টোই হতে পারতো; প্রথমত, তারা পাহাড়ের উপর উক্ত পুরনো সরু একপায়ে পথ দিয়ে উপরে উঠতো—যা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের পাহাড়গুলো থেকে মাটিকোটের টিলার উপর গিয়ে পৌঁছেছে এবং মাটিকোটের টিলার উপর পৌঁছে নীচে অবতরণ করতো। এ রাস্তা স্থানীয় ওয়াকিফহাল কোন লোকের পথ প্রদর্শন ব্যতিরেকে অতিক্রম করা যেতো না। তদুপরি এ রাস্তা দিয়ে ভারী সাজ-সরঞ্জাম এবং কামান নিয়ে যাওয়াও ছিলো অসম্ভব।

দ্বিতীয়ত, কুনহার নদীর পূর্ব তীর ধরে বালাকোটের সামনে পৌঁছুতো। এ রাস্তা তুলনামূলকভাবে সহজ ছিলো। উক্ত দু'টো রাস্তার হেফাজত ও আগমন বন্ধ করে দেবার প্রয়োজন ছিলো এবং সৈয়দ সাহেব বালাকোট পৌঁছেই এর বন্দোবস্ত করেন।

'ওয়াকায়ে' আহমদী'তে বর্ণিত হয়েছে যে, ঐ এলাকার একজন লোক এসে খবর দেয় যে, আজ শিখদের লোকজন এপারে অবতরণ করার জন্য নদীর উপর কাঠের পুল নির্মাণ করছে। এ খবর শুনতেই তিনি হাবীবুল্লাহ খানকে বললেন যে, এই নদীর খাড়ির উপর তো আমাদের আমানুল্লাহ্ খান মোতায়েন আছে। এছাড়া আসবার আর কোন রাস্তা আছে কি? তারা বললো যে, হাঁ! আরও একটি সরু একপায়ে পথ আছে, যেখানে মির্জা

---

১. সীরতে সৈয়দ আহমদ শহীদ—থেকে সংক্ষিপ্তকরণ, পৃষ্ঠা ৩৬৮-৬৯, ২য় খণ্ড।

আহমদ বেগ পাহারারত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, রাস্তাটা কি শিখেরা জানে ও চেনে? হাবীবুল্লাহ খান প্রত্যুত্তরে 'শিখেরা তা জানেও না এবং চেনেও না' বলে জানায়। সাথে সাথে এও জানায় যে, এ দেশেরই কোন গুপ্ত-সন্ধানী ঘুষ খেয়ে তাদেরকে নিয়ে আসলে আসতে পারে। একথা শুনে তিনি বললেন, আশংকার কারণ নেই। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সঙ্গে আছেন।

এরই পরের দিন গুপ্তচর এসে খবর দেয় যে, আজ শিখ সৈন্যবাহিনী নদীর এপারে অবতরণ করছে, কিন্তু এদিকে আসছে না-অন্যদিকে যাচ্ছে। তিনি শুনে বললেন,—উত্তম! সৈন্যবাহিনী এদিকে আসুক কিংবা অন্য কোথাও যাক, এতে ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের রক্ষক ও মদদগার। অতঃপর সন্ধ্যা অবধি জানা গেলো না যে, নদী পারে অবতরণ করে সৈন্যবাহিনী কোথায় গেলো।

এর পরের দিন জোহরের শেষ ওয়াক্তে মির্জা আহমদ বেগের পাহাড়ের উপর অনবরত বন্দুকের শব্দ শোনা যেতে থাকে। এদিকে সকল গাযী ও মুজাহিদ সতর্ক ও হুশিয়ার হয়ে যায় এবং বলতে থাকে,—দেখতো, গুলী চলছে কেন? ইত্যবসরে পাহাড়ের উপর স্থানে স্থানে গুজর বা গোয়ালা সম্প্রদায়ের লোকজন চীৎকার করতে থাকে যে, শিখদের সৈন্যবাহিনী এসে গেছে। সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) বললেন,—কিছু লোক দ্রুত আহমদ বেগের সাহায্যে চলে যাও এবং তাকে সেখান থেকে এদিকে নিয়ে এসো; সেখানে যেন তাদের মুকাবিলা না করে। ইবরাহীম খয়েরাবাদী ছিলো পতাকাবাহী এবং তার সমকক্ষ ফরযউল্লাহ্ শেদীকে নির্দেশ দেওয়া হলো যে, তুমি নিশান নিয়ে যাও। তার পেছনে সৈয়দ আল্লাহ্ নূর শাহ বেলায়েতীকে জামা'আতসহ এবং তাঁর পেছনে তিনি (সৈয়দ সাহেব) আরও একটি নিশান প্রেরণ করেন। তাঁর সাথেও কিছু লোক ছিলো। এই চার নিশানের সঙ্গে দু'শোর কিছু বেশী লোক হবে। এক প্রহর দিন ছিলো—সবাই গিয়ে মাটিকোটে হাযির হয়। এদিক থেকে মির্জা আহমদ বেগ স্বীয় জামা'আতসহ এসে পেঁছায় এবং বলতে থাকে,—এখন আর এগিয়ে গিয়ে কি করবে। সেখানে তো শিখদের বাহিনী এসে গেছে।

বালাকোটের শাহাদাতগাহ

ইত্যবসরে লোকজন এসে সৈয়দ বেরেলভী (র)-কে পরামর্শ দেয় যে, বালাকোট থেকে সরে গিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে এসে যান। এর ফলে

আক্রমণরত বাহিনী নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে কামিয়াব হতে পারবে না। এ ধরনের কথা শুনে তিনি বললেন যে, কাফিরদের সাথে চুরি করে লড়াই করা আমার ইচ্ছা নয়।১ আমি এই বালাকোটের পাদদেশেই তাদের সাথে লড়বো। এই ময়দানই লাহোর আর এখানেই বেহেশ্‌ত এবং বেহেশতকে আল্লাহ্ রাব্বু'ল-'আলামীন এমনই উত্তম জিনিস বানিয়েছেন যে, সমগ্র দুনিয়ার রাজত্বও তার সামনে কোন গুরুত্বই রাখে না।

আমি তো এটাই চাই যে, সমগ্র দুনিয়ার চেয়েও প্রিয় যে জিনিস তাকেই আমি মহান স্রষ্টা ও প্রভুকে নযরানা দিয়ে তাঁর রিযামন্দী হাসিল করি। আমার জীবনকে তাঁরই রাস্তায় কুরবান করাকে তো আমি এমনি মনে করি যেমন কেউ একটি খড়কুটা ভেঙে টুকরো করে দূরে ছুড়ে ফেলে দেয়।

এরূপ সলা-পরামর্শের ভেতর দিয়েই দু'ঘন্টা -আড়াই ঘন্টা রাত কেটে যায়। সে সময়ই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, নদীর পুল ভেঙে গাযীদের পাহারা উঠিয়ে আনা হোক। অতএব তাই করা হলো।

'ইশার সালাত আদায়ের পর তিনি মোল্লা লাল মুহাম্মদ কান্দাহারীকে বললেন,—ভালো কথা! তুমি সিতবেনীর ঝরনা পার হয়ে এবং পাহাড়ের উপরে গিয়ে শিখদের উপর এই রাত্রিকালে অতর্কিতে হামলা চালাতে পারবে? সে বলল, হাঁ! কেন পারবো না! কিন্তু শর্ত এই যে, আপনাকেও এখানে একাকী রেখে যাবো না; নিজের জীবনের সাথে রাখবো মিশিয়ে। কেননা এতগুলি বছর এদেশে থেকে এখানকার লোকদের অবস্থা ও চরিত্র খুব ভালো ভাবে দেখে নিয়েছি। এদের চরিত্র থেকে মুনাফিকী দূর হওয়া অত্যন্ত মুশকিলের ব্যাপার। শিখদের যে সৈন্যবাহিনী পাহাড়ের উপর এসেছে তাদেরকেও এদেশেরই কোন লোক এনেছে। নইলে তাদের সাধ্য কি ছিলো যে, তারা এখানে আসতে পারে?

১, যুদ্ধের এক পর্যায়ে এমন একটি সময় অবশ্যই আসে যে, চূড়ান্ত যুদ্ধ ও দৃঢ়তা প্রদর্শনের প্রয়োজন হয়। সৈয়দ সাহেবও এক্ষেত্রে পুরোপুরি মুকাবিলার সিদ্ধান্তই নেন। ব্যাহত বালাকোট পরিত্যাগ করে চলে যাবার পরামর্শ বোধগম্য ও যুক্তিপূর্ণ বলেই মনে হয়। কিন্তু অধিকতর গভীর দৃষ্টি এবং একজন তেজস্বী বীর বাহাদুরের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে এ পরামর্শ গ্রহণযোগ্য এবং এ কৌশল কার্যকরী ছিলো না। এর পরিণতি শুধু এই হতো যে, আপাতত এবং সাময়িকভাবে সৈন্য-বাহিনীর জীবন বেঁচে যেতো কিন্তু শিখেরা বালাকোটের গোটা বস্তি ধূলোয় মিশিয়ে দিতো এবং নিরীহ ও নিষ্পাপ অধিবাসীদেরকে তলোয়ারের তলায় নিক্ষেপ করতো।

তিনি বললেনঃ তুমি সত্যই বলেছো। বাস্তবেও ব্যাপারটা তাই। এতগুলি বছর আমরা তাদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রচেষ্টা ও কঠোর মেহনত করলাম। আমার সাধ্যে কুলোয় এমন কোন চেষ্টারও কসূর করিনি। ভারতবর্ষে এবং তুর্কিস্তানে নিজের প্রতিনিধিদের পাঠিয়েছি। তারাও তাদের দা'ওয়াত ফী সাবীলিল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে কোনরূপ অলসতার প্রশ্রয় দেয়নি এবং আমরাও যেখানে যেখানে গেছি সেখানকার লোকদেরকে সকল উপায়ে ওয়াজ-নসীহতের দ্বারা বুঝিয়েছি। কিন্তু তোমরা কতিপয় ব্যতীত কেউ আমাদের সাহায্য ও সহায়তায় এগিয়ে আসেনি; বরং আমাদের উপর নানা ধরনের অপবাদ চাপিয়েছে। আমাদের সেক্রেটারীরাও এখন চিঠি লিখতে লিখতে থমকে গেছে--আর আমরাও পাঠাতে পাঠাতে হাপিয়ে গেছি। অথচ কোন ফল হয়নি। এখন এটাই ভালো যে, আমাদের গাযীদের পাহারা থেকে উঠিয়ে আমাদের কাছে ডেকে আনি। আগামীকাল ভোরে এই বালা-কোটের পাদদেশে আমাদের এবং কাফিরদের সম্মুখ সমর। যদি আল্লাহ্‌ পাক আমাদের ন্যায় দুর্বল বান্দাদেরকে তাদের উপর জয়যুক্ত করেন তাহলে এগিয়ে গিয়ে লাহোর দেখে নেবো।—আর যদি শহীদ হয়ে যাই তবে জান্নাতু'ল-ফিরদাউসে গিয়েই আরাম করবো।

এ সময় সকল লোকজনই ছিলো নিঃশব্দ জগতের অধিবাসী। কেউই কোন উচ্চ-বাচ্য করছিলো না। অতঃপর তিনি মাটিকোট থেকে সকল গাযীকে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে আসেন।

তিনি সব গাযীদের সম্বোধন করে বলতে থাকেনঃ ভাইয়েরা আমার! আজকের রাতটা আল্লাহ্‌ রাব্বু'ল-'আলামীনের দরবারে পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে তওবাহ ও ইস্তেগফার করো এবং নিজেদের গোনাহর জন্য ক্ষমা চাও। এটাই বিদায়ের লগ্ন। কাল ভোরে কাফিরদের সঙ্গে মুকাবিলা। আল্লাহ্‌ই জানেন, আমাদের ভেতর কে জীবিত থাকবে আর কার ভাগ্যে শাহাদত লাভ জুটবে।

যখন এ কথা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, শিখ সৈন্য-বাহিনী মাটিকোট থেকে অবতরণ করেই বালাকোটের উপর হামলায় উদ্যত হবে—তখন একটি কার্যকর ও ফয়সালামূলক যুদ্ধের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা-পনা সম্পন্ন করা হয়। কস্‌বার অবস্থানস্থল এবং যুদ্ধের ময়দানের প্রাকৃতিক অবস্থা মুজাহিদ বাহিনীর অনুকূলে ছিলো। এ থেকে পুরোপুরি ফায়দা

হাসিলের চেষ্টা করা হয়। হামলাকারীরা মাটিকোট থেকে অবতরণ করতেই এবং কস্‌বার উপর হামলা করবার পূর্বেই (যা উচ্চে অবস্থিত ছিলো) এই নীচু ময়দানের মুখোমুখি পড়তে হতো যা ছিল টিলা এবং কসবার মাঝখানে অবস্থিত। নীচু ময়দানে ছিলো ধানের ক্ষেত। সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-র নির্দেশে সেখানকার ঝরনার পানি ছেড়ে দেওয়া হয় যেন সমতল ময়দান দলদলে ভূমিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়, যা পার হওয়া এবং সেখানে যুদ্ধ ব্যবস্থাপনা কায়েম রাখা হামলাকারীদের জন্য কঠিন ও দুঃসাধ্য হয়। এর বিপরীতে মুজাহিদ বাহিনীর যারা কসবার উচ্চতার উপর পজিশন নিয়েছিলে---যেন দুশমনের উপর হামলা করা সহজসাধ্য হয় এবং হামলা-কারীরা যেন অতি সহজেই তাদের গুলীর আওতায় এসে যায়।

এসব কলাকৌশল ছাড়াও বিভিন্ন ব্যূহে যেখান থেকে শিখ বাহিনীর চাপ ও শক্তি প্রয়োগের আশংকা ছিলো---মুজাহিদ বাহিনীর বিভিন্ন জামা'আত নিয়োগ করা হয়। অধিকাংশ ব্যূহ ছিলো সিতবেনের ঝরনার উপর, যা বালাকোটের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত এবং মাটিকোট থেকে অবতরণত সৈন্যবাহিনীর ঐদিক থেকে বালাকোটের উপর হামলা করার অধিকতর আশংকা ছিলো। এখানে সকলের আগের ব্যূহ ছিলো সিতবেনের ঝরনা ও টিলার মাঝখানে অবস্থিত মোল্লা লাল মুহাম্মদের ব্যূহ। সেখান থেকে পর্যায়ক্রমে কস্‌বার দিকে মওলানা মুহাম্মদ ইসমা'ঈল (র) এবং শেখ ওলী মুহাম্মদ সাহেবের ব্যূহ ছিলো, এরপর ছিলো নাসির খান ও হাবীবুল্লাহ খানের ব্যূহ।

কসবার তিনটে মসজিদে এবং সম্ভাব্য ও প্রয়োজনীয় জায়গাগুলোতেও ব্যূহবন্দী করা হয়।

'ওয়াকায়ে' আহমদী' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, বালাকোটের পশ্চিম দিকে মাটিকোট। তার পাদমূল সিড়ির মতো ঢালু ছিলো। সেখানে ধান বপন করা হতো। হযরত আমীরু'ল-মু'মিনীনের অনুমতিক্রমে উক্ত যমীনে ঝরনার পানি রাতের বেলায় ছেড়ে দেওয়া হয়।

বালাকোটে মসজিদ ছিলো তিনটি। বস্তির মধ্যখানে একটি মসজিদ ছিলো বড়, যেখানে সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) সালাত আদায় করতেন। আর একটি মসজিদ ছিলো এই মসজিদ থেকে অল্প দূরে এবং অপরটি বালা-কোটের নিম্নদেশে ঢালুতে ছিলো। সুতরাং সৈয়দ আহমদ বেরেলভী

(র) রাতের বেলায় নিজের সকল গাযীদের লক্ষ্য করে বলেন যে, যার কাছে যা কিছু খড়ি-কাঠ অথবা পাথর আছে তা দিয়ে নিজের নিজের ঠিকানায় লড়াইয়ের জন্য বাঁক বানাবে। এরপর তিনি সবাইকে নিজের কাছ থেকে বিদায় করে দেন। তখনই যেয়ে লোকেরা বস্তিবাসীদের দরজার তক্তা, লাকড়ী, পাথর ইত্যাদি এনে নিজের বাঁক বানিয়ে ফেলে এবং পাহারা-ফাঁড়ির বন্দোবস্ত করে শুয়ে পড়ে।

সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) মসজিদ থেকে নিজের ডেরায় তশরীফ রাখেন, খাবার খান এবং নিজের কাপড়-চোপড় ও অস্ত্র চেয়ে পাঠান। তিনি চারটে কাপড় মুনশী খাজা মুহাম্মদ হাসানপুরীকে এই বলে পাঠিয়ে দেন যে, তিনি যেন কাল ফজরে এই কাপড় পরিধান করে মুকাবিলার উদ্দেশ্যে বহির্গত হন। তিনটি কাপড় হাকীম কামরুদ্দীন ফুলতীকে পাঠিয়ে দেন যেন তিনিও কাল ফজরে এই কাপড়ই পরিধান করেন। একটি আলখাল্লা, একটি হালকা জামা, নীল রংয়ের পাগড়ী, একটি কাশ্মিরী শাল, একটি কোমরবন্দ, সাদা পায়জামা—এই কয়টা কাপড় নিজের জন্য রাখেন। অস্ত্র-শস্ত্রের মধ্য থেকে একটি ছোট বন্দুক, একটি বিলেতী ছুরি, ভারতীয় তলোয়ার একটি ও ছোট তরবারী একটি—মোট চারটে হাতিয়ার রাখেন। এরপর তিনি সবাইকে বললেন যে, এখন যে যার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ো, আমি শুয়ে পড়ছি।

মিঞা 'আবদুল কাইয়ূম বলেন ঃ সেই রাত এত ভয়াবহ ছিলো যা বর্ণনার বাইরে। আকাশ ছিলো মেঘে ঢাকা আর বৃষ্টি হচ্ছিলো গুড়ি গুড়ি। সন্ধ্যা থেকে ভোরবেলা পর্যন্ত জীবজন্তু ও পশু-পাখী শোরগোলে মাতিয়ে তোলে। স্বয়ং উক্ত বস্তির লোকেরা আমাদের বলছিলো যে, আমরা একের পর এক ভয়াবহ অন্ধকার রাতও দেখেছি। কিন্তু এমন উদাস ও ভয়াবহ রাত কখনও দৃষ্টিগোচর হয়নি।

মিঞা লাল মুহাম্মদ জগদীশপুরী বলেন ঃ বালাকোট যুদ্ধের কয়েকদিন আগে থেকেই বিদ্যুতের মতো এক ধরনের লাল ধূলো-ধূয়ায় ছেয়ে গিয়েছিলো এবং লোকজনকে ভীত-বিহ্বল ও উদাসীন মনে হচ্ছিলো। তারা কখনো এরকম ধুয়া দেখেনি। গাযীদের ভেতরও এর আলোচনা চলে। কাযী 'আলাউদ্দীন সাহেব এ বিষয়টির প্রতি সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-র দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকেন এবং আসমানের দিকে দেখতে থাকেন। এরপর তিনি বললেন ঃ সম্ভবত আমাদের মুজাহিদ সৈন্য-

বাহিনীর কিছু লোক আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিজেদের জীবন দিয়ে আপন পরম প্রিয়ের সান্নিধ্যে পৌঁছুতে সফলকাম হবে এবং তোমাদের ভেতর থেকে কোন লোক আলাদাও হয়ে যাবে। সামনে কি ঘটবে আল্লাহ্‌ই তা ভালো জানেন।

শাহাদতের প্রত্যূষে

২৪শে জিলকদের (১২৪৬ হিজরী) সুবহে-সাদিক। ফজরের আযান হলো। সকলেই ওযূ করে অস্ত্র-সজ্জিত অবস্থায় হাযির হলো। সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) ইমামতি করলেন। এরপর তিনি অনুমতি দিলেন যে যার জায়গায় গিয়ে সতর্ক ও হুশিয়ার থাকবে। তিনি নিজেও নিজের ডেরায় এসে ওজীফা পাঠে মশগুল হয়ে গেলেন। সূর্য উঠার পর তিনি সালাতু'ল-ইশরাক দু'রাকাত আদায় করলেন। কিছুক্ষণ বিলম্ব করার পর ওযূ করে চোখে সুরমা এবং দাড়িতে চিরুণী লাগান। এরপর পোশাক পরিধান করে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে মসজিদ অভিমুখে রওয়ানা হন। সে-সময় শিখবাহিনী পাহাড় থেকে মাটিকোটের দিকে অবতরণ করছিলো। লোক-জন এর প্রতি ইঙ্গিত করে সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর নিকট আরয জানায় যে, শিখ বাহিনী পাহাড় থেকে অবতরণ করছে। তিনি বললেন,— তাদের নামতে দাও। অতঃপর তিনি মসজিদে প্রবেশ করেন এবং এর সম্মুখভাগের ছাদের নীচে বসেন। এক-এক, দুই দুই করে বহু গাযীই সেখানে জমায়েত হয়।

এটা ছিলো সেই মুবারক মুহূর্ত যখন জান্নাত সুসজ্জিত হয়ে চোখের সামনে ধরা দেয়। এমন মনে হচ্ছিলো যে, তাদের চোখের সামনে থেকে পর্দা উঠে গেছে আর বালাকোটের পাহাড়ের পেছন থেকে বেহেশ্‌তের খোশবু তাদের শরীর মনের প্রতিটি তন্ত্রীকে সুবাসিত করে তুলছে।

ইলাহী বখ্‌শ রামপুরী বলেন যে, আমাদের জামা'আতে পাতিয়ালার সৈয়দ চেরাগ আলী নামে এক ব্যক্তি ছিলো। সে তখন ক্ষীর পাকাচ্ছিলো। তার কাঁধে ছিলো কুরাবীন (চওড়া মুখওয়ালা ছোট বন্দুক)। শিখবাহিনী মাটিকোট থেকে নীচে অবতরণ করছিলো। আর সে তার ক্ষীর চামচ দিয়ে জোরে জোরে নেড়ে চলছিলো,—আবার শিখদের দিকে তাকাচ্ছিলো। এ সময় তার অবস্থাই ছিলো অন্য রকম। একবার আসমানের দিকে তাকিয়ে বললো,—ঐ দেখো! একজন হুর কাপড় পরে চলে আসছে। কিছুক্ষণ দেরী

করার পর বলতে থাকে,—দেখো! একজন পোশাক পরে আসছে,—এই বলেই সে চামচ ডেকচীর উপর জোরে আঘাত করে বলে ওঠে—এখন তোমাদেরই হাতের খানা খাবো।—এই বলে সে শিখবাহিনীর অভিমুখে ছুটে যায়। অনেকেই বললো, মীর সাহেব! থামুন, আমরাও যাবো। কিন্তু সে কোনদিকেই বিন্দুমাত্রও ভ্রুক্ষেপ করলো না এবং যেয়েই শিখদের জমায়েতের ভেতর ঢুকে পড়ে ও অত্যন্ত বীরত্বের স্বাক্ষর রেখে শহীদ হয়ে যায়।

এদিকে সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) মসজিদের সম্মুখভাগের তলা থেকে উঠে দাঁড়ান এবং সবাইকে বলেন যে, তোমরা এখানেই থাকো। আমি একলা গিয়ে দো'আ করছি; আমার সাথে কেউ যেন না আসে। অতঃপর সমস্ত লোক-লশকর হাতিয়ার বাঁধা অবস্থায় যে যেখানে ছিলো দাঁড়িয়ে থাকে। তিনি মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন এবং দরোজা-জানালা বন্ধ করে দো'আতে মশগুল হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ বিলম্ব করার পর নিজের থেকেই খিড়কী খুলে তিনি বললেন, আমাকে কে ডাকলো? মুহাম্মদ আমীর খান বলেন,—আমি বললাম এদিক থেকে তো আপনাকে কেউ ডাকেনি। কেননা এদিকে আমি ছাড়া আর কোন মানুষই নেই। একথা শোনার পর তিনি পুনরায় খিড়কী বন্ধ করে দেন। কিছুক্ষণ পর তিনি পুনরায় খিড়কী খোলেন এবং জিজ্ঞাসা করেন,—কেউ আমাকে আওয়াজ দিয়েছে? আমি বললাম, এদিক থেকে কেউ আপনাকে ডাকেনি। মোটকথা,—তিনবার তিনি খিড়কী খুলে সেই একই কথা জিজ্ঞাসা করেন এবং আমিও ঐ একই ভাবে তিনবারই বলি, এদিক থেকে আপনাকে কেউ ডাকেনি। এমত অবস্থা বড় দরোজার দিকেও হয়েছিলো।

শের মুহাম্মদ খান বলেন যে, তৃতীয়বারও তিনি ঐ ডাকার ব্যাপারেই প্রশ্ন করেন এবং লোকেরাও ঐ প্রথমবারের মতো সেই একই জওয়াব দেয়। তিনি মসজিদ থেকে বের হন এবং সত্বর বাইরের দিকে রওয়ানা হন। মসজিদের প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে তিনি বালাকোটের পাদদেশের দিকে অবতরণ করতে থাকেন আর সকল লোকই ছিলো তাঁর পেছনে। নীচে বালুর দিকে একটি মসজিদ ছিলো, গাযীদের একটি বাঁকও এর ভেতরে ছিলো। তিনি এতে তশরীফ নেন।

মিঞা 'আবদুল কাইয়ূমের বর্ণনায় পাওয়া যায়—যখন তিনি নীচের দিকে অবস্থিত মসজিদের দিকে আসেন সেখানে তখন শিখদের গুলী বৃষ্টিধারার

ন্যায় বর্ষিত হচ্ছিলো। আধঘন্টা খানেক মসজিদে অবস্থান করে তিনি দাদা সৈয়দ 'আবদুল হাসানকে বললেন যে, নিশান নিয়ে আগে যাও। অতঃপর উচ্চস্বরে তকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে তিনি আক্রমণোদ্যত হন। সে সময় আরবাব বাহরাম খান সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর সামনে ঢালস্বরূপ আগে আগে চলছিলেন।

হাফিজ ওয়াজীহুদ্দীন সাহেব বাগবতী বলেন যে, আমি বন্দুক চালনা করতে করতে একটি ঝরনার ধারে গিয়ে পৌঁছি। দেখতে পাই যে, কতিপয় লোকের সঙ্গে সৈয়দ সাহেব কিবলামুখী বসে বন্দুক চালাচ্ছেন। সে সময় তিনি আমার বরাবর নিজের বুকের ডান ছাতির উপর বন্দুক চেপে ফায়ার করেন। আমি দেখতে পেলাম—ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙুলে কিংবা তার পাশের অনামিকায় তাজা খুন। আন্দাজ অনুমানে জানতে পেলাম সম্ভবত সৈয়দ সাহেবের কাঁধে গুলী লেগেছে। বন্দুক ছাতির উপর রাখতে গিয়ে তারই খুন তাঁর আঙুলে লেগে গেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি বললেন যে, ভাইয়েরা! ঐ সব দুষ্কৃতিকারীদের তাক করে গুলী মারো।

মুহাম্মদ আমীর খান কাসূরী বলেন,—সে সময় আসমান ছিলো পরিষ্কার। মেঘ যেমন ছিলোনা,—তেমনি ছিলো না ধূলো-বালি কিংবা রৌদ্র। কিন্তু বারুদের ধোয়ার কারণে অন্ধকার এরূপভাবে ছেয়ে যায় যে, নিকটের মানুষ চিনতেও কষ্ট হচ্ছিলো। শিখদের কার্তুজের কাগজ এমনিভাবে উড়ছিলো—মনে হচ্ছিলো যেন পঙ্গপাল উড়ছে। সময়টা অত্যন্ত ভয়াবহ ও উদাস প্রকৃতির মা'লুম হচ্ছিলো। সকল মুজাহিদ ছোট বন্দুক ও সাধারণ বন্দুক গলায় লটকিয়ে তলোয়ার হাতে নেয় এবং সমস্বরে 'আল্লাহু-আকবার' 'আল্লাহু-আকবার' বলে আক্রমণোদ্যত হয়। সে সময় যুদ্ধের অবস্থা ও প্রকৃতি এমনি ছিলো যে, সমস্ত শিখবাহিনী পেছপা হয়ে পাহাড়ের উপর আরোহণ করছিলো আর মুজাহিদ বাহিনী পাহাড়ের পাদমূলে গিয়ে পৌঁছে শিখদের ঠ্যাং ধরে ধরে টানছিলো এবং তলোয়ারের আঘাতে সাবাড় করছিলো। উভয় পক্ষ থেকে পাথরও বর্ষিত হচ্ছিলো। লোকজন সেখানে ফিরে দেখতে পায় যে, সৈয়দ সাহেব দৃষ্টি বহির্ভূত। মওলানা মুহাম্মদ ইসমা'ঈল সাহেবকে লোকেরা বন্দুক গলায় ঝুলানো অবস্থায় দেখেছিলো। তাঁর হাতে ছিলো তখন তলোয়ার, কপাল ছিলো রক্তাক্ত আর তিনি সে রক্ত হাত দিয়ে মুছে ফেলছিলেন। সে সময় কেউ কারো সন্ধান রাখার মতো অবস্থা ছিলো

না। মুজাহিদ বাহিনীকে এই যুদ্ধে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখী হতে হয়। এরই ভেতর মওলানা মুহাম্মদ ইসমা'ঈল (র) শাহাদত লাভ করেন। বীরত্ব ও সাহসিকতা, শাহাদত লাভের প্রতি প্রবল আগ্রহ ও দুনিয়ার প্রতি চরম ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা এবং ইমামের প্রতি মহব্বত ও আনুগত্যের এমনি সব আশ্চর্যজনক ঘটনা এ যুদ্ধে দৃষ্টিগোচর হয়, যা ইসলামের প্রাথমিক শতাব্দীগুলোর স্মৃতিকেই জীবন্ত করে তোলে এবং সেই সব পুরনো দিনগুলি আর একবার ফিরে আসে।

ঘটনাবলী, বিভিন্ন বর্ণনাসূত্র, যুদ্ধের ময়দানের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য, নিদর্শন ও প্রাপ্ত তথ্যাবলী সব একত্র করলে এটাই অবগত হওয়া যায় যে, যাঁর বিপ্লবী দাওয়াত ও প্রশিক্ষণ, যাঁর উৎসাহ-উদ্দীপনা ও প্রেরণায় শত শত আল্লাহ্‌র বান্দা যারা নিজেদের স্বদেশ ভূমিতে নিরাপত্তা, নিরুপদ্রব ও শান্তিতে জীবন যাপন করছিলো--তাদের শাহাদতের চিরন্তন সুখ-সৌভাগ্য লাভ ঘটে— তিনিও এই মহান নিয়ামত ও শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকেন নি; বরং ভারতবর্ষে যেমন তিনি সবার আগে এই নিয়ামতের প্রতি আহবান জানান, তেমনি তা অর্জনের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অগ্রগামী ও বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। এইরূপে তিনি আহ্‌লে বায়েতের পিতা-পিতামহগণের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হন—যাঁরা বিভিন্নভাবে শাহাদত লাভ করেন এবং যাঁদের পবিত্র দেহ শাহাদত লাভের পরও দুশমনের গোস্তাখী ও প্রতিশোধ-স্পৃহা থেকে রেহাই পায়নি।

একটি বর্ণনায় জানা যায় যে, যুদ্ধশেষে একজন মুসলিম বালকের নেতৃত্বে শিখেরা মুসলমানদের তাদের ধর্মীয় বিধান মুতাবিক সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-র জানাযা ও দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করার অনুমতি দেয়। অন্য আর একটি বর্ণনায় জানা যায় যে, তাঁর মাথা ধড় থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে ছিলো এবং দুটোই আলাদাভাবে দাফন করা হয়।

যাই হোক, সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-এর দু'আ ও এ অভিলাষ পূরণ হয়ে যায় যে, তাঁর কবরের নাম-নিশানাও যেন বাকী না থাকে। নওয়াব উযীরুদ্দৌলা মরহুম লিখেছেন যে, একবার এক ব্যক্তি সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-র নিকট আরজ করেছিলো যে, আপনি কবর পূজা এবং বুযুর্গানে দীন-এর মাযারে শির্‌ক ও বিদ'আতীমূলক কার্যকলাপকে এত জোরেশোরে বাধা দিয়ে থাকেন। অন্যদিকে স্বয়ং আপনারই হাজার হাজার মুরীদ ও

ভক্ত-অনুরক্ত সারা উপমহাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। আপনার ওফাতের পর আপনার মাযারেও তাই হবে যা অন্যান্য বুর্যর্গানে দীনের মাযারে হচ্ছে। আপনার কবরের পূজাও তেমনিভাবেই হবে যেমনি তাঁদের কবরের পূজা তাঁদের ওফাতের পর হচ্ছে। এতে তিনি বললেন যে, আমি দরগাহে ইলাহীতে কান্না ভরা চোখে বিনীত দরখাস্ত পেশ করবো যেন মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমার কবরকে নিশ্চিহ্ন এবং আমার দাফনগাহকে অজ্ঞাত রাখেন; কবর যেমন থাকবে না, তেমনি সেখানে শির্ক ও বিদ'আতমূলক কোন আচার-অনুষ্ঠানও হবে না। আল্লাহ্র রহমত ও কুদরতের নমুনা দেখুন যে, সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র)-র দো'আ কবুল হয়েছে এবং তাঁর কবর আজ অবধি অজ্ঞাত।

বালাকোটের এই শাহাদতগাহে একই তারিখে ১২৪৬ হিজরীর ২৪শে জিলকদ মওলানা মুহাম্মদ ইসমা'ঈলও শহীদ হন এবং পরম বন্ধুর সান্নিধ্যে গিয়ে পৌঁছান। এই বন্ধুর কলিজার তপ্ত খুনে তিনি লালিত হয়েছিলেন এবং সেভাবেই সাধ্য-সাধনা ও জিহাদের এই দীর্ঘ ও অব্যাহত পবিত্র জীবনের সমাপ্তি হয়। এর ভেতর সম্ভবত একদিনের তরেও অবসর কিংবা আরাম,—এক রাতও অলস মুহূর্ত কিংবা সুখ নিদ্রায় তাঁর ব্যয়িত হয়নি।

এই যুদ্ধে তিনশতেরও বেশী মুজাহিদ যাঁদের নিজ নিজ এলাকার সার-নির্যাস ও মগজ-সদৃশ বলা যেতে পারে—শাহাদত লাভে ধন্য হন। তাঁদের একই জায়গায় শহীদী দাফনগাহে চিরবিশ্রাম লাভ ঘটে।

বালাকোট বিজয়ের খবর লাহোর পৌঁছুলে রঞ্জিৎ সিংহ আনন্দ ও খুশীতে বাগবাগ হয়ে যান। তিনি নির্দেশ জারী করেন সরকারীভাবে যেন বিজয় উৎসবে তোপধ্বনি এবং অমৃতসরে এ ঘটনার আনন্দ ও খুশীতে আলোকসজ্জা করা হয়। মহারাজা বিজয়ের সংবাদ অবগত হয়ে খুশীতে সংবাদ-বাহককে এক জোড়া সোনার কংকন এবং একটি পশমী পাগড়ী পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করেন। তিনি স্বীয় বীরপুত্র রাজকুমার শের সিংহকে পত্র লেখেন। তাতে পুত্রের লেখা পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করেন এবং লেখেন যে, যখনই সে প্রত্যাবর্তন করবে তাকে এই বীরত্বপূর্ণ খেদমতের স্বীকৃতি হিসাবে একটি নতুন জায়গীর প্রদান করা হবে। একটি ফরমান গোবিন্দ-ঘরের শাসনকর্তা ফকীর ইমামুদ্দীনের নামেও পাঠানো হয়, যাতে এই

ঘটনার উল্লাস প্রকাশে দুর্গের প্রতিটি বন্দুক থেকে এগারোটি গুলী নিক্ষেপ করা হয়।

শাহী দরবারের ইংরেজ দূতও গভর্নর জেনারেলের পক্ষ থেকে মহারাজার এই বিরাট বিজয়ে অভিনন্দন জানান।[১]

জিহাদের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়

রঞ্জিৎ সিংহের এই বিজয়ের আনন্দ, খুশীর আমেজ ও তৃপ্তি খুব বেশীদিন ভোগের মওকা মেলেনি। বালাকোট যুদ্ধের পর তিনি মাত্র আট বছর বেঁচেছিলেন এবং ১৮৩৯ খৃস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর সন্তান-দের সামনে বিভিন্ন ধরনের বিপদ-আপদ ও ঝড়-ঝাপ্টা এসে দেখা দেয়।

রাজপুত্রদের কেউ যৌবনে পদার্পণ করেই মারা যায়, কেউ বা দুর্ঘটনার শিকার হয়, শিকার হয় আকস্মিক বিপদ ও মুসীবতের। পুত্র রাজকুমার শের সিংহ, বালাকোট বিজয়ী বীর,—তীক্ষ্ণ মেধা, ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার ঝলক যার চেহারায় উদ্ভাসিত হতো,—মাত্র কয়েক বছর পর ১৮৪৩ খৃস্টাব্দে মারা যায়। এরপর রাজপরিবারের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কলহ, পারস্পরিক তীব্র মতভেদ ও শত্রুতা শুরু হয় এবং পরিণতিতে তা গৃহযুদ্ধের রূপ নেয়। শেষ পর্যন্ত নবোদ্ভূত এই রাষ্ট্রটি ১৮৪৯ খৃস্টাব্দে বৃটিশ-ভারতীয় সরকার দখল করে নেয় এবং শিখ সাম্রাজ্যটি এমনভাবে খতম হয়ে যায়, যার নাম-নিশানাও আর অবশিষ্ট নেই।

সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) এবং বিরাট সংখ্যক সহযোদ্ধাদের শাহাদাত লাভের কারণে অবশিষ্ট মুজাহিদ বাহিনী উদাস, বিমর্ষ ও নিরাশ হয়ে পড়ে। কিছুদিন পর তারা পুনরায় এ অবস্থা থেকে জাগ্রত হয় এবং সৈয়দ আহমদ শহীদ (র)-র খাস ও অন্তরঙ্গ সাথী শেখ ওলী মুহাম্মদ ফলতীকে নিজেদের আমীর নিযুক্ত করে। এরপর মওলানা নাসিরউদ্দিন মঙ্গলোরী ও তৎপরবর্তীতে মওলানা নাসিরউদ্দিন দেহলভী মুজাহিদ বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

সবশেষে বিপ্লবী মুজাহিদ বাহিনীর নেতৃত্ব এসে পড়ে 'আলিমে রব্বানী, শেখ-ই-কামিল মওলানা বেলায়েত আলী 'আজীমাবাদীর হাতে। তিনি সৈয়দ আহমদ শহীদ (র)-র শীর্ষস্থানীয় খলীফাদের অন্যতম ছিলেন।

---

১. পাকিস্তানের সরকারী রেকর্ড থেকে এই তথ্য নেয়া হয়েছে।

১২৬২ হিজরী মুতাবিক ১৮৪৬ খৃস্টাব্দের এ ঘটনা।[১] তাঁর ওফাত হয় ১২৭২ হিজরীর ৫ই মুহররম মূতাবিক ৫ই নভেম্বর ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে।

তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁরই ভাই মহান মুজাহিদ মওলানা 'ইনায়েত আলী 'আজীমাবাদী বিপ্লবী বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর যুগেই পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ইংরেজ গভর্নমেন্টের নিয়ন্ত্রণ পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুজাহিদ বাহিনীর তৎপরতা ও মহান লক্ষ্য হাসিলের পথে একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে আবির্ভূত হয়। এটা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিলো, যে বৃটিশ গভর্নমেন্ট নিজেদের বিজয় অভিযান, সম্প্রসারণ-বাদী লিপ্সা, নিজেদের জীবন, বুদ্ধিমত্তা ও সুদৃঢ় মনোবলের কারণে শুধু-মাত্র উপমহাদেশের জন্যই নয়, সমগ্র ইসলামী প্রাচ্যের জন্যই মারাত্মক বিপদ ও হুমকি। সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র) এবং তাঁর বিপ্লবী বাহিনীর সদস্যরা এই ঐতিহাসিক বাস্তবতা সম্পর্কে ছিলেন পূর্ণরূপে ওয়াকিফহাল ও সদা সতর্ক। বস্তুত সৈয়দ আহমদ শহীদ (র) ভারতবর্ষ, আফগানিস্তান ও তুর্কিস্তানের মুসলিম নেতৃবৃন্দ, সুলতান, দেশীয় রাজ্যের বিভিন্ন রাজন্যবর্গকে অনেক চিঠি লিখেছিলেন। এসব পত্রে এই বিপদ সম্পর্কে প্রথমেই তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তিনি হেরাতের শাসন-কর্তা আমীর কামরান ইব্‌ন শাহ মাহমূদ দুররানীকে লিখেছিলেন যে, তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ভারতবর্ষের বুকে জিহাদের প্রচলন করা, যা ইং-রেজরা ছিনিয়ে নিয়েছে এবং সেখানকার সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের হেয় ও লাঞ্ছিত করে তুলেছে।

এটা ছিলো অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার যে, মুজাহিদ বাহিনী এখন ইংরেজদের মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে যাবে। এর কিছু 'আলামত মওলানা বেলায়েত আলী 'আজীমাবাদীর যমানাতেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, যিনি সৈয়দ সাহেবের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং তাঁর সকল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ছিলেন অধিকতর ওয়াকিফহাল, ছিলেন গোপন ও প্রচ্ছন্ন বিষয় সম্পর্কেও জ্ঞাত। তাঁর ভাই মওলানা 'ইনায়েত আলীর যমানায় এ কথা আরও

---

১. ইংরেজ তাঁকে কয়েদখানায় বন্দী করেছিলো। অতএব এই সময়টা তিনি পানিবিহীন মৎস্যের ন্যায় কাটিয়েছেন এবং বন্দী জীবন ফুরোতেই তিনি মুজাহিদ বাহিনীর কেন্দ্র-ভূমিতে এইভাবে ধাবিত হন যেভাবে সারাদিনের কর্মক্লান্ত পাখী সন্ধ্যায় বাসার দিকে ছোটে। ১২৬৭ হিজরীর ৮ই রবিউছছানী মুতাবিক ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দের ১লা নভেম্বর তিনি সেখানে পেঁৗছেন।

দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে যায় এবং তাঁর খলীফা আমীর 'আবদুল্লাহ্ ও আমীর 'আবদুল করীম (যাঁরা মওলানা বেলায়েত আলীর সাহেবযাদা ছিলেন)-এর যমানা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এই গোটা ইতিহাস অভিযান পরিচালনা, ত্যাগ ও কুরবানী, দুর্ঘটনা ও মুসীবত, জ্বালা-যন্ত্রণা ও বর্বরতার কাহিনীতে পরিপূর্ণ যা শুনে শরীরের লোম খাড়া হয়ে উঠতে থাকে। এই সুদীর্ঘ সময়ে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই ছিলো। তাতে হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ, ধনসম্পদ বাজেয়াফতকরণ, দীর্ঘ মামলা-মকদ্দমা, নির্বাসন ও দ্বীপান্তর এবং এমনি ধরনের তদন্ত ও অনুসন্ধানের সমষ্টি ছিলো যা একমাত্র মধ্যযুগের ইউরোপে গঠিত বিশেষ আদালতগুলিতেই এ ধরনের কর্মকাণ্ড হতো। যদি আত্মোৎসর্গ, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কুরবানী এবং সাহসিকতা ও শৌর্য-বীর্যের সে সব কার্যাবলী যা এ দেশের স্বাধীনতার জন্য পরিচালিত জিহাদ এবং জাতীয় আযাদীর ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত---একটি পাল্লায় রাখা হয়, অপরদিকে সাদিকপুরের অধিবাসীর (মওলানা বেলায়েত আলী 'আজীমাবাদীর খান্দানের) কার্যাবলী ও ত্যাগ-তিতিক্ষা অপর পাল্লায় রাখা হয় তবে শেষোক্ত পাল্লা স্পষ্টরূপে ভারী হবে।[১]

জিহাদ, জামা'আত সংগঠন, আর্থিক সাহায্য এবং মুজাহিদ বাহিনীর কেন্দ্র সিত্তানা পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবক পৌঁছাবার জন্য একটা বিশেষ পথ সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে বিহার এবং বাংলাদেশে কয়েকটি গোপন কেন্দ্র ছিলো। তারা একটি গোপন সাংকেতিক ভাষার (কোড) মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করতো। লাখেরও বেশী বিশ্বস্ত স্বেচ্ছাসেবক ছিলো যারা আমীরের ইঙ্গিতে ও নির্দেশে চলবার জন্য প্রস্তুত ছিলো এবং ইংরেজ সরকার ধমক, ভয়-ভীতি ও লোভ-লালসা প্রদর্শনের মাধ্যমেও তাদের এ থেকে নিবৃত্ত রাখতে অপারগ ছিলো।[২]

এই বিপ্লবী আন্দোলন বাংলাদেশে শৌর্য-বীর্য ও ইসলামী জোশ, ধর্মীয় আবেগ-উদ্দীপনা ও জীবনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন তথা নিস্পৃহ মানসিকতা, সৈনিকসুলভ আত্মা, আল্লাহ্র রাস্তায় শাহাদত লাভের প্রতি আগ্রহ, ইসলামী ঐক্য ও সংহতির জন্য উৎসাহ-উদ্দীপনা, ইসলাম ও

---

১. বিস্তারিত জানবার জন্য দেখুন মওলানা মাস'উদ 'আলম নদবীকৃত 'হিন্দুস্তান কি পহেলী ইসলামী তাহরীক' এবং গোলাম রসূল মেহের প্রণীত 'সৈয়দ আহমদ শহীদ'।

২. এ সমস্ত চমকপ্রদ ও আশ্চর্যজনক ঘটনাবলী বিস্তারিত জানতে চাইলে W. W. Hunter প্রণীত 'Indian Mussalmans' দেখুন।

মুসলমানদের সামগ্রিক স্বার্থের মুকাবিলায় নিজের স্বার্থকে কুরবানী করে দেবার মতো মনোবল এবং ইসলামী মূলনীতির উপর দৃঢ়চিত্ত থাকবার এক অটুট শক্তি পয়দা করে দিয়েছিলো আর এর উপর নির্ঝঞ্ঝাট ও শান্তি-প্রিয় একটা জাতিকে---যে জাতি অশ্বারোহণ, সৈনিক বৃত্তি তথা জিহাদ ও লড়াইয়ের ময়দান থেকে বহুদূরে অবস্থান করতো --একটি যুদ্ধবাজ ও সাহসী বীরের জাতিতে পরিণত করেছিলো। কতিপয় ইংরেজ জেনারেল স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলো যে, বাঙালী মুজাহিদ বীরত্বে ও সাহসিকতায় পাঠান ও আফগানদের তুলনায় মোটেই কম ছিলো না ; বরং কষ্টসহিষ্ণুতা ও আঘাত হানাতে কোন কোন সময় তাদের থেকেও অগ্রগামী ছিলো। গুপ্ত পুলিশ, সি. আই. ডি-র অব্যাহত ধমক ও সরকারী ভীতি প্রদর্শনও এই সব বাঙালী মুজাহিদ এবং তাদের নাযুক, কঠিন ও কষ্টসাধ্য অভিযানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হতে পারেনি।[১]

ঈমান ও 'আকীদার সুদৃঢ়তা এবং দীনী দাওয়াত ও তরবিয়তের প্রভাবে শয়তান তাদের ভেতর জাহিলী যুগের আবেগ ও প্রেরণা এবং ভাষাগত, সভ্যতাগত, বংশীয় ও জাতিগত পক্ষপাতিত্বমূলক ভাবধারা সৃষ্টি করতে মোটেই কামিয়াব হতে পারেনি। তারা শুধু ইসলামের উপরই গর্ব করতো এবং ইসলামের খিদমত, তার প্রচার ও তবলীগ, নেক আমল এবং মহত্ত্বর আখলাককেই প্রকৃত মানদণ্ড মনে করতো।

এর আন্দাজ আমরা এ থেকেও করতে পারি যে, তাদের দমনের জন্য ইংরেজ সরকারকে যে যুদ্ধাভিযান পাঠাতে হয় তার সংখ্যা বিশের কম ছিলো না এবং তাতে ষাট হাজার ট্রেনিংপ্রাপ্ত সৈন্য'অংশগ্রহণ করে।

ডক্টর হান্টার স্বীকার করেছেন যে, পাঞ্জাবের ছাউনী কোন কোন দিন ইংরেজ সৈন্য থেকে একেবারেই খালি থাকত এবং তা এ জন্যে যে, এসব সৈন্য মুজাহিদ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলো। কয়েকটি যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্য পশ্চাদসরণ করতে বাধ্য হয় ; এমনকি পাঞ্জাব সরকার অনন্যোপায় হয়ে ১৮৬৩ খৃস্টাব্দের শেষ দিকে সকল সৈন্যকে ফেরত ডেকে পাঠায় এবং পরে নিজেদের প্রাচীন ও পরিচিত রাজনীতি ও কূট-কৌশলের সাহায্যে এই চ্যালেঞ্জ ও বিপদের মুকাবিলা করে। ইংরেজ গভর্নমেন্ট উপজাতীয়দের পরস্পরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড় করায় এবং

১. বিস্তারিত জানতে চাইলে দেখুন—ডব্লিউ, ডব্লিউ, হান্টার প্রণীত 'ভারতীয় মুসলমান'।

মুজাহিদ বাহিনীকে স্থানীয় আনসার ও সহায়তাকারী পৃষ্ঠপোষকদের থেকে আলাদা ও বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এভাবেই ১৮৬৮ সালের দিকে এ যুদ্ধগুলোর পরিসমাপ্তি ঘটে।

এরপর বিপ্লবীদের উপর আদালতে মামলা-মোকদ্দমা চালানো হয়, যার সিলসিলা একটা দীর্ঘ মুদ্দত পর্যন্ত চলতে থাকে। আযাদী আন্দোলনের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতার উপরও মোকদ্দমা চলে যার মধ্যে মওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী 'আজীমাবাদী, মওলানা আহমদউল্লাহ 'আজীমাবাদী, মওলবী জা'ফর থানেশ্বরী, মওলানা 'আবদুর রহীম সাদিকপুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব বিপ্লবী নেতাদের ফাঁসি প্রদান করা হয়। পরে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে (পোর্ট বেলিয়ার) যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে পরিবর্তিত করা হয়। মওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী এবং মওলানা আহমদউল্লাহ দ্বীপপুঞ্জেই ইন্তেকাল করেন। মওলবী মুহাম্মদ জা'ফর এবং তাঁর সঙ্গী-সাথী ১৮ বছর নির্বাসন ভোগ করার পর দেশে ফিরে আসেন। এটা একটা মর্মস্পর্শী ও দুঃখজনক ঘটনা যা মওলবী মুহাম্মদ জা'ফর থানেশ্বরী স্বয়ং নিজ কলম দ্বারা কালাপানি 'অথবা 'তারীখে 'আজীব'[১] নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।

এই ধারাবাহিক জিহাদ, কুরবানী ও অটুট সংকল্পের ইতিহাস লিখতে একটি স্বতন্ত্র দফতর এবং বিরাট পুস্তকের প্রয়োজন। এখানে সেই আশ্চর্যজনক ইতিহাসের একটি পরিচ্ছেদ আপনাদের সামনে পেশ করছি।

ফাঁসির মঞ্চ থেকে দ্বীপান্তর পর্যন্ত

১৮৬৪ খৃস্টাব্দের (১২৮০ হিজরী) মে মাসের দ্বিতীয় দিন। ইংরেজ জজ এডওয়ার্ডস আম্বালা আদালতের চেয়ারে উপবিষ্ট। তাঁর পাশে তাঁকে সাহায্য ও সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে চারজন এসেসর ছিলেন। তারা ছিলেন শহরের নেতৃস্থানীয় ও দায়িত্বশীল মহলের অন্যতম। তাদের কাজ ছিলো এই গুরুত্বপূর্ণ মামলায় নিজেদের অভিমত দেওয়া। তাদের সামনে এগারো জন মানুষ আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিল যাঁদের চেহারা থেকে নিষ্পাপ প্রতিচ্ছবি ও আভিজাত্যের ঝলক প্রতিফলিত হচ্ছিলো, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁরা আজ প্রথম শ্রেণীর অপরাধী তালিকাভুক্ত। তাঁদের

১. উক্ত বইয়ের বাংলা অনুবাদ 'আন্দামান বন্দীর আত্মকাহিনী' নামে প্রকাশিত হয়েছে। —অনুবাদক।

বিরুদ্ধে অভিযোগ---তাঁরা বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছেন এবং তাঁরা সৈয়দ আহমদ শহীদ (র) ও মওলানা ইসমা'ঈল শহীদ (র)-এর খলীফা ও আনসারদের টাকা-কড়ি ও স্বেচ্ছাসেবক পাঠিয়ে মদদ যুগিয়ে থাকেন এবং এসব তাঁরা দেশের ভেতর থেকে সুদূর সীমান্ত এলাকা পর্যন্ত গোপন উপায়ে পাঠিয়ে থাকেন। তাঁরা তাঁদের যোগাযোগ রক্ষা ও চিঠি-পত্র আদান-প্রদানের জন্য একটি গোপন পরিভাষাও (কোড) সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন। ইংরেজ গভর্নমেন্টের প্রজাদের কাছ থেকে তাঁরা টাকা-পয়সা আদায় করে বিদ্রোহীদের কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিতেন। বৃটিশ-ভারতীয় সরকার এ সংবাদ বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীতে চাকুরীরত একজন মুসলিম সৈনিকের মাধ্যমে অবহিত হয়। এই সংবাদ পেয়ে পাটনা, থানেশ্বর ও লাহোর থেকে তাঁদের গ্রেফতার করা হয় এবং আজকের দিন ছিলো তাঁদের মামলার রায় প্রদানের দিন।

"তোমরা নিজেদের মেধা ও জ্ঞানকে সরকারের সিংহাসন উল্টে দেবার জন্য ব্যবহার করেছো; মুজাহিদ বাহিনীর কেন্দ্রে আর্থিক সাহায্য এবং স্বেচ্ছাসেবক পৌঁছানোর ব্যাপারে তোমরা মধ্যবর্তী সেতু ছিলে, কিন্তু এতসব অপরাধ সত্ত্বেও তোমরা নিজেদের ভূমিকায় ছিলে অনড় ও অটল। তোমরা একথা প্রমাণ করতে চেষ্টা করোনি যে, তোমরা সরকারের প্রতি বিশ্বস্ত, অনুগত, সুহৃদ ও শুভাকাঙ্ক্ষী। এজন্যে আমি তোমাদের ফাঁসির ফয়সালা দিচ্ছি। তোমাদের যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সহায়-সম্পত্তি সরকারের পক্ষ থেকে বাজেয়াফত ঘোষণা করা হলো। ফাঁসির পর তোমাদের লাশ তোমাদের ওয়ারিশানদের নিকট হস্তান্তর করা হবে না; বরং তা হত-ভাগাদের কবরস্থানে পুরোপুরি লাঞ্ছনা ও অবমাননার সঙ্গে দাফন করা হবে এবং আমি ফাঁসির মঞ্চে তোমাদের লটকানো দেখলে অত্যন্ত খুশী হবো।"

যুবক মুহাম্মদ জা'ফর শান্ত, ধীর ও পরম গাম্ভীর্যের সঙ্গে এ ফয়সালা শুনলেন। তাঁর মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন কিম্বা চাঞ্চল্যের প্রকাশ ঘটলো না। জজ তাঁর রায় শোনাবার পর জা'ফর বললেন ঃ

"সমগ্র মানবমণ্ডলীর জীবন আল্লাহ্‌র হাতে। তিনিই মারেন এবং তিনিই জীবন দান করেন। তোমার হাতে না জীবন দেবার ক্ষমতা আছে, না আছে মৃত্যুর। আমাদের মধ্যে মৃত্যুর মজা আগে কে আস্বাদন করবে —তা কি কেউ বলতে পারে?"

জজ একথা শুনে রেগে-মেগে আগুন। কিন্তু তখন তাঁর ধনুকের শেষ তীরটিও নিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। এরপর তাঁর কাছে নিক্ষেপ করার মতো কোন তীরই আর অবশিষ্ট ছিলো না।

মুহাম্মদ জা'ফরের শাস্তির নির্দেশ শোনার পর থেকেই তাঁর চেহারা আনন্দ ও খুশীতে ঝলমলিয়ে ওঠে! মনে হচ্ছিলো যেন জান্নাত এবং তার হুর-গেলমান ও বালাখানা তাঁর চোখের সামনে ভাসছে। মুহাম্মদ জা'ফর কবিতা আবৃত্তি করতে থাকেন ঃ

لله الحمد کہ ان چیز خاطر می خواست
اخر امدز پس پردہ تقدیر پدید -

আল্‌হামদুলিল্লাহ্! যে বস্তু আমার অন্তর কামনা করছিলো,
অবশেষে তা' তক্‌দীরের পর্দার অন্তরাল থেকে প্রকাশিত হলো।

লোকেরা তো এ দৃশ্যে হতবাক! ঠিক এমনি মুহূর্তে একজন ইংরেজ অফিসার (পার্সন) অগ্রসর হলেন এবং মুহাম্মদ জা'ফরের নিকটবর্তী হয়ে বললেন, "আমি আজ পর্যন্ত এমন দৃশ্য দেখিনি। তোমাকে ফাঁসির হুকুম শোনানো হয়েছে, অথচ তুমি এমন হাসি-খুশী ও নিশ্চিন্ত।"

মুহাম্মদ জা'ফর জওয়াব দেন,---"আমি কেনই-বা খুশী হবো না যখন আল্লাহ্ তা'আলা আমার ভাগ্যে শাহাদত লাভকে কার্যকরী করতে চলেছেন! বেচারীরা এর মাহাত্ম্য কি করে বুঝবে?"

জজ অপর দু'জন অভিযুক্তকেও ফাঁসির রায় শোনান। এঁদের মধ্যে ছিলেন এমন একজন বয়োবৃদ্ধ মানুষ যাঁর চেহারা থেকে ন্যায়নিষ্ঠতা, আল্লাহ্-ভীতি, সাধনা ও 'ইবাদতের আলামত প্রকাশ পাচ্ছিলো। তিনিও এ ফয়সালা আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সাথে শোনেন। ইনি মওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী সাদিকপুরী। তিনি ছিলেন এই বিপ্লবী বাহিনীর আমীর। আর একজন যুবক ছিলেন যাঁকে আমীর-ওমরা ও বিরাট ব্যবসায়ী খান্দানের বলে মনে হচ্ছিলো। পাঞ্জাবের অধিবাসী এ যুবকের নাম ছিলো হাজী মুহাম্মদ শফী'। অন্যান্য আটজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

দর্শক এবং শহরের বাসিন্দারা অত্যন্ত দুঃখ ও চিন্তা-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই রায় শোনে। তাদের সকলের চোখ অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। জেলের

রাস্তার উভয় কিনারায় নারী-পুরুষ জড়ো হয়েছিলো এবং ঐ সব মজলুমদের দুঃখ ও ব্যথাভরা অন্তরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো।

জেলে গিয়ে পৌঁছুলে তাঁদের সাধারণ কাপড়-চোপড় খুলে নেওয়া হয় এবং কয়েদীদের জন্য নির্ধারিত বিশেষ পোশাক পরিধান করতে দেওয়া হয়। প্রতি তিনজনের মধ্যে একজনকে একটি সংকীর্ণ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন কুঠরীতে নিক্ষেপ করা হয়, যেখানে না আলো-বাতাস প্রবেশ করতে পারতো--না এর কোন প্রবেশাধিকার ছিলো। রাতটা তাঁরা অসহ্য গরমের ভেতর কাটালেন। ভোরবেলা তারবার্তা এসে পৌঁছলো। তাতে তাদের খোলা ময়দানে রাত কাটাবার অনুমতি দেয়া হয়েছিলো। দিনের বেলায় পুনরায় সংকীর্ণ অন্ধ কুঠরীতে নিক্ষেপ করা হয়। এ কুঠরী এমনই ছিলো যেখানে একটা সপ্তাহ কাটানোও কোন মানুষের পক্ষে ছিলো মুশকিলের ব্যাপার। তাদের দরোজা খোলা রেখে সেখানে একজন সৈন্য পাহারায় রাখার বন্দোবস্ত করা হয়েছিলো। এই সব সৈন্যদের অধিকাংশই ছিলো অমুসলিম।

মওলানা ইয়াহইয়া আলী হযরত ইউসুফ ('আ)-এর আদর্শ ও সুন্নত মুতাবিক 'আমল করতে গিয়ে পাহারাদারদের সম্বোধন করে বলতেনঃ

ءأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار -

"ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়, না এক পরাক্রমশালী আল্লাহ্?"
(সূরা ইউসূফ, ৩৯ আয়াত)

অধিকাংশ সময়ই এমন হতো যে, তারা একথা শুনে কেঁদে ফেলতো। এসব কয়েদীর সাথে এমনই মুহব্বত ও প্রীতিপূর্ণ সম্পর্কের সৃষ্টি হতো যে, তাদের ডিউটি অন্যত্র বদলী করা হলে তারা অত্যন্ত দুঃখিত হতো।

এভাবেই মওলানা ইয়াহইয়া আলী সাহেব বহু কয়েদীর অন্তররাজ্যে তৌহিদ ও ঈমানের বীজ বপন করেন। বহু কয়েদী তাঁর হাতে হাত দিয়ে মুসলমান হয়ে যায় আর বহু লোক তওবাহ করে। তিনি, 'আমরু বি'ল-মা'রূফ ওয়া নাহী 'আনি'ল-মুনকার' তথা সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধের সামান্যতম কোন মওকা পেলেও তা নষ্ট হতে দিতেন না। জেলের সাথীদের তিনি সদা-সর্বদাই ঈমানের দাওয়াত দিতে থাকতেন।

জেলের জল্লাদেরা তাঁদের সামনে ফাঁসির মঞ্চ ও রশি তৈরী করতো আর এঁরা অত্যন্ত নিরুদ্বেগ ও তৃপ্তির সাথে সামান্যতম ভীত-সন্ত্রস্ত না হয়ে সে দৃশ্য দেখতেন।

মওলানা ইয়াহ্ইয়া আলীকে এইসব কয়েদীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী হাসি-খুশী দেখা যেতো। মনে হতো তিনি যেন জান্নাতে পৌঁছুবার আগেই জান্নাতে পৌঁছে গেছেন এবং সেখানে আরাম-আয়েশ লাভের পূর্বেই তার স্বাদ লুটছেন। তিনি গভীর আগ্রহ ও উৎসাহে এবং একাগ্রতার সাথে সেই কবিতা পড়তেন যা হযরত খুবায়ব (রা) শুলদণ্ডের উপর পড়েছিলেনঃ

و لست ابالى حين اقتل مسلما

على اى جنب كان فى الله مصرعى

و ذالك فى ذات الله و ان يشاء

يبارك على اوصال شلو ممزع

"যদি আমি এই অবস্থায় নিহত হই যে, আমি মুসলমান ---তবে আমি পরওয়া করি না কোন পার্শ্বে আমাকে হত্যা করা হ'লো। আর এ সবই তো আল্লাহ্‌র পথে। যদি তিনি চান তবে শরীরের কর্তিত ও বিচ্ছিন্ন অংশগুলোকেও জীবন ও বরকত দান করতে পারেন।"

এ ধরনেরই অবস্থা ছিলো তাঁর সাথীদেরও। খেলোয়াড়-সুলভ চেহারা, হাসি-খুশী ও প্রশান্ত হৃদয়, সালাতে বিনয় ও নৈকট্যের অনুভূতি, 'ইবাদত-বন্দেগীতে গভীর আগ্রহ ও উদ্দীপনা, যিকর ও তসবীহ্ পাঠ, তেলাওয়াতে কালামে পাক, নবী করীম (স)-এর উপর দরূদ ও মুহব্বতের ভাবধারায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত যা কাব্যের বিষয়বস্তুতে প্রকাশ পেয়েছে।

পূর্বোক্ত ইংরেজ জজ—যিনি এই তিনজনকে ফাঁসির হুকুম শুনিয়েছিলেন ---এই ঘটনার অনতিকাল পরেই অত্যন্ত আকস্মিকভাবে মারা যান। ইংরেজ অফিসার মিঃ পার্সন,---যে মওলবী মুহম্মদ জা'ফরকে গ্রেফতার করেছিল এবং যে তাঁকে একদিন সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত প্রহার করেছিল,---উন্মাদ হয়ে যায় এবং উন্মাদ অবস্থায় অত্যন্ত ঘৃণিতভাবে মারা যায়। তার ভাগ্যে সেই পরিণতি ঘটে—যে সম্পর্কে মওলবী মুহাম্মদ জা'ফর থানেশ্বরী তাকে প্রথমেই অবহিত ও সতর্ক করেছিলেন। সহীহ্ হাদীছে উল্লিখিত হয়েছে যে, "কতক ধূলি-ধূসরিত ও পেরেশান হাল

মানুষ এমনও হয়ে থাকে যে, তাঁরা যদি আল্লাহর রহমতের উপর গর্বিত হয়ে কসম খেয়ে বসে--তবে আল্লাহ্ পাক তাঁদের সম্মান রক্ষা করেন।”

জেলখানায় বহু ইংরেজ ও তাদের মহিলারা সাধারণত আনাগোনা করতো। তারা কয়েদীদের তামাশা দেখতো এবং তাদের পেরেশানী দেখে বেশ খুশী হতো। সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য ও বিস্মিত হতো---এইসব কয়েদীদের আনন্দোল্লাস দেখে---এবং জিজ্ঞেস করতো যে, তোমরা মৃত্যুর দোরগোড়ায় অবস্থান করছো, আর কয়েক দিনের ভেতরই তোমাদের ফাঁসি দেওয়া হবে; তোমাদের এজন্য কোন দুঃখ কিংবা চিন্তা স্পর্শ করে না? তাঁরা জওয়াব দিতো---এ হাসি-খুশী তো শাহাদতের কারণে, যার সমকক্ষ কোন নিয়ামত ও সৌভাগ্য আর নেই।

এসব লোকেরা গিয়ে আবার ইংরেজ শাসক মহলের কাছে এসব ঘটনা বর্ণনা করতো। এর ফলে তাদের ভেতর আরও ক্রোধের সঞ্চার হতো। কিন্তু তাদের বোধগম্য হতো না যে, এদের সাথে কি করা হবে। এদের যদি ছেড়ে দেওয়া হয় তবে নিজেদের দুশমনকেই ছেড়ে দেওয়া হয় যারা সরকারী সিংহাসনকেই উৎখাত করতে চায়। ছাড়া পাবার পর তারা পুনরায় এই কাজই করবে। আর ফাঁসি দেয়া হলে তাদের অতি আকাংক্ষিত বস্তুকেই হাতে তুলে দেওয়া হয়;---তাদের খুশী ও আনন্দের উপকরণ যোগানো হয়।

ইংরেজদের কাছে তাই বিষয়টা ছিলো যেমন বিরক্তিকর---তেমনি অস্বস্তিকরও। তারা ওটাতে যেমন রাযী হতে পারছিলো না, তেমনি পারছিলো না এ বিষয়েও নিশ্চিন্ত ও তৃপ্ত হতে।

তারা এই সমস্যা নিয়ে বরাবরই চিন্তা করতে থাকে। ইংরেজ একটি আইনানুসারী ও মেধাসম্পন্ন জাতি। শেষাবধি তারা একটা মধ্যপন্থা উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়।

একদিন আম্বালার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট জেলখানা পরিদর্শনে আসেন এবং ঐ তিন জনের প্রতি নিম্নোক্ত নির্দেশ প্রদান করেনঃ

“বিদ্রোহীরা! যেহেতু তোমরা ফাঁসি লাভের প্রত্যাশী এবং একে আল্লাহ্র পথে শাহাদত প্রাপ্তি বলে মনে করো, আর আমরাও এটা চাই না যে, তোমরা তোমাদের মঞ্জিলে মকসূদে পোঁছে যাও এবং আনন্দ ও

তৃপ্তি লাভে সক্ষম হও ; এজন্য আমরা ফাঁসির হুকুম পরিবর্তন করে তোমাদের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিলাম।"

এরপর এসব লোকের দাড়ি ও মাথার চুল চেঁছে ফেলা হলো। মওলানা ইয়াহ্‌ইয়া আলী অধিকাংশ সময় কর্তিত দাড়ির উপর হাত বুলিয়ে বলতেন, و فی سبیل الله ما لقیت "যা কিছু তোমার সাথে করা হয়েছে সব আল্লাহরই পথে।"

আল্লাহ্‌র রাষ্ট্রনীতিতে ব্যাপারটা ঘটলো উল্টো রকমের। বিপ্লবী মুজাহিদত্রয়ের জন্য যে ফাঁসিমঞ্চ তৈরী করা হয়েছিলো--সেই ফাঁসিমঞ্চেই একজন ইংরেজকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

কয়েদীদের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিলো। অতএব মওলানা ইয়াহ্‌-ইয়া আলী কুয়া থেকে চরকীর সাহায্যে পানি উঠাবার নির্দেশ পান। বালতিটা এত বড় ছিলো যে, অত্যন্ত শক্তিশালী যুবকের পক্ষেও তার সাহায্যে খুব সহজে পানি উঠানো সহজসাধ্য ছিলো না। মওলানা ছিলেন একজন বয়োবৃদ্ধ মানুষ। 'ইবাদত-বন্দেগী ও রিয়াযত এবং কঠিন পরিশ্রমের ফলে যা ছিটেফোঁটা শক্তি অবশিষ্ট ছিলো তাও নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো। দিন ছিলো দারুণ গরম। ফলে পেশাবে রক্ত দেখা দিতে থাকে। তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও স্থৈর্যের সাথে আরদ্ধ কাজে লিপ্ত থাকেন এবং মুখে অভিযোগটুকু পর্যন্ত উচ্চারণ করা থেকে বিরত থাকেন। অতঃপর তাঁকে সহজ ও আয়াসসাধ্য কাজ সোপর্দ করা হয়, যা তিনি অত্যন্ত আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার সাথে আঞ্জাম দিতে থাকেন। জেলের সঙ্গী-সাথীদের তিনি বলতেন যে, তোমরা এখান থেকে খাবার ও কাপড়-চোপড় পাও---তখন নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কেন আঞ্জাম দিচ্ছো না ?

মওলানা এভাবেই জেলখানাতে 'আমরু বি'ল-মারূ'ফ ওয়া নাহী 'আনি'ল-মুনকার'-এর দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে এবং ওয়াজ-নসীহত করতে থাকেন। এমন কি বহু কট্টর অপরাধী চরিত্রের লোকও তাঁর হাতে তওবাহ্‌ করে। পরে মওলানাকে আম্বালা থেকে লাহোরে স্থানান্তরিত করা হয়। নতুন এই জেলে তাঁকে এক বছর থাকতে হয়। এখানে বহু বদকার ও দুশ্চরিত্র, চোর-ডাকু ইত্যাদি শ্রেণীর লোকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি এদের কাছেও ওয়াজ-নসীহত শুরু করেন। তিনি এদের সামনে

অন্যায়, অসৎ পাপ ও দুষ্কার্যের নিন্দা এবং দীনদারী, তাকওয়া ও পবিত্র-তার ফযীলত বর্ণনা করতেন। আল্লাহ্‌র ও তাঁর রসূল (স·)-এর আনুগত্য, তওবাহ, আল্লাহ্‌র নৈকট্য, অবস্থার পরিশুদ্ধি ও নৈতিক সংস্কারের উপর তাদের উৎসাহিত করতে চেষ্টা করতেন। তওহীদ, সালাত ও সিয়াম পালনের গুরুত্ব আরোপের দাওয়াত দিতেন; ভীতি প্রদর্শন করতেন আল্লা-হ্‌র 'আযাব সম্পর্কে। তাঁর এ প্রচেষ্টায় বহু চোর ও ডাকু তওবাহ করে, তাদের জীবনে আসে এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন, তারা পরিণত হয় আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ, বিশুদ্ধ ও সত্যিকার বান্দায়।

এই সব লোকের মধ্যে বেলুচিস্তানের একজন অধিবাসী ছিলো। সে ছিলো অত্যন্ত জালিম, অত্যাচারী, হৃদয়হীন ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক। কয়েকবারই সে জেলখানার কর্মচারী আমলাদের মারপিট করে। নিজের কর্তব্যও সে পালন করতো না---অধিকন্তু গুণ্ডামী করতো। এজন্য কয়েকবার তার শাস্তিও হয়। তবুও এ থেকে সে নিবৃত্ত হয়নি। শেষা-বধি জেলার তার সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়ে এবং তাকে তার নিজের অবস্থার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। একবার ঘটনাক্রমে মওলানার পাশে তার রাত কাটাবার মওকা মেলে। অতঃপর মওলানার কথাবার্তায় সে এত বেশী প্রভাবিত হয় যে, তার জীবনধারাই একেবারে বদলে যায়। অত্যন্ত সুন্দর ও সুচারুরূপে সে তার কর্তব্য পালন করতে থাকে। তার হাত-পায়ের বেড়ী ও শেকলও অবশেষে খুলে দেওয়া হয়। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ও জামা'আতেরও সে পাবন্দ হয়ে যায়। আল্লাহ্‌র ভয়ে তার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠতো এবং যে তাকে দেখতো---সেই তাকে আল্লাহ্‌র একজন ওলী মনে করতো।

মওলানা এবং তাঁর সাথীদের এভাবেই এক জেল থেকে অন্য জেলে স্থানান্তরিত করা হতে থাকে। ১৮৬৫ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের পোর্টবেলিয়ায় পৌঁছে যান। সেখানে দু'বছর (যে সময়ে তিনি 'ইবাদত-বন্দেগী ও ইসলামের সেবায় অতিবাহিত করেন) পর মওলানা ইয়াহইয়া আলী স্বীয় মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হন। এ ঘটনা ১৮৬৮ খৃস্টাব্দ মুতাবিক ১২৮৪ হিজরীর।

১৮৮৩ খৃস্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী তারিখে মওলবী জা'ফর থানেশ্বরীর রেহাই ও ক্ষমার হুকুম এসে যায় এবং তিনি ১৮ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের পর মুক্তিলাভ করেন।

বালাকোটের শহীদদের মর্যাদা ও পয়গাম[১]

বালাকোটের যুদ্ধে যেসব পাক ও পবিত্র আত্মা শাহাদত বরণ করেন তাঁরা মানব জগতের জন্য শোভা ও সৌন্দর্য এবং মুসলমানদের জন্য মর্যাদা ও 'ইযযত, কল্যাণ ও বরকতের কারণ ছিলেন। পুরুষোচিত শৌর্য-বীর্য, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্ন জীবনযাপন, পাক-পবিত্রতা ও তাকওয়া, ইসলামী শরীয়ত ও সুন্নতে রসূল (স)-এর অনুসরণ এবং ধর্মীয় অনুভূতি ও বীরত্বের সেই সুগন্ধি যা আল্লাহই জানেন কত বাগানের ফুল থেকেই না নিংড়ানো হয়েছিলো। মানবতা ও ইসলামের বাগানের এমন "সমষ্টিগত সুগন্ধি" কয়েক শতাব্দীতেও তৈরী হয়নি। এসব সারা দুনিয়াকে সুগন্ধিময় ও সুবাসিত করে তুলতে যথেষ্ট ছিলো অথচ ২৪শে জিলকদ ১২৪৬ হিজরীতে বালাকোটের মাটিতে তা মিশে যায়। মুসলমানদের নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হতে গিয়েও থেমে যায়। শর'য়ী হুকুমতের স্বপ্ন একটা দীর্ঘকালের জন্য অপূর্ণই থেকে যায়। বালাকোটের যমীন সেই পাক খুনের বাগানে পরিণত হয় এবং সেই শহীদবর্গের ভাণ্ডার দ্বারা গুলযার হয়ে ওঠে যাঁদের একনিষ্ঠতা, বিশুদ্ধচিত্ততা, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যের প্রতি সমর্পিত-চিত্ততা, যাঁদের সমুন্নত হিম্মত ও দৃঢ়তা, যাঁদের সাহসিকতা ও বীরত্ব, যাঁদের জিহাদী জোশ ও জয্‌বা এবং শাহাদতের প্রতি প্রবল আগ্রহের নজীর বিগত কয়েক শতাব্দীতেও মেলা মুশকিল। বালাকোটের প্রস্তরময় ও কংকরাকীর্ণ উঁচু-নীচু অসমতল যমীনের উপর চলাচলকারী অজ্ঞ ও অসতর্ক মুসাফির কি সংবাদ রাখে যে, এ যমীন কেমন সব 'আশিকের দাফনগাহ এবং মিল্লাতে ইসলামিয়ার কেমন সব অমূল্য সম্পদের ভাণ্ডার!

یہ بلبلوں کا صبا مشہد مقدس ہے
قدم سنبھال کے رکھیو یہ تیرا باغ نہیں

"এটা বুলবুলের পরিপূর্ণ পবিত্র দাফনগাহ; কদম সামলে রেখো, এটা তোমার বাগান নয়।"

আল্লাহ্‌র কিছু একনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধচিত্ত বান্দা একজন বিশুদ্ধচিত্ত একনিষ্ঠ বান্দার হাতের উপর স্বীয় প্রভু থেকে তাঁর রিযামন্দী, তাঁরই নামের সমুন্নতি এবং তাঁরই দীনের পরিপূর্ণ বিজয়ের জন্য শেষ নিঃশ্বাস থাকা পর্যন্ত চেষ্টা চালানো এবং তাঁরই রাস্তায় নিজের সবকিছুই বিলিয়ে দেবার অঙ্গীকার করেছিলো। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের শরীরের ভেতর দম ছিলো তা এ পথেই

১. সীরতে সৈয়দ আহমদ শহীদ, দ্বিতীয় খণ্ড থেকে গৃহীত।

জোর তৎপর ও সরগরম থাকে। শেষাবধি নিজেদের শহীদী খুন দ্বারা সেই বিশ্বস্ত প্রতিশ্রুতির উপর তাঁরা শেষ সীলমোহর মেরে দেন। নিশ্চয়তা সহকারেই বলা যায় যে, ২৪শে জিলকদের দিন অতিক্রম করে যে রাত এলো, তা সেই প্রথম রাত ছিলো যে রাতে তিনি অবসর গ্রহণ করে ঝামেলামুক্ত হয়ে মিষ্টি নিদ্রায় অভিভূত হন।

শাহাদতের খেলাত পরিধান করত তিনি যে সর্বপ্রদাতার দরগাহে গিয়ে পোঁছেন সেখানে না উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের কামিয়াবী সম্পর্কে কোন প্রশ্ন আছে, না আছে চেষ্টা-তদবীরের পরিণতি ও ফলাফল সম্পর্কে কোন দাবী-দাওয়া কিংবা পরাজয় ও ব্যর্থতার জন্য কোন শাস্তি অথবা কোন সালতানাতের বিনাশের ও অস্তিত্বহীনতার জন্য কোনরূপ হিসাব-নিকাশ কিংবা জেরা-যবানবন্দী। সেখানে শুধু দু'টো জিনিসই দেখা হয়ে থাকে--'সিদ্‌ক' ও 'ইখলাস' তথা সত্যবাদিতা ও বিশুদ্ধচিত্ততা এবং স্বীয় চেষ্টা-সাধনা ও উপায়-উপকরণের পরিপূর্ণ ব্যবহার। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে বালাকোটের শহীদবর্গ এ দুনিয়াতে অত্যন্ত ভাগ্যবান এবং ইনশাল্লাহ্‌ দরবারে ইলাহীতেও 'ইযযত ও হুরমতের মালিক এজন্য যে, তাঁরা ইখলাসের সাথে আপন মহা-প্রভুর রিযামন্দী হাসিলের জন্য নিজেদের সকল চেষ্টা ও সাধনা এবং উপায়-উপকরণ ব্যবহারে বিন্দু বরাবরও কার্পণ্য করেন নি। তাঁদের সেই শহীদী খুন যা আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে বালাকোটের মাটিতে শুষে গেছে, সেই খুন যার পরিণতিতে কোন সাম্রাজ্য কায়েম হয়নি,---কোন জাতির বস্তুগত ও রাজনৈতিক উত্থানও হয়নি,---সৃষ্টি হয়নি কোন খেজুর বাগানে সবুজ কিশলয়ের---তথাপি সেই খুনের কতিপয় কাত্‌রা আল্লাহ্‌র 'আদল ও ইনসাফের দাঁড়ি-পাল্লায় বিশাল সাম্রাজ্য থেকেও অধিকতর ওজন রাখে। এইসব আশ্রয়হীন ফকীর মুসাফির অসহায় অবস্থায় জীবন দিয়েছে এবং তাঁদের এখন দুনিয়াতে কোন বস্তুগত স্মৃতিস্তম্ভও নেই, তাঁরা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে ঐ সব সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা ও হুকুমতের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকারীদের তুলনায় অনেক বেশী মূল্যবান ও সম্মানিত যাদের প্রতিচ্ছবি কুরআন মজীদে নিম্নোক্ত শব্দসমষ্টির মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছে ঃ

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ - وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ط

كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ -

"যখন তুমি তাদের দিকে তাকাও, তাদের দেহাকৃতি তোমার নিকট প্রীতিকর মনে হয় এবং তারা যখন কথা বলে, তুমি সাগ্রহে তাদের কথা শ্রবণ কর যদিও তারা দেওয়ালে ঠেকানো কাঠের স্তম্ভস্বরূপ।"

(সূরা মুনাফিকুন, ৪র্থ আয়াত)

নিশ্চয়ই বালাকোটের শহীদবর্গের খুন দুনিয়ার রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক মানচিত্রে কোন আকস্মিক পরিবর্তন সৃষ্টি করেনি, শাহাদতের খুনের একটি সংক্ষিপ্ততম লাল রেখার উদ্ভব ঘটিয়েছিলো মাত্র। তার জায়গা ভূগোলবেত্তার প্রাকৃতিক মানচিত্রে যেমন ছিলো না,---তেমনি ছিলো না ঐতিহাসিকের রাজনৈতিক এ্যালবামে। কিন্তু কে জানে যে, শহীদের এই খুন তকদীরে ইলাহীর দফতরে কতখানি গুরুত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তির হকদার মনে করা হয়েছে, তা মুসলমানদের --তকদীরের লেখনীর কত ময়লা দাগ ধুয়েছে, তা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে যার নিকট বাতিল, বিলোপ ও বহালের 'আমল জারী থাকে,---"আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহা বাতিল করেন এবং যাহা ইচ্ছা বহাল রাখেন এবং তাঁহারই নিকট আছে কিতাবের মূল" (সূরা রা'দ, ৩৯ আয়াত) কোন্ নতুন ফয়সালা করিয়েছে, সে কোন্ সুদৃঢ় ও মযবুত সালতানাতের জন্য বিলুপ্তি ও অবনতি এবং কোন্ অধঃপতিত জাতির জন্য উত্থান ও সৌভাগ্যের নতুন ফয়সালা শুনিয়েছে,---এর দ্বারা কোন্ জাতির ভাগ্য জাগ্রত হয়েছে এবং কোন্ ভূখণ্ডের ভাগ্য ও কিসমত জেগেছে। সে কত বাহ্যত অসম্ভব ঘটনা ও বিষয়কে সম্ভব বানিয়েছে এবং কত ধারণা ও কল্পনাতীত জিনিসকে ঘটনা ও প্রত্যক্ষজাত বানিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

এমনিতে তো বালাকোটের শহীদদের প্রতিটি সদস্যের পয়গাম এটাই যে, "হায়! আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত কি কারণে আমার প্রতি-পালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিত করেছেন" (সূরা ইয়াসীন, ২৬--২৭ আয়াত)। কিন্তু শ্রোতার কান এবং দর্শকের চোখের জন্য তাঁদের সমষ্টিগতভাবে পয়গাম এটাই যে, আমরা এমন একটি ভূখণ্ড লাভের জন্য চেষ্টা ও সাধনা করতে থাকি যেখানে আমরা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও মর্জি মাফিক এবং ইসলামের আইন ও কানূন মুতাবিক আযাদীর সাথে জীবন যাপন করতে পারবো, যেখানে আমরা দুনিয়াকে ইসলামী যিন্দেগী এবং ইসলামী সমাজ-জীবনের নমুনা (মডেল) দেখিয়ে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট এবং তার সত্যতা ও মহান মর্যাদার স্বীকৃতি দানকারীতে পরিণত করতে

পারবো, যেখানে প্রবৃত্তি ও শয়তান, শাসক ও সুলতান এবং রসম ও রেওয়াজের পরিবর্তে খালেস আল্লাহ্‌র হুকূমত ও আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ -

“এবং আল্লাহ্‌র দীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়” (সূরা তওবাহ্,, ৩৯ আয়াত)—যেখানে আনুগত্য, অনুসরণ, ‘ইবাদত-বন্দেগী ও সংস্কার পরিশুদ্ধি এবং তাকওয়া-পরহেযগারীর জন্য আল্লাহ্‌র যমীন প্রশস্ত ও বিস্তৃততর এবং পরিবেশ অনুকূল হবে---অন্যায়-অনাচার ও সীমাহীন পাপ ও অবাধ্যতার জন্য যমীন সংকীর্ণ এবং পরিবেশ হবে প্রতিকূল,-- যেখানে শতাব্দীকাল গুজরে যাবার পর পুনরায়ঃ

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَآتَوُا الزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا

بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ -

“আমি ইহাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করিলে তাহারা সালাত কায়েম করিবে, যাকাত দিবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎ কার্য হইতে বারণ করিবে”--এর তফসীর ও তসবীর (চিত্র) পেশ করার সুযোগ মিলতে পারে। তকদীরে ইলাহী আমাদের জন্য এই সৌভাগ্য ও আনন্দ এবং এই অভিলাষ ও অভিপ্রায়কে পূরণ করবার বিনিময়ে যুদ্ধের ময়দানের শাহাদত এবং নিজের নৈকট্য ও রিযামন্দীর মহান সম্পদ দান করাকেই অগ্রাধিকার দিলেন। আমরা আমাদের প্রতিপালকের এই ফয়সালায় পরিপূর্ণ রাযী ও তুষ্ট। এখন যদি আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাদেরকে দুনিয়ার কোন একটি অংশে এমন কোন ভূখণ্ডের সামান্যতম অংশও দান করেন যেখানে তোমরা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং ইসলামী বিধান মুতাবিক আযাদীর সাথে জীবন যাপন করতে পারো এবং ইসলামী যিন্দেগী ও ইসলামী সমাজ-জীবন কায়েম করতে কোন বাধ্যবাধকতা, প্রতিবন্ধকতা এবং কোন বহিঃ-শক্তি মাঝখানে প্রতিবন্ধক না হয়—এর পরও যদি তোমরা এ থেকে গা বাঁচিয়ে চলো এবং এই সব শর্ত ও গুণাবলীর প্রমাণ না দাও যা মজলুম মুহাজিরদের

শাসন ক্ষমতা ও সাম্রাজ্যের তমঘা-ই ইমতিয়ায[১] খেতাব, তা হ'লে তোমরা এমন একটি নিয়ামতের কুফরী এবং এমন একটি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত হবে যার নজীর ইতিহাসে মেলা ভার। আমরা যে যমীনের প্রত্যন্ত কোণের জন্য নিরলস চেষ্টা ও সাধনা চালিয়ে গেছি এবং নিজেদের তপ্ত টাটকা খুনে রঞ্জিত করেছি আকুড়া ও শায়দূর ময়দান এবং তুর্দ ও মায়ারের রণভূমি থেকে বালাকোটের শাহাদতগাহ পর্যন্ত আমাদের শহিদী খুনে মোহরাঙ্কিত এবং আমাদের শহীদদের কবর ছড়ানো। তোমাদের আল্লাহ্ এই জীবনেই প্রশস্ত ও বিস্তৃত এলাকা এবং শস্য-শ্যামল সবুজ ভূখণ্ড দান করেছেন, কতক সময়ে কলমের একটি খোঁচা এবং নামমাত্র চেষ্টা-তদবীরেই বিরাট সাম্রাজ্যের অধিপতি বানিয়েছেন ঃ

ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ -

"অতঃপর আমি তাদের পর দুনিয়ায় তোমাদেরকে প্রতিনিধি করেছি, দেখার জন্য তোমরা কি প্রকার আচরণ কর।" (সূরা ইউনুস, ১৪ আয়াত)

এখন যদি তোমরা এ থেকে ফায়দা গ্রহণ না করো,—তোমরা আযাদীর এই মহা নিয়ামতের এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত সালতানাতের এই মূল্যবান সম্পদকে শাসন ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ এবং নিকৃষ্ট ও বিনাশশীল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পরিপূরণের মাধ্যম বানাও --তোমরা নিজেদের ব্যক্তি জীবনে, ভক্ত-অনুরক্ত দেশের নাগরিক ও বাসিন্দাদের উপর আল্লাহ্রই অনুশাসন এবং ইসলামের প্রবর্তিত বিধি-বিধান প্রচলন না করো,--এবং তোমাদের দেশ ও তোমাদের সাম্রাজ্য, নিজেদের সভ্যতা ও সমাজ জীবন, নিজেদের আইন-কানুন ও রাজনীতি অনুসরণ না করো এবং তোমাদের শাসক নিজেদের নৈতিক চরিত্র, ব্যবহার ও জীবন-চরিত যদি ইসলামী আদর্শ অনুসারে

---

১. "যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদের যারা আক্রান্ত হয়েছে ; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে।—আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম ; নিজেদের ঘর-বাড়ী থেকে তাদের অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত করা হয়েছে শুধু এই কারণে যে, তারা বলে,---'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ'। আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খৃস্টান সংসার-বিরাগীদের উপাসনাস্থান, গীর্জা, ইহূদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে তার দীনকে সাহায্য করে। আল্লাহ নিশ্চয়ই শক্তিমান, পরাক্রমশালী।" (সূরা হজ্জ, ৩৯-৪০ আয়াত)

পরিচালিত না করে এবং তোমাদের তা'লীম ও তরবিয়ত তথা শিক্ষায় ও প্রশিক্ষণে অনৈসলামিক রাষ্ট্রীয় শক্তি এবং গায়ের ইসলামী শাসকদের থেকে কোনরূপ পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য না থাকে তবে তোমরা আজ দুনিয়ার ঐ সব জাতিগোষ্ঠীর সামনে--যাদের থেকে তোমরা মুসলমানদের জন্য আলাদা ও স্বতন্ত্র ভূখণ্ডের দাবী করেছিলে--এবং কাল আল্লাহ্‌র আদালতে যেখানে এই আমানতের বিন্দু বিন্দু পরিমাণে হিসাব দিতে হবে--কি জওয়াব দেবে ? আল্লাহ্ তোমাদেরকে এমন একটি মূল্যবান ও দূর্লভ সুযোগ দান করেছেন যার অপেক্ষায় প্রাচীন যুগ ও কাল-পরিক্রমা শত শত বার পার্শ্ব পরিবর্তন করেছে, ইসলামের ইতিহাস হাজার হাজার পৃষ্ঠা উল্টিয়েছে, যার আফসোস ও আকাঙ্খায় আল্লাহ্‌র লাখো পবিত্র আত্মা ও উচ্চ মনোবলসম্পন্ন বান্দা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। এই সুযোগ যদি তোমরা নষ্ট করে দাও তবে এর থেকে বড় ঐতিহাসিক দুর্ঘটনা এবং এর থেকে অধিকতর হতাশা ও নিরাশাব্যঞ্জক ঘটনা আর কিছুই হবে না। বালাকোটের শহীদদের--যাঁরা এক দূরবর্তী বস্তির এক কোণে কবরে ঘুমিয়ে গেছেন--ঐসব লোকদের জন্য যারা শাসন ক্ষমতা ও শাসন ইখতিয়ারের নিয়ামত দ্বারা ভাগ্যবান এবং একটি আযাদ ইসলামী রাষ্ট্রের বাসিন্দা,---এটাই পয়গাম ঃ

فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض و تقطعوا ارحامكم -

'ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করিবে।'

(সূরা মুহাম্মদ, ২২ আয়াত)

নির্ঘণ্ট

নাম

আ

ই

স্থান

উল্লেখযোগ্য ঘটনা

ধর্মীয়/শাসন বিভাগীয় পদ

অস্ত্রশস্ত্র

সামরিক পরিভাষা

ধর্ম

গ্রন্থ

জাতি-গোত্র-সম্প্রদায়

ধর্মীয় পরিভাষা

ই.ফা.বা.—৮৭-৮৮—প্র/১৬১০—৫২৫০—১. ৩. ১৩৯৫/১৫. ৬. ১৯৮৮